আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন

আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম

আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত

আল্লাহ্‌র রসূল কিভাবে নামায পড়তেন

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম

অনুবাদ ও সম্পাদনা

আবদুস শহীদ নাসিম

বিবিসি

বর্ণালি বুক সেন্টার

আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেছেন :

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

নিশ্চয়ই মু'মিনদের জন্যে সালাত লিখে (ফরয করে) দেয়া হয়েছে, সময়ও নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। (সূরা ৪ আন্‌নিসা : ১০৩)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

নিশ্চত সফল হয়েছে সেসব মু'মিন, যারা তাদের সালাতে বিনয় ও একাগ্রতা অবলম্বন করে। (সূরা ২৩ আল মু'মিনূন : ১-২)

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

রসূল (মুহাম্মদ) তোমাদের যা কিছু প্রদান করে তোমরা তাই গ্রহণ করো; আর যা কিছু থেকে বিরত থাকতে বলে, সেগুলো থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ্কে ভয় করো। জেনে রাখো, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা ৫৯ আল হাশর : ৭)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ

"তোমরা ঠিক সেভাবে সালাত আদায় করো, যেভাবে আদায় করতে দেখেছো আমাকে।" (সহীহ বুখারি, মুসনাদে আহমদ)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম কে?

আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম ইসলামি দুনিয়ার এক অত্যুজ্জ্বল দেদীপ্যমান নক্ষত্র। বহু বছর আগে তাঁর দৈহিক মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু ইসলামের জ্ঞানরাজ্যে তাঁর উৎসবাহী বিপুল অবদান তাঁকে সুরাইয়া সিতারার মতো সমুজ্জ্বল করে রেখেছে।

তাঁর জন্ম দামেস্কে। জন্মসাল ৬৯১ হিজরি।

ইসলামি ইল্ম ও আমলের দুনিয়ায় অসাধারণ উচ্চতার কারণে তাঁর যুগের লোকেরা তাঁকে তিনটি উপাধিতে ভূষিত করে :

১. 'আল্লামা' - বিদ্যাসাগর।

২. 'শামসুদ্দীন' - দীন ইসলামের সূর্য।

৩. 'হাফিয' - তিনি একাধারে কুরআন ও হাদিসের হাফিয ছিলেন। তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি ছিলো অনন্য।

তাঁর কুনিয়াহ্ ছিলো আবু আবদুল্লাহ্। মূল নাম মুহাম্মদ ইবনে বকর ইবনে আইউব ইবনে সা'আদ। কিন্তু 'আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযী' নামে তিনি বিশ্বব্যাপী সমধিক পরিচিত।

ইবনুল কায়্যিম ছিলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র এবং স্বার্থক উত্তরসূরী। ইমাম ইবনে তাইমিয়া তো 'শাইখুল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষক বা উস্তাদ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে বিখ্যাত বাক্যটি সকলেরই জানা 'ইবনে তাইমিয়া যে হাদিস জানতেন না, সেটা হাদিস নয়।'

ইবনুল কায়্যিম ছিলেন তাঁর স্বার্থক শিষ্য। হাদিস শাস্ত্রে ইবনুল কায়্যিমের পান্ডিত্য ছিলো তাঁর উস্তাদেরই মতো। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বিশ্লেষণ ও মতামতসমূহ মূলত ইবনুল কায়্যিমের মাধ্যমেই বেশি প্রচার ও প্রসারিত হয়েছে। ইবনুল কায়্যিম তাঁর গ্রন্থাবলীতে বার বারই বলেছেন 'কা-লা শাইখুনা' অর্থাৎ 'আমাদের উস্তাদ- শাইখ বলেছেন'। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম ছিলেন একাধারে-

কুরআন ও হাদিসের হাফিয, সুন্নতে রসূলের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত, শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, শ্রেষ্ঠ হাদিস বিশ্লেষক, শ্রেষ্ঠ সীরাত বিশ্লেষক, শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ এবং সর্বোপরি তিনি ছিলেন 'মুজতাহিদে মতলক' (স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ)।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তিনি ছিলেন কট্টর ও আপোসহীন সুন্নতে রসূলের অনুসারী। সুন্নতে রসূলের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও ছিলেন তিনি সর্বাগ্রে। তাঁর লেখা গ্রন্থাবলী এর উজ্জ্বল প্রমাণ।

বিশেষ করে তাঁর লেখা মহান গ্রন্থ 'যাদুল মা'আদ' তো সুন্নতে রসূলের সোনালি স্মারক।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের অমর গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো :

১. যাদুল মা'আদ (চার খন্ড)।
২. তাহযীব সুনানে আবু দাউদ ওয়া ইযাহু মুশকিলাতিহি।
৩. সফরুল হিজরাতাইন।
৪. মারাহিলুস সায়েরীন।
৫. আল কালিমুত তায়্যিব।
৬. যাদুল মুসাফিরীন।
৭. নকদিল মানকূল।
৮. ই'লামুল মু'ফীকীন আন রাব্বিল আলামীন (তিন খন্ড)।
৯. বাদায়েয়ুল ফাওয়ায়িদ (দুই খন্ড)।
১০. আস সওয়ায়িকুল মুরসালা।
১১. হাদীউল আরওয়াহ ইলা বেলাদিল আফরাহ।
১২. নুযহাতুল মুশতাকীন।
১৩. আদ্দাউ ওয়াদ্দাওয়া।
১৪. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ্ (একটি বিশাল গ্রন্থ)।
১৫. গরীবুল উসলূব।
১৬. ইজতেমাউল জুয়ূশুল ইসলামিয়া।
১৭. কিতাবুত তুরুকুল হিকমাহ্।
১৮. ইদ্দাতুস সাবেরীন।
১৯. ইগাসাতুল লাহেফান।
২০. আত তিবয়ান ফী আকসামিল কুরআন।
২১. কিতাবুর রূহ।
২২. আসসিরাতুল মুস্তাকীম।
২৩. আল ফাতহুল কুদসী।
২৪. আততুহফাতুল মাক্কীয়াহ।
২৫. আল ফাতাওয়া, ইত্যাদি।
২৬. জামউল ইফহাম।

সুন্নতে রসূলের কাড়াকড়ি অনুসরণ এবং বিদআতের বিরোধিতা করার কারণে আল্লামা ইবনুল কায়্যিমকে তাঁর উস্তাদ ইবনে তাইমিয়ার মতোই অনেক জেল-যুল্‌ম-নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

কাজি বুরহানুদ্দীন যরয়ী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : 'আসমানের নিচে তাঁর চাইতে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী লোক দেখা যায়নি।'

সুন্নতে রসূলের বাস্তব নমুনা এই মহান জ্ঞানতাপস ৭৫১ হিজরির ১৩ রজব তারিখে ইহকাল ত্যাগ করেন। ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এটি নামাযের উপর সেরা গ্রন্থ

রসূলুল্লাহ সা.-এর নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে এই গ্রন্থটি তুলনাহীন-অনন্য এক সেরা গ্রন্থ।

এ বইটি মূলত আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিমের সীরাতে রসূল ও সুন্নতে রসূলের উপর লেখা সবচাইতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সোনালি গ্রন্থ 'যাদুল মা'আদ'-এর ইবাদত অধ্যায়ের সালাত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোর সংকলন।

রসূলুল্লাহ সা. কিভাবে নামাযের জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন, কী পদ্ধতিতে নামায পড়েছেন, নামাযে কী পড়েছেন, নামাযের আরকান-আহকাম কিভাবে পালন করেছেন. ফরয নামায ছাড়া আর কি কি নামায, কতো রাকাত পড়েছেন?

- সেসবেরই এক বিশ্বস্ত ও প্রামাণিক বর্ণনা এ বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অজ্ঞতার কারণে পরবর্তীকালের লোকেরা নামাযের এমন অনেক নিয়মই পালন করে না, যা রসূলুল্লাহ সা. স্বয়ং করেছেন। আবার তারা নামাযের সাথে এমন অনেক নিয়মই জুড়ে নিয়েছে, যা রসূলুল্লাহ সা. করেননি। অথচ আল্লাহ্র রসূল সা. পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ - (بخارى، مسند احمد)

অর্থ : তোমরা ঠিক সেভাবে নামায পড়ো. যেভাবে পড়তে দেখেছো আমাকে।' (সহীহ বুখারি, মুসনাদে আহমদ)

এ-তো গেলো রসূলুল্লাহ সা.-এর নিজের কথা। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তো বলে দিয়েছেন :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থ : হে নবী, বলো তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলেই আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন। (সূরা ৩ আলে ইমরান : ৩১)

আল কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

অর্থ : আল্লাহর রসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তোমরা তাই মেনে চলো, আর তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর : ৭)

এখন আমাদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, সকল কাজেই আমাদেরকে আল্লাহর রসূলের অনুসরণ করতে হবে। তাঁকে মেনে চলতে

হবে। তিনি যেসব বিধিবিধান ও নিয়মপদ্ধতি চালু করে গেছেন, সেগুলো অবশ্যি পালন করতে হবে।

নামায ইসলামের সেরা ইবাদত। নামায অবশ্যি সেভাবে পড়তে হবে, যেভাবে পড়েছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সা.। তিনি পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তিনি যেভাবে নামায পড়েছেন, তাঁর অনুসারীদেরকেও ঠিক সেভাবে নামায পড়তে হবে।

যারা সুন্নতে রসূল ও সাহাবায়ে কিরামের আছার সম্পর্কে অবগত আছেন, আজকাল তাঁরা মসজিদে গিয়ে বিস্মিত হন, এমনকি অজ্ঞ লোকদের তিরস্কারের শিকার হন। যেমন-

আমাদের দেশের ইমাম সাহেবানরা নামাযের সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিগণকে সাথে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাকে অবশ্য জরুরি কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অথচ আল্লাহর রসূল সা. নামাযের সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিগণকে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করেছেন বলে প্রমাণ নেই।

ইমাম সাহেবগণের এ কাজের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, এখন মুসল্লিগণ এ কাজকে নামাযের অংশ মনে করতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবস্থা এতোটা চরম আকার ধারণ করেছে যে, কোনো ইমাম যদি সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিদের সাথে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত না করেন, তবে তার ইমামতি থাকবে না। আমাদের জানা মতে এ কারণে কিছু লোকের ইমামতি ছুটে গেছে। আবার অনেকেই এই কাজটা রসূলুল্লাহর সুন্নত নয় জেনেও করে যাচ্ছেন কেবল ইমামতি টিকিয়ে রাখার জন্যে।

ফলে ইমামরা কি নিজেদের কৃতকর্মের কারণে এক বিরাট ফিতনার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েননি?

আমরা বলবো, কোনো ইমাম যদি কখনো মুসল্লিগণকে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করেন, তবে তা নাজায়েয নয়। কিন্তু এটাকে নিয়মে পরিণত করা এবং প্রত্যেক নামাযের সাথে অপরিহার্য ও অবধারিত করে নেয়া সুন্নতে রসূলের পরিপন্থী। অতপর মুসল্লিদের বিরাগ ভাজন হবার ভয়ে একাজ ঠিক নয় জেনেও ছাড়তে না পারা নিজেদের মনগড়া রীতিকে শরীয়তের বিধানে পরিণত করার নামান্তর নয় কি?

এটা তো নামাযের মধ্যে একটা মনগড়া সংযোজন। অপর দিকে রসূলুল্লাহ সা. তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকূতে যাবার সময় এবং রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে 'রফে ইয়াদাইন' করতেন। এমনকি দুই রাকাত পড়ে যখন দাঁড়াতেন, তখনো 'রফে ইয়াদাইন' করতেন বলে বর্ণনা আছে। এসব জায়গায় রফে ইয়াদাইন করা আল্লাহর রসূলের সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত সুন্নত। কিন্তু না জানার কারণে অনেক মুসল্লি তা করেন না। আবার অনেকে জেনেও তিরস্কারের ভয়ে করেন না। আবার কেউ করলে তাকে আহলে হাদিস উপাধি দেয়া হয়।

আরেকটি অজ্ঞতা বড়ই দু:খজনক। সেটা হলো, কেউ কেউ এ সুন্নত পালন না করার ক্ষেত্রে বাহানা হিসেবে বলেন, 'আমি হানাফী, আর হানাফী মযহাবে রফে ইয়াদাইন নেই, সেজন্যে আমি তা করি না।'

- এটা ইসলামের মহান নিশানবরদার ইমাম আবু হানীফার প্রতি অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ্ পরিষ্কার করে তাঁর মযহাবের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

অর্থ : 'সহীহ হাদিস পাওয়া গেলে সেটাই আমার মযহাব।*

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর এ বাণী থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সহীহ ও প্রমাণিত হাদিস অনুসারে আমল করাটাই তাঁর মযহাব।

'সহীহ হাদিস পাওয়া গেলে' কথাটা বলার কারণ হলো. তাঁর সময় হাদিস ছিলো মানুষের মুখে মুখে, মানুষের স্মৃতিতে। তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত হাদিসের গ্রন্থাবলী সংকলিত হয়নি। তাঁর ইনতিকালের পরেই হাদিসের ইমামগণ বিভিন্ন দেশে ও শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাদিস সমূহ সংকলন ও যাচাই বাছাই করেছেন।

তিনি আশংকা করছিলেন, তাঁর যেসব হাদিস জানা আছে, তার বাইরেও হাদিস থেকে যেতে পারে। সেকারণেই তিনি একথা বলে গেছেন। আর বাস্তবেও তাঁর আশংকা ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। হাদিসের ইমামগণ যখন সব অঞ্চল থেকে হাদিস সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই করলেন, তখন দেখা গেলো, এমন বহু হাদিস সামনে চলে এসেছে, যেগুলো ইতোপূর্বে ইমাম আবু হানীফার শহর কুফায় পৌঁছেনি।*

উপরোক্ত কথাটি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কথা হলেও ইমাম শাফেয়ী রহ.ও একই কথা বলে গেছেন। অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য এবং নীতিও ছিলো অনুরূপ। কুরআন-সুন্নাহ্ই ছিলো তাঁদের সকল কর্মের ভিত্তি।

কুরআনের যেসব আয়াত এবং যেসব হাদিসের ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রয়োজন ছিলো, তাঁরা পূর্ণ ইখলাসের সাথে সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করে গেছেন। তাঁদের বিভিন্নজনের ব্যাখ্যায় কিছু তারতম্য হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁদের কেউ নিজের ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত কিংবা একমাত্র ব্যাখ্যা বলেননি।

এছাড়া যেসব প্রাসংগিক বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য পাওয়া যায়নি, হাদিসও পাওয়া যায়নি, এমনকি সাহবায়ে কিরামের বক্তব্যও পাওয়া যায়নি, সেসব বিষয়ে তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন। সেসব বিষয়ে পূর্ণ ইখলাসের সাথে কুরআন-সুন্নাহ্র স্পীরিটের উপর কিয়াস করে তাঁরা নিজেদের মতামত

---

* দেখুন : ইবনে আবেদীন রহ.-এর আল হাশীয়া গ্রন্থ, ১ম খন্ড ৬৩ পৃ:।

* রসূলুল্লাহ সা.-এর নামায পড়ার পদ্ধতি সরাসরি হাদিস থেকে জানার জন্যে বিরাট বিরাট গ্রন্থ পড়তে না পারলেও অন্তত 'মিশকাত শরীফ' সকলেরই পড়ে নেয়া উচিত।

পেশ করে গেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যা উত্তম মনে করেছেন তার উপর মত দিয়ে গেছেন। তাঁরা কেউই নিজের মতকে চূড়ান্ত ও অকাট্য মনে করেননি। বরং তাঁরা প্রত্যেকেই বলে গেছেন : 'সহীহ্ হাদিস পাওয়া গেলে সেটাই আমার মযহাব এবং সেক্ষেত্রে আমার প্রদত্ত মত ও ব্যাখ্যা বর্জনীয়।'

তাঁদের এই উদারতার কারণে তাঁদের হাতে গড়া ছাত্ররাও অনেক বিষয়ে তাঁদের সাথে ইখতিলাফ করে গেছেন। যেমন ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ছাত্র আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ্ শায়বানী রহ. অনেক বিষয়েই তাঁদের পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আবু হানীফা রহ.-এর সাথে ইখতিলাফ করে গেছেন। ছাত্রদের এই ইখতিলাফের কারণে ইমামের মর্যাদা মোটেও কমেনি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে।

সকল আলিমই একথা জানেন, ইমাম আবু হানীফার ছাত্ররা যেসব বিষয়ে তাঁর সাথে ইখতিলাফ (ভিন্নমত) করেছেন, সেই ভিন্নমতগুলোও ইমাম আবু হানীফার মযহাব বলেই গণ্য হয়। এর কারণ হলো ইমামের সেই মহান বাণী : 'সহীহ্ হাদিস পাওয়া গেলে সেটাই আমার মযহাব।'

তাই একথা স্বতসিদ্ধ যে, কোনো ব্যক্তি যদি সহীহ্ হাদিস পাওয়া গেলেও মযহাবের দোহাই দিয়ে তা না মানেন এবং পালন না করেন, তবে তিনি প্রকারান্তরে মযহাবের ইমামকেই অমান্য করেন।

বর্তমান কালে সামষ্টিকভাবে আমাদের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সঠিক জ্ঞানের অভাবে আমরা কুরআন-সুন্নাহকেও যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারছি না এবং মযহাবের ইমামগণকেও যথারীতি মেনে চলতে পারছি না।

এবার ফিরে যাই এই বইয়ের প্রসংগে। আলহামদুলিল্লাহ! এ বইটি আমাদেরকে প্রমাণিত সুন্নত পদ্ধতিতে নামায পড়তে সাহায্য করবে। আর যখনই আমরা প্রকৃতপক্ষে সুন্নতে রসূলের অনুসরণ করতে পারবো, তখনই আমরা মযহাবের ইমামগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করছি বলে প্রমাণিত হবে।

আমরা এ গ্রন্থটি অনুবাদও করেছি, সম্পাদনাও করেছি। আগেই বলেছি, মূল গ্রন্থ 'যাদুল মা'আদ' থেকে নামায সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলো আমরা এখানে সংকলন করেছি। যাদুল মা'আদ আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের এক অমর কীর্তি। এটি কেবল ফিক্হের গ্রন্থ নয়, বরং এটি সীরাতে রসূল ও সুন্নতে রসূলের গ্রন্থ।

এ গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম সকল বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর আদর্শ ও সুন্নতকে উন্মুক্ত করে তুলে ধরেছেন। বিরোধপূর্ণ হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন, ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং সমাধান পেশ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইমামগণের মতামতও উল্লেখ করেছেন। এ মহান গ্রন্থ থেকে নামায সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলো সংকলন করতে গিয়ে আমরা কিছু কিছু সম্পাদনার কাজও করেছি। তাহলো :

১. শিরনাম উপশিরনাম ব্যবহার করেছি।

২. তরতিব অর্থাৎ সাজানো পদ্ধতিকে আমরা নাড়াচাড়া করে কোনো কোনো বিষয়কে আগপাছ করেছি বর্তমান কালের পাঠকদের উপযোগী করার জন্যে।

৩. গ্রন্থকার বিভিন্ন হাদিসের বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা যাচাই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাবীদের অবস্থা সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, আমরা এ বইতে তা নিয়ে আসিনি, বরং তাঁর বিশ্লেষণের ফলাফলটাই নিয়ে এসেছি।

৪. বিভিন্ন বিষয়ের দীর্ঘ প্রাসংগিক আলোচনাকেও আমরা সংক্ষিপ্ত করে মূল কথাগুলো নিয়ে এসেছি।

৫. গ্রন্থকার নিজেই যেহেতু হাদিস ও ইল্‌মে হাদিসের অথরিটি, সেজন্যে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই হাদিসের সূত্র উল্লেখ করেননি। আমরা সর্বত্র নয়, কোনো কোনো স্থানে হাদিসের সূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি।

৬. মূল গ্রন্থে টিকা-টিপ্পনী নেই। কোনো কোনো বিষয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে স্পষ্টতর করার জন্যে আমরা টিকা-টিপ্পানী ব্যবহার করেছি। (সুতরাং টিকা-টিপ্পনীতে কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে সেটার দায় দায়িত্ব আমার।)

৭. গোটা বইতে বিভিন্ন স্থানে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছি। অনুচ্ছেদগুলোতে কেবল হাদিসই উল্লেখ করা হয়েছে। আমার নিজের কোনো বক্তব্য তাতে নেই। যেসব অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে, সেগুলোতে টিকা দিয়ে 'সংযোজিত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

- এভাবে আমরা এই মূল্যবান বইটিকে তার বিশুদ্ধতার সাথে সাথে সহজ, সরল, সুন্দর, সাবলীল, সুখপাঠ্য ও সর্বসাধারণ পাঠকের উপযোগী করার চেষ্টা করেছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ বই মুমিনদের জন্যে খুবই উপকারী প্রমাণিত হবে। রসূলুল্লাহ সা. যেভাবে নামায পড়েছেন, যারা ঠিক সেভাবে নামায পড়তে চান, এই বই তাঁদেরকে বড় উপকারী বন্ধুর কাজ দেবে। - এ বই রসূলুল্লাহ সা.-এর নামাযের প্রতিচ্ছবি।

- এ বই তাদের জন্যে, যারা সহীহ হাদিসের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সা.-এর মতো করে নামায পড়তে চান।
- এ বই ঐ লোকদের জন্যে, যাঁরা সুন্নতে রসূলকে আঁকড়ে ধরতে চান।
- যাঁরা আল্লাহর রসূলের নামায পড়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে মনের প্রশান্তি অর্জন করতে চান, এ বই তাদের জন্যে।

- এ বই তাঁদের জন্যে, যারা কুরআন-সুন্নাহ্কে নিজেদের ইবাদত-বন্দেগি ও সার্বিক জীবনের মানদন্ড বানাতে চান।
- এ বই তাঁদের জন্যে, যারা নিজ নিজ মযহাবের সেই মহান ইমামগণকে সত্যিকার অর্থে অনুসরণ করতে চান, যে ইমামগণ নিজেদের সমস্ত আমল ও মতামতের ভিত্তি বানিয়েছিলেন আল্লাহ্র কুরআন ও আল্লাহ্র রসূলের সুন্নতকে এবং অনুসারীদেরকেও তাই করতে বলে গেছেন।

শেষ করার আগে একটি ওযর পেশ করে নিচ্ছি। সেটা হলো, এ বইতে আমরা 'নামায' শব্দ ব্যবহার করেছি, অথচ কুরআন-হাদিসের মূল শব্দ হলো 'সালাত'। সালাত শব্দটিই ব্যবহার করা আমাদের উচিত ছিলো কিন্তু সালাতের পরিবর্তে নামায শব্দটি ব্যবহার করেছি সর্ব সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার্থে। কারণ বহু শতাব্দী থেকে এ শব্দটি বাংলা ভাষায় ও বাংলাভাষীগণের কাছে পরিচিত ও প্রচলিত। যেমন, 'আল্লাহ' শব্দের জায়গায় 'খোদা' শব্দটি পরিচিত ও চালু হয়ে আছে। আমরা মনে করি বোল-চালের ক্ষেত্রে 'আল্লাহ', 'সালাত' প্রভৃতি এই মূল শব্দগুলো ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যাওয়া দরকার। তখন বইপুস্তকেও সেগুলো চালু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এ বই লেখার সময় আমার বড় মেয়ে সাজেদা হোমায়রা হিমু বেশ কিছু অংশের ডিক্টেশন লিখে দিয়ে আমার সহযোগিতা করেছে। আমি তার, বইয়ের প্রকাশকের এবং সকল পাঠক-পাঠিকার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করছি।

আল্লাহ তাবারুক ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে রসূলুল্লাহ সা.-এর শিখানো পদ্ধতিতে নামায পড়ার তৌফিক দান করুন। আমাদের নামায পড়ার পদ্ধতি ভুল থাকলে তা সংশোধন করে আমরা যেনো সুন্নতে রসূলের অনুসারী হতে পারি, আল্লাহ পাক আমাদের সেই সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
২৮.০৭.২০০০ ঈসায়ী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?

নামাযের জন্যে রসূলুল্লাহর পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতি

রসূলুল্লাহ সা. কিভাবে অযু করতেন?

রসূলুল্লাহ সা. বেশিরভাগই নতুন অযু করে নামায পড়তেন। তবে কখনো কখনো এক অযুতে একাধিক ওয়াক্ত পড়তেন।

একবার অযু করতে তাঁর এক 'মুদ্দ' (প্রায় এক কিলোগ্রাম) বা তার একটু কম-বেশি পরিমাণ পানি ব্যয় হতো। অযু করার সময় তিনি অযুর অংগগুলোতে ভালোভাবে পানি ব্যবহার করতেন। তবে তিনি পানি অপচয় করতেন না, খুবই কম পানি ব্যবহার করতেন। উম্মতকেও পানি অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন :

"আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক অযু করতে গিয়ে পানি অপচয় করবে (অথচ এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রসূত কাজ)।" তিনি আরো বলেছেন "অযু করার সময় ওলহান নামের এক শয়তান এসে (অধিক পানি ব্যয় করার জন্যে) অসৃঅসা দিতে থাকে। তোমরা তার দ্বারা প্রতারিত হয়োনা।"

সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. একবার অযু করছিলেন। এমন সময় রসূল সা. তাঁর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন সা'আদ! পানির অপচয় করোনা।' সা'আদ জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রসূল! পানিতেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তুমি যদি কোনো প্রবহমান নদীর কূলে বসেও অযু করো, সেখানেও অপচয় আছে। তুমি সর্বাবস্থায় অপচয় থেকে আত্মরক্ষা করো।' (মুসনাদে আহমদ)

সহীহ সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়, রসূলুল্লাহ সা. অযুর অংগসমূহ কখনো একবার ধুয়েছেন, কখনো দু'বার, কখনো তিনবার। এমনও প্রমান পাওয়া যায়, একই অযুতে তিনি কোনো অংগ একবার, কোনো অংগ দু'বার এবং কোনো অংগ তিনবার ধুয়েছেন।

তিনি কখনো এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়েই কুল্লিও করেছেন এবং নাকেও দিয়েছেন। আবার কখনো দু'তিন আঁজলা দিয়ে এ দু'টো কাজ করেছেন। কখনো এক আঁজলা পানির অর্ধেক দিয়ে কুল্লি করতেন আর বাকি অর্ধেক নাকে দিতেন। যখন দু'তিন আঁজলা ব্যবহার করতেন, তখন সম্ভবত এ দু'টো কাজ আলাদা আলাদা করতেন, কিংবা একত্রে করতেন। তবে, বুখারি ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের বর্ণনায় পাওয়া যায়, রসূলুল্লাহ সা. এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়েই কুল্লি করেছেন, নাকেও

দিয়েছেন এবং এমনটি তিনবার করেছেন। তবে আরেকটি হাদিস থেকে জানা যায়, এ দুটো কাজ তিন আঁজলা পানি নিয়ে করেছেন।

কুল্লি করা এবং নাকে পানি দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে এ হাদিসটিই অধিকতর সহীহ। আলাদা আলাদা আঁজলা নিয়ে কুল্লি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন- এমন কোনো সহীহ্ হাদিস পাওয়া যায় না। এরূপ বর্ণনা সম্বলিত একটি হাদিস পাওয়া যায় তালহা থেকে। তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, অথচ তাঁর দাদা সাহাবি ছিলেন না- রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে তাঁর সক্ষাত হয়নি।

রসূলুল্লাহ্ সা. ডান হাতে করে পানি নিতেন। ডান হাতে নাকে পানি দিয়ে বাম হাতে পরিষ্কার করতেন।

তিনি পুরো মাথা মাসেহ করতেন। কপালের দিক থেকে আরম্ভ করে পেছনের দিকে, আবার পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে মাসেহ্ করতেন। এরকম করার কারণে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, তিনি দু'বার মাসেহ করতেন। আসলে তিনি মাথা একবারই মাসেহ্ করতেন। অন্যান্য অংগ একাধিকবার ধুইতেন, কিন্তু মাথা একবারই মাসেহ্ করতেন। একথাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত, এর ব্যতিক্রম কথা সহীহ নয়। ইবনুল ইয়ামানী তার পিতার সূত্রে উমর রা. থেকে তিনবার মাসেহ্ করার যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা বাপ-বেটা দু'জনই জয়ীফ বর্ণনাকারী, যদিও বাপের অবস্থা কিছুটা ভালো।

আবু দাউদে উসমান রা.-এর সূত্রে তিনবার মাসেহ করার যে বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি হযরত উসমান থেকে বর্ণিত অন্য সমস্ত সহীহ্ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক। তাঁর থেকে বর্ণিত বিভিন্ন সহীহ হাদিসে একবার মাসেহ্ করার কথাই উল্লেখ হয়েছে।

রসূল সা. মাথা আংশিক মাসেহ্ করেছেন- এমন প্রমাণও কোনো সহীহ্ হাদিস থেকে পাওয়া যায় না। তবে অযুর সময় যখন মাথায় পাগড়ি থাকতো, তখন তিনি কপাল মুছে পাগড়ির উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে মাসেহ্ পূর্ণ করতেন।

আবু দাউদে আনাস রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তাতে আনাস রা. বলেন "আমি রসূলুল্লাহ্ সা.-কে একবার কাতারে তৈরি পাগড়ি মাথায় থাকা অবস্থায় অযু করতে দেখেছি। তিনি পাগড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেন এবং মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ্ করেন। পাগড়িকে ভাংগেনওনি, সংকুচিতও করেননি।" অর্থাৎ তিনি পাগড়ি না ভেংগে বা না খুলে পাগড়ির নিচে দিয়ে মাথা মুছে নিতেন। অবশ্য এ হাদিস থেকে পাগড়ির উপর দিয়ে মাসেহ্ না করাটা প্রমাণ হয়না। এর প্রমাণ রয়েছে

মুগীরা ইবনে শু'বা এবং অন্যান্য সাহাবির বর্ণিত হাদিসে। আনাসের হাদিসে এ ব্যাপারে বক্তব্য না থাকাতে কিছু যায় আসেনা।

রসূল সা. কুল্লি করা ও নাকে পানি দেয়া ছাড়া কখনো অযু করেছেন বলে প্রমাণ নেই। এরকম একটি নযীরও নেই।

তিনি সব সময় অযুতে তরতীব (ধারাবাহিকতা) রক্ষা করতেন। একবারও তরতীবের খেলাফ করছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।

মাথা মাসেহ্ করার ক্ষেত্রে তিনি কখনো সরাসরি পুরো মাথা মাসেহ্ করতেন। কখনো পাগড়ির উপর মাসেহ্ করে নিতেন। কখনো কপাল এবং পাগড়ি মুছে নিতেন। আর একথা তো আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি শুধুমাত্র কপাল মুছে মাথা মাসেহ্র কাজ সম্পন্ন করেছেন- এমন কোনো প্রমাণ নেই।

মাথা মাসেহ্ করার সাথে সাথে তিনি কানের ভেতর এবং বাইরে দিয়ে মুছে নিতেন। এ কাজের জন্যে নতুন করে পানি নিতেন না।- এর প্রমাণ হলো আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণিত হাদিস।

তিনি ঘাড় মুছেছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না।

যখন চামড়া বা কাপড়ের মোজা পরা থাকতোনা, তখন রসূলুল্লাহ সা. পা ধুইয়ে নিতেন। তবে মোজা পরা থাকলে তিনি মোজার উপরই মাসেহ্ করে নিতেন।

তিনি বিস্মিল্লাহ বলে অযু আরম্ভ করতেন। বিস্মিল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বলে তিনি অযু শুরু করেছেন বলে যেসব হাদিসের কথা উল্লেখ করা হয়, সেগুলো মিথ্যা-মনগড়া হাদিস। এমন কিছু তিনি নিজেও করেননি, উম্মতকেও শিখাননি। বিস্মিল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বলার কোনো প্রমাণ নেই।

রসূলুল্লাহ সা. অযু শেষ করে নিম্নরূপ দু'আ পড়তেন :

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَالْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহ্র দাস এবং রসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।"

নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে, অযুর পরে তিনি নিম্নরূপ দু'আও পড়তেন :

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ ○

অর্থ : সমস্ত ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে মুক্ত তুমি। তোমার প্রশংসা স্বীকার করে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী আর তোমারই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করছি।"

রসূলুল্লাহ সা. অযু করার শুরুতে "আমি নাপাকি দূর করার কিংবা নামায পড়ার নিয়্যত বা ইচ্ছা করছি" - ধরনের কোনো কথা বা নিয়্যত উচ্চারণ করতেন না। সহীহ্ কিংবা জয়ীফ কোনো হাদিসেই এমনটি করার কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর সাহাবিরাও এমনটি করেননি। এ ব্যাপারে সহীহ্ জয়ীফ কোনো প্রমাণ নেই।

তিনি হাতের কনুই এবং পায়ের টাখনু গিরার উপরে ধুয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে আবু হুরাইরা রা. এমনটি করতেন। তিনি রসূল সা.-এর অযু সম্পর্কে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাতে কনুই এবং টাখনু গিরা ধৌত করা অযুর অংগের মধ্যে পড়ে।

রসূলুল্লাহ সা. অযু করার পর ধৌত করা অংগ প্রত্যংগ মুছতেন না। কোনো সহীহ হাদিসে এমনটি করার প্রমাণ নেই। আয়েশা রা. এবং মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে বস্ত্রখণ্ড এবং বস্ত্রাংশ দিয়ে তাঁর অংগ প্রত্যংগ মোছার যে কথা রয়েছে, তা সহীহ্ নয়। কারণ প্রথম হাদিসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে সুলাইমান বিন আকরাম গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নয়, আর দ্বিতীয় হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আল আফ্রিকী দুর্বল রাবী। ইমাম তিরমিযি বলেছেন, অযুর অংগ প্রত্যংগ কাপড় দিয়ে মোছার ব্যাপারে রসূল সা. থেকে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস পাওয়া যায়না।

রসূলুল্লাহ সা. কখনো নিজেই পানি নিয়ে অযু করতেন, আবার কখনো প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কেউ একজন পানি ঢেলে দিতেন আর তিনি অযু করতেন। বুখারি ও মুসলিমে মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক সফরে তিনি রসূল সা.কে পানি ঢেলে দিয়ে অযু করিয়েছেন। কিন্তু এটা কোনো নিয়মিত ব্যাপার ছিলনা।

রসূলুল্লাহ্ সা. অযু করার পরে দাড়ি খিলাল করেছেন। তবে, সব সময় নয়, মাঝে মধ্যে করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম তিরমিযি প্রমুখের মতে দাড়ি খিলাল করার বিষয়টি সহীহ। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং আবুয্ যুরআর মতে কোনো সহীহ্ হাদিস থেকে দাড়ি খিলাল করার প্রমাণ মেলেনা।

তিনি অযুতে আংগুলও খিলাল করেছেন, তবে নিয়মিত নয়। সুনান গ্রন্থাবলীতে মুস্তাওরাদ বিন শাদ্দাদ বর্ণিত হাদিস থেকে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য রসূল সা.-এর অযু সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ ছিলেন যেমন উস্মান, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ, রুবাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুম

প্রমুর্খ, তাঁদের থেকে এ বিষয়ে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়না। তাই এ বিষয়টিও দাড়ি খিলাল করার মতই সুপ্রমাণিত নয়।

অযুর সময় রসূল সা. আংটি এদিক সেদিক ঘুরিয়ে নিতেন বলে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এ বর্ণনাটি জয়ীফ (দুর্বল)। ইমাম দারু কুতনি হাদিসটির সনদের (বর্ণনা সূত্রের) মুয়াম্মার ও তার বাবাকে জয়ীফ বর্ণনাকারী আখ্যায়িত করেছেন।

রসূলুল্লাহ সা. মোজার উপর মাসেহ্ করতেন

রসূলুল্লাহ সা. আবাসে এবং প্রবাসে সর্বত্রই মোজার উপর মাসেহ্ করতেন। একথা সহীহ্ হাদিস থেকে প্রমাণিত। আর এই নীতি তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন।

তবে বিভিন্ন সহীহ ও হাসান হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, আবাসী (মুকীম) লোকদের জন্যে একদিন একরাত, আর প্রবাসী (মুসাফির) লোকদের জন্য তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মাসেহ্ করার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ একবার অযু করে মোজা পরার পর মুকীম একদিন একরাত আর মুসাফির তিন দিন তিনরাত পর্যন্ত মাসেহ্ করতে পারবে। অতপর পূণরায় পা ধুয়ে অযু করে নিতে হবে)।

রসূলুল্লাহ সা. মোজার উপরিভাগ মাসেহ্ করতেন। পায়ের (পাতার) নিচের ভাগ মাসেহ্ করেছেন বলে সহীহ সূত্রে কোনো প্রমাণ নেই। তবে একটি মাক্তু (সূত্রবিচ্ছিন্ন) হাদিসে মোজার নিচের ভাগ মোছার কথা পাওয়া যায়, কিন্তু এ বক্তব্য সবগুলো সহীহ হাদিসের বক্তব্যের বিপরীত।

রসূলুল্লাহ সা. জুতা এবং মোজা দু'টোর উপরই মাসেহ্ করেছেন, যেমন কপালসহ পাগড়ি মাসেহ্ করেছেন। তাঁর বেশকিছু কর্মগত (ফে'লী) ও বক্তব্যগত (কাওলী) হাদিস থেকে জুতা ও মোজা উভয়টার উপরই মাসেহ্ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারো কারো মতে তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থায়ই কেবল এমনটি করেছেন। সম্ভবত চামড়ার জুতা খোলার অসুবিধার কারণেই তিনি জুতাসহ মাসেহ্ করতেন। তবে প্রকৃত কথা আল্লাহই ভালো জানেন।

আসল কথা হলো, রসূলুল্লাহ সা. কোনো বিষয়কেই অহেতুক কষ্টকর করে তুলতেন না। সহজ পন্থা অবলম্বন করাটাই ছিলো তাঁর নীতি। মোজা পায়ে না থাকলে তিনি পা ধুয়ে নিতেন, আর মোজা পায়ে থাকলে মোজার উপর মাসেহ্ করে নিতেন, মোজা খোলা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। আবার মোজার উপরই মাসেহ্ করতে হবে- সেজন্যে অহেতুক মোজা পরে নিয়ে মাসেহ্ করতেন না। বরং পা খোলা থাকলে ধুয়ে নিতেন আর মোজা পরা

থাকলে মাসেহ্ করে নিতেন- এটাই ছিলো তাঁর নীতি। আমাদের উস্তাদ (ইমাম ইবনে তাইমিয়া)-এর মতে পা ধোয়া এবং মোজার উপর মাসেহ্ করা এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা উত্তম, সে প্রশ্নের সঠিক জবাব এটাই।

রসূলুল্লাহ্ সা.-এর তাইয়াম্মুম পদ্ধতি

রসূলুল্লাহ সা. যখন তাইয়াম্মুম করতেন, এভাবে করতেন : দুই হাতের তালু শুধুমাত্র একবার মেরে তা দিয়ে দুই হাত এবং মুখমণ্ডল মাসেহ্ করে নিতেন। এর জন্যে দু'বার হাত মারতেন বলে সহীহ্ হাদিসে কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া তিনি হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করতেন বলেও কোনো প্রমাণ নেই। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, যারা এর বিপরীত বলেন, সেটা তাদের নিজস্ব মত, তা রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে প্রমাণিত নয়।

রসূলুল্লাহ সা. সে মাটি দিয়েই তাইয়াম্মুম করতেন, যে মাটিতে নামায পড়া জায়েয। তাইয়াম্মুম করার জন্যে তিনি শক্ত মাটি, বালু এবং লোনা মাটিতে হাত মারতেন। তিনি বলেছেন : "আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তি যেখানেই নামায পড়বে, সেখানেই তার জন্যে মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে।"

- এ হাদিস থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, কেউ যদি বালুময় স্থানে নামায পড়ে তবে তার তাইয়াম্মুমের জন্যে বালুই যথেষ্ট।

রসূলুল্লাহ সা. যখন তবুকের যুদ্ধে গেলেন, সেখানে পানির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বালু দিয়েই তাইয়াম্মুম করেছিলেন। তবুকে যাবার সময় তিনি মাটির চাকা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিংবা তাঁর সাহাবিগণের কাউকেও নিতে বলেছিলেন- এমন কোনো প্রমাণ নেই। আসলে বালুকার অধিকাংশই তো মাটি। হিজাজের ভূমির অবস্থাও অনুরূপ।

রসূলুল্লাহ সা. থেকে তাইয়াম্মুমে হাত মোছার কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি জানা যায় না। একটি পদ্ধতির কথা বলা হয়ে থাকে যে, বাম হাতের তালু ডান হাতের পিঠের মাথা থেকে শুরু করে কুনুই পর্যন্ত নিয়ে আবার ঘুরিয়ে হাতের নিচের অংশ মুছে নিতে হবে এবং একইভাবে বাম হাতও মুছতে হবে। - এ পদ্ধতির পক্ষে রসূল সা. থেকে কোনো প্রমাণ নেই, সাহাবাগণ থেকেও নয়। তিনি এমনটি করার নির্দেশও দেননি এবং পছন্দ করেছেন বলেও প্রমাণ নেই।

রসূলুল্লাহ সা. তাইয়াম্মুমকে অযুর মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যে আলাদা আলাদা তাইয়াম্মুম করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। এমনটি করার নির্দেশও তিনি দেননি। এটাই সঠিক কথা, যদি এর বিপরীত কোনো দলিল পাওয়া না যায়।

●●●

রসূলুল্লাহ সা.-এর নামায পড়ার পদ্ধতি

তাকবীরে তাহরীমা

রসূলুল্লাহ সা. নামাযের জন্যে দাঁড়িয়েই 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করতেন। (এটাকে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা হয়)। তিনি এই তকবীর উচ্চারণের পূর্বে অন্য কোনো কিছুই পড়তেন না, বলতেন না, এমনকি নিয়্যতও উচ্চারণ করতেন না। (নিয়্যত তো হলো মনস্থির করা বা ইচ্ছা [এরাদা] করার নাম।) এ ধরনের কিছুও তিনি বলতেন না যে : কিবলামুখী হয়ে অমুক ওয়াক্তের এতো রাকাত ফরয নামায ইমাম হিসেবে বা এই ইমামের পেছনে মোক্তাদি হিসেবে পড়ছি। কিংবা আদায় পড়ছি, বা কাযা পড়ছি। এ ধরনের কথা তিনি ফরয নামাযেও বলতেন না, (সুন্নত এবং) নফল নামাযেও বলতেন না।

তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে এসব কিছু বলা বিদ'আত। কারণ এগুলোর পক্ষে রসূলুল্লাহ সা. থেকে কোনো হাদিস নেই। এমনকি সাহাবায়ে কিরামের কোনো বক্তব্যও নেই। তাবেয়ীগণের কোনো কথাও নেই। এমনকি চার ইমামের কেউই এ সম্পর্কে কিছু বলেননি। কেউই এমন কিছু বলা পছন্দ করেননি।

তবে পরবর্তী কালের কিছু আলিম ইমাম শাফেয়ীর একটি কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। ইমাম শাফেয়ীর সে কথাটি হলো "নামাযের অবস্থা রোযার মতো নয়, উল্লেখ না করে কেউ নামাযে প্রবেশ করতে পারেনা।"

- এ আলিমরা তাঁর 'উল্লেখ' অর্থ বুঝেছেন, নামাযের নিয়্যত উল্লেখ বা উচ্চারণ করা। অথচ, প্রকৃতপক্ষে ইমাম শাফেয়ী নিজে একথা দ্বারা বুঝিয়েছেন নামাযের জন্যে 'তাকবীরে তাহরীমা' উচ্চারণ করা।

ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য সম্পর্কে উপরোক্ত আলিমদের ধারণা ভুল। কারণ, স্বয়ং রসূল সা., তাঁর সাহাবায়ে কিরাম এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণ যে কাজটির উল্লেখ পর্যন্ত করেননি, ইমাম শাফেয়ী সেটাকে আবশ্যকীয় বলতে পারেন কী করে? আমরা এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ সা. এবং সাহাবায়ে কিরাম থেকে যদি একটি শব্দও পাই, তবে অবশ্যি তা মেনে নেবো। কারণ

রসূলুল্লাহর সুন্নত আর সাহাবায়ে কিরামের পন্থা অনুসরণই আমাদের কর্মনীতি। তাঁদের দেখানো সর্বোত্তম পথই আমাদের পথ। আমরা বিনীতভাবে কেবল তাঁদের থেকে প্রমাণিত কর্মনীতিই অনুসরণ করবো।

তাকবীরে তাহরীমার সময় 'রফে ইয়াদাইন' করা

রসূলুল্লাহ সা. নামায শুরু করার জন্যে 'আল্লাহু আকবার' ছাড়া আর কিছুই বলতেন না এবং আল্লাহু আকবার উচ্চারণের সময় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন (দু'হাত উঠাতেন)। এজন্যে তিনি হস্তদ্বয়কে কিবলামুখী করে কাঁধ কিংবা কান পর্যন্ত উঠাতেন। এ সময় তাঁর হাতের আংগুলগুলো ছড়িয়ে থাকতো। তিনি হাত কতোটুকু উঠাতেন সে ব্যাপারে কয়েক রকম বর্ণনা আছে। আবু হুমাইদ আস্ সা'আদী রা. ও তাঁর সাথিরা কাঁধ বরাবর উঠানোর কথা বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বক্তব্যও তাই। ওয়ায়েল ইবনে হিজর রা. বর্ণনা করেছেন : কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন। বারা ইবনে আযেব রা. বলেছেন, হাত কানের কাছকাছি নিতেন। কেউ কেউ বলেছেন, শেষোক্ত মতটিই উত্তম, তবে উপরে বর্ণিত যে কোনো পরিমাণ উঠাবার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কারো কারো মতে, কানের লতির উপর উঠাবার সুযোগ নেই। তবে কাঁধ পর্যন্ত উঠালেও চলবে। এ বিষয়ের এটাই মীমাংসা।

তকবীর (আল্লাহু আকবার) বলার সময় তিনি আরো যেসব স্থানে রফে' ইয়াদাইন করতেন, সেগুলো যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

তাকবীরে তাহরীমার পর কী পড়তেন?

তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণের সময় হাত উঠাবার পর হাত নামিয়ে ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর স্থাপন করতেন। তারপর নামায (সূরা ফাতিহা) শুরু করার পূর্বে বিভিন্ন রকম দু'আ করতেন। কখনো এই দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ- اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ○

অর্থ আমার আল্লাহ! আমার সমস্ত ভুলত্রুটি আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছো পূর্ব আর পশ্চিমের মাঝে। আয় আল্লাহ! তুমি পানি, বরফ আর শীতল জিনিস দ্বারা আমাকে আমার ভুলত্রুটি থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। ওগো আল্লাহ! আমাকে

আমার গুনাহ্ খাতা থেকে ঠিক সেরকম ঝকঝকে ত্বকত্বকে পরিচ্ছন্ন করে দাও যেমন ময়লা ও দাগ থেকে সাদা কাপড় ধবধবে সাদা হয়ে উঠে।"

কখনো এই দু'আটি পড়তেন :

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ○

অর্থ আমি একনিষ্ঠভাবে মহাবিশ্ব ও এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার দিকে আমার মুখ ফিরালাম। তাঁর সাথে যারা শিরক করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। অবশ্যি আমার নামায আমার কুরবানি আমার জীবন ও আমার মৃত্যু মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালক। কেউই তাঁর অংশীদার নয়। - এই কথাগুলো মেনে নেয়ার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং আমিই সবার আগে মেনে নিয়েছি।"

কখনো এই দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعَهَا اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ، وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَايَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَ الْاَخْلَاقِ، لَايَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ، اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ○

অর্থ ওগো আল্লাহ! তুমিই মহাবিশ্বের একমাত্র সম্রাট। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর যুল্ম করেছি এবং আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। অতএব, তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া তো অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নেই। আমাকে সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্র অর্জনের পথ দেখাও, তুমি ছাড়া তো এ পথ দেখাবার আর কেউ নেই। আমার চরিত্র ও আচরণে যা কিছু দোষত্রুটি আছে, তুমি তা দূর করে দাও, তুমি ছাড়া তো তা দূর করার আর কেউ নেই। প্রভু! তোমার দরবারে আমি

হাযির হয়েছি, বড় মেহেরবান তুমি, আর সমস্ত কল্যাণও তোমারই হাতে। অকল্যাণের দায়দায়িত্ব তোমার নেই। আমি তোমারই ইচ্ছেমতো চলবো, তোমারই কাছে আমি ফিরে যাবো। বড়ই প্রাচুর্যময় তুমি, বড়ই আলীশান তুমি প্রভু! তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাই আর তোমারই দিকে আমি মুখ ফিরালাম।"

সাধারণত রাত্রের নামাযে (তাহাজ্জুদে) রসূলুল্লাহ সা. এই দু'আ করতেন। আবার কখনো এসময় তিনি এই দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ০

অর্থ : আয় আল্লাহ! তুমিই জিবরিল ও ইসরাফীলের প্রভু, আসমান যমীনের স্রষ্টা এবং দৃশ্য অদৃশ্যের জ্ঞানী। তোমার বান্দাদের মধ্যকার বিরোধের তুমিই মীমাংসা দিয়ে থাকো। তোমার নির্দেশে আমি মহাসত্য নিয়ে যে বিরোধের সম্মুখীন হয়েছি, সে ব্যাপারে তুমি আমাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দান করো। তুমি তো যাকে ইচ্ছে করো সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়ে থাকো।"

কখনো আবার নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ ০

অর্থ : আমার আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসার মালিক তুমি। মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী আর এগুলোর মাঝে যা কিছু আছে, সেগুলোর তুমিই আলোকবর্তিকা।"

- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করার পর উপরোক্ত দু'আটি পড়তেন।

আবার কখনো তিনি তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا তিনবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا তিনবার سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً এবং সেই সাথে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ ০ বলতেন।

কখনো اَللّٰهُ اَكْبَرُ দশবার, سُبْحَانَ اللّٰهِ দশবার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দশবার, لَا اِلٰهَ

اِلَّا اللّٰهُ দশবার, اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ দশবার এবং اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ দশবার, অতপর

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ দশবার বলতেন। রসূলুল্লাহ সা. তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করার পর এই দু'আগুলোর কোনো না কোনোটি পড়তেন বলে সহীহ্ সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিম্নোক্ত সানা পড়ে নামায শুরু করতেন :

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

অর্থ হে আল্লাহ! সমস্ত দোষত্রুটি, অক্ষমতা ও দুর্বলতা থেকে পবিত্র তুমি। আমি তোমারই প্রশংসা করি। মোবারক তোমার নাম। সর্বোচ্চ তোমার শান। আর তুমি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ্।"

- এ সানাটির (আল্লাহর প্রশংসামূলক বাক্যের) কথা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন সুনান গ্রন্থে আলী ইবনে আলী রিফায়ী থেকে। তিনি আবীল মুতাওয়াককাল এবং তিনি আবি সায়ীদ রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রা. থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। উমর রা. ইমামতি করার সময় এটি শব্দ করে উচ্চারণ করতেন এবং সবাইকে শিক্ষাদান করতেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, আমি উমর রা.-কে অনুসরণ করে এ দু'আটি পড়া পছন্দ করি। তবে উপরে বর্ণিত যে কোনো একটি দু'আ পড়ে যদি কেউ নামায শুরু করে, তবে তা সহীহ্।

ইমাম আহমদ যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন, এ দু'আটি শ্রেষ্ঠ, পূর্ণাংগ ও উত্তম। উমর রা. ইমামতির সময় যে এটি সবাইকে শুনিয়ে পড়েছেন, তার অর্থ হলো, সবাই যেনো নামাযের শুরুতে এটি পড়ে। বিশেষ করে সবাই যেনো ফরয নামাযে এটি পড়ে।

সূরা ফাতিহা পাঠ

উপরে বর্ণিত সানা/দু'আ পড়ার পর রসূলুল্লাহ সা. 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।' পড়তেন। অতপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমসহ সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

সূরা ফাতিহা তিনি কখনো শব্দ করে পড়তেন, আবার কখনো নি:শব্দে পড়তেন। তবে বেশির ভাগ সময় শব্দ করে পড়তেন। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই তিনি শব্দ করে পড়তেন না। আবাসেও নয়, প্রবাসেও নয়। যদি

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই তিনি শব্দ করে পড়ে থাকতেন, তবে খুলাফায়ে রাশেদীন, অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম এবং বিশেষ করে মদীনাবাসীর কাছে তা কী করে অজ্ঞাত থাকতে পারতো? তাই একথা নিশ্চিত যে, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়তেন না।

তিনি যখন সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়তেন, তখন শুরুতে বিসমিল্লাহ্ও শব্দ করে পড়তেন।

আমীন উচ্চারণ

সূরা ফাতিহা শেষ করে তিনি 'আমীন' বলতেন। সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়লে 'আমীন'ও সশব্দে উচ্চারণ করতেন এবং তাঁর সাথে মুক্তাদিরাও সশব্দে 'আমীন' উচ্চারণ করতেন।

ক্ষণিক চুপ থাকা

তিনি নামাযে কিছুক্ষণের জন্যে দু'বার নিরব থাকতেন। একবার তাকবীরে তাহরীমা এবং কিরাত (সূরা ফাতিহা) পাঠের মধ্যবর্তী সময়। এই নিরব থাকাটি সম্পর্কে আবু হুরাইরা রা. তাঁকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হয়েছেন।

দ্বিতীয়বার কখন নিরব থাকতেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন সূরা ফাতিহা পাঠের পর, আবার কেউ বলেছেন কুরআন পাঠ শেষ করে রুকূতে যাবার পূর্বে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রথমটি ছাড়াই তিনি দু'বার নিরব থাকতেন। এ মতটি মেনে নিলে তিনবার নিরব থাকা হয়ে যায়। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি মাত্র দু'বার নিরব থেকেছেন।

তৃতীয় যে নিরব থাকাটির কথা বলা হয় অর্থাৎ -রুকূতে যাবার আগে, সেটা মূলত তাঁর নিরব থাকা ছিলনা। সেটা ছিলো নি:শ্বাস ফেলে মনের প্রশান্তি অর্জনের জন্যে নেয়া খানিকটা সময়। কারণ তিনি কিরাত এবং রুকূকে একই নি:শ্বাসে মিলিয়ে ফেলতেন না।

তাকবীরে তাহরীমা এবং সূরা ফাতিহা শুরু করার মধ্যবর্তী সময়ের নিরব থাকাটা যুক্তিসংগত ছিলো। কারণ, সেটা ছিলো সূরা ফাতিহা আরম্ভ করার প্রস্তুতিমূলক নীরব থাকা।

দ্বিতীয় যে নিরব থাকাটা অর্থাৎ -সূরা ফাতিহা শেষ করার পর, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেটা ছিলো মুক্তাদিদের সূরা ফাতিহা শেষ করার অবকাশ দেয়ার জন্যে।

আর তৃতীয় নিরব থাকাটা অর্থাৎ -কিরাত শেষ করার পর এবং রুকূতে যাবার পূর্বে, সেটা ছিলো দম নিয়ে সুস্থির হবার জন্যে ক্ষণকালের সামান্য বিরতি মাত্র।

যারা তৃতীয়টির কথা উল্লেখ করেননি, তারা তা করেননি সেটি খুব সংক্ষিপ্ত হবার কারণে। আর যারা সংক্ষিপ্ত হলেও সেটিকে গণ্য করেছেন, তাদের দৃষ্টিতে রসূল সা. তিন সময় নিরব থেকেছেন। সুতরাং দুটি বর্ণনার মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নেই। এ সংক্রান্ত হাদিসের এটাই মীমাংসা।

দু'টি নিরব থাকা সংক্রান্ত হাদিস সামুরা বিন জুনদুব রা., উব্বাই ইবনে কা'ব রা. এবং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবু হাতীম তাঁর সহীহ হাদিস সংকলনে এসব হাদিস উল্লেখ করেছেন।

যাঁরা দু'বার নিরব থাকার হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের একজন সামুরা বিন জুনদুব। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা.-এর নামায থেকে আমি তাঁর দু'বার নিরব থাকার বিষয়টি মুখস্ত করে রেখেছি। তিনি একবার নিরব থাকতেন তাকবীরে তাহরীমার পর, আর দ্বিতীয়বার 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দালীন'- পড়ার পর।

কোনো কোনো সূত্রের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'রসূল সা. কিরাতের পর কিছুক্ষণ নিরব থাকতেন।' কিন্তু এটা একেবারে এজমালি কথা। প্রথমোক্ত হাদিসের অর্থাৎ হযরত সামুরার হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট। তাতে পরিষ্কারভাবে সূরা ফাতিহা পাঠের পর নিরব থাকার কথা বলা হয়েছে।.... সুতরাং সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত হাদিসই এক্ষেত্রে দলিল।

তাঁর কিরাত (নামাযে কুরআন পাঠ) পদ্ধতি

রসূলুল্লাহ সা.-এর কিরাত (নামাযে কুরআন পাঠ) ছিলো টানা টানা। প্রতিটি আয়াত পাঠ করে থামতেন। আয়াত শেষ করার সময় একটু টানা আওয়াযে শেষ করতেন।

সূরা ফাতিহা শেষ করার পর তিনি অন্য সূরায় যেতেন। অন্য সূরায় গিয়ে কিরাত কখনো দীর্ঘ করতেন, আবার কখনো সফর বা অন্য কোনো কারণে সংক্ষিপ্ত করতেন। তবে তাঁর কিরাত সাধারণত হ্রস্ব বা দীর্ঘ না হয়ে মধ্যম রকম হতো।

বিভিন্ন নামাযে তাঁর কিরাত

ফজর নামাযে সাধারণত ষাট থেকে একশত আয়াত পড়তেন। ফজর নামাযে প্রায়ই তিনি সূরা ক্বাফ, সূরা আর রূম, সূরা তাকবীর, কখনো উভয় রাকাতে সূরা যিলযাল এবং কখনো ফালাক ও নাস পড়তেন। তবে সফরের সময়ই ফালাক ও নাস্ দিয়ে পড়তেন। কখনো সূরা মু'মিনূন দিয়ে উভয় রাকাত পড়তেন। এই সূরার যেখানে মূসা ও হারূণের কথা উল্লেখ হয়েছে সেখান পর্যন্ত পয়লা রাকাতে আর বাকি অংশ দ্বিতীয় রাকাতে পড়তেন।

জুমার দিন ফজরে সূরা আসসাজদা এবং সূরা আদ দাহার পূরো পড়তেন। এই সূরার এক অংশ ঐ সূরার একাংশ- এমনটি পাঠ করতেন না। তাছাড়া সূরা আসসাজদাকে ভেংগে উভয় রাকাতে পড়তেন না, পূরোটা এক রাকাতে পড়তেন। এমনটি তাঁর নিয়মের খেলাফ। যারা জুমার দিন ফজর নামায শুধুমাত্র সূরা আসসাজদা দিয়ে পড়াকে উত্তম মনে করে, তারা রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞ। লোকদের এই অজ্ঞতাপূর্ণ ধারণার জন্যে কোনো কোনো ইমাম জুমার দিন ফজরে সূরা আসসাজদা পড়া অপছন্দ করতেন।

মূলত রসূলুল্লাহ সা. উপরোক্ত দুটো সূরা দিয়েই জুমার দিন ফজর নামায পড়াতেন। কারণ এদুটো সূরাতে মানব সৃষ্টির সূচনা, মানুষের শেষ পরিণতি, আদমের সৃষ্টি, জান্নাত ও জাহান্নামে যাবার কারণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মানব জীবনে যা ঘটেছিল এবং যা সংঘটিত হবে, এগুলোতে তাই বর্ণিত হয়েছে বলে জুমার দিন সকালে তিনি সবাইকে এ সূরাগুলো শুনাতেন। এই একই কারণে তিনি জুমা এবং ঈদের নামাযে সূরা ক্বাফ, সূরা আল ক্বামার, সূরা আল আ'লা এবং সূরা আল গাশিয়া পাঠ করতেন।

রসূলুল্লাহ সা. যুহর নামাযেও প্রায়ই কিরাত দীর্ঘ করতেন। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবু সায়ীদ খুদরি রা. বর্ণনা করেছেন : যুহর-এর ইকামত হবার পর কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেবার জন্যে জান্নাতুল বাকিয়ীতে যেতো এবং সেখান থেকে কাজ সম্পন্ন করে, নিজের বাসা থেকে অযু করে ফিরে আসতো, তবে নবী সা.-কে প্রথম রাকাতেই ধরতে পারতো। যুহর নামাযে তিনি কখনো কখনো এ ধরনেরই লম্বা কিরাত নিতেন। যুহরে কখনো তিনি সূরা আসসাজদার সমপরিমাণ কিরাত পড়তেন। কখনো পড়তেন সূরা আল আ'লা এবাং আল লাইল, কখনো বা সূরা বুরূজ এবং আত্ তারিক।

আসর নামাযে তিনি যুহরের অর্ধেক পরিমাণ কিরাত পড়তেন। কখনো এর চাইতে একটু দীর্ঘ, আবার কখনো একটু হ্রস্ব।

মাগরিবের কিরাত-এর ক্ষেত্রে তাঁর নিয়ম ছিলো বর্তমান কালের লোকেরা যা করছে, তার চাইতে ভিন্নতর। তিনি কখনো সূরা আ'রাফ, কখনো সূরা আত তূর এবং কখনো সূরা আল মুরসালাত দিয়ে মাগরিবের নামায পড়তেন। এর একটি সূরাকে দুই রাকাতে ভাগ করে পড়তেন।

আবু উমর ইবনে আবদুল বার এক্ষেত্রে নবী করীম সা.-এর আমল সম্পর্কে বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি মাগরিবের নামায কখনো সূরা আরাফ, কখনো সূরা আস্সাফ্ফাত, কখনো সূরা দুখান, কখনো সূরা আল আ'লা, কখনো সূরা তীন, কখনো মুয়াব্বেযাতাইন (নাস ও ফালাক) এবং কখনো

সূরা আল মুরসালাত দিয়ে পড়েছেন। এছাড়া তিনি মাগরিবের নামায ছোট ছোট সূরা দিয়েও পড়তেন। এসবগুলো বর্ণনাই সহীহ সূত্রে খ্যাতি অর্জন করেছে।

তবে সবসময় ছোট সূরা দিয়ে মাগরিবের নামায পড়াটা ছিলো মারওয়ান[১] ইবনে হাকামের কাজ। এ কারণে হযরত যায়েদ বিন সাবিত তার সমালোচনা করেছেন। হযরত মালিক বলেছেন তোমরা কেবল ছোট ছোট সূরা দিয়ে মাগরিবের নামায পড়ছো, অথচ আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে দুটি দীর্ঘ সূরার একটি অর্থাৎ সূরা আ'রাফ পড়তে দেখেছি।' এটি সহীহ হাদিস। সুনান সংকলকগণ এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন রসূলুল্লাহ সা. মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফ পড়েছেন। সূরাটিকে দুইভাগ করে দুই রাকাতে পড়েছেন।' তাই সব সময় শুধুমাত্র ছোট ছোট আয়াত এবং ছোট ছোট সূরা দিয়ে মাগরিবের নামায পড়াটা সুন্নতের খেলাফ। এটা হলো মারওয়ান ইবনে হাকামের কাজ।

পাঁচ ওয়াক্তের শেষ ওয়াক্ত হলো ইশার নামায। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি ইশার নামাযে সূরা 'আততীন' পড়েছেন। আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি মুয়ায বিন জাবালকে ইশার নামাযে সূরা 'আশ শাম্‌স', সূরা 'আল-আ'লা' এবং সূরা 'আল-লাইল' জাতীয় সূরা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি মুয়াযকে অধিক রাতে আমর বিন আউফ গোত্রে গিয়ে ইশার নামায পড়াবার সময় সূরা বাকারা দিয়ে পড়াতে নিষেধ করেছেন।

ঘটনাটা হলো, মুয়ায রা. রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে ইশার নামায পড়তেন। তারপর আমর বিন আউফ গোত্রে গিয়ে সেখানকার অপেক্ষমান লোকদের ইশার নামায পড়াতেন। তিনি নবীর মসজিদ থেকে ইশা পড়ে ঐ গোত্রে যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে যেতো। তিনি নবীর পেছনে মুক্তাদি হিসেবে নামায পড়ে গিয়ে পুনরায় ইমাম হিসেবে এই লোকদের ইশার নামায পড়াতেন। কিন্তু এতো অধিক রাতেও তিনি সূরা বাকারা দিয়ে নামায পড়াতেন। এতে দিনের শ্রমজীবি লোকদের খুব কষ্ট হতো। বিষয়টি রসূলুল্লাহ সা.-এর গোচরীভূত হলে তিনি মুয়ায রা.-কে উপরোক্ত নির্দেশ দেন এবং বেশি রাতে লম্বা কিরাত পড়ে মানুষকে সমস্যায় ফেলতে নিষেধ করেন।

---

১. মারওয়ান ইবনে হাকাম চতুর্থ উমাইয়া খলিফা অর্থাৎ মুয়াবিয়া রা. > ইয়াযীদ > মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযীদ > মারওয়ান ইবনে হাকাম। তার রাজত্বকাল ছিলো ৬৪-৬৫ হিজরি। এই মারওয়ানের কারণেই হযরত উসমানের শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়।

জুমার নামাযে তিনি সূরা আল জুমা এবং আল মুনাফিকুন পড়তেন। আবার কখনো সূরা আল-আ'লা এবং আল গাশিয়াও পড়তেন। কিন্তু প্রথমোক্ত সূরা দু'টির কেবল শেষাংশ[২] দিয়ে তিনি কখনো নামায পড়াতেন না। এটা তাঁর নিয়মেরও খেলাফ।

ঈদের নামাযে তিনি সূরা ক্বাফ এবং সূরা ক্বামার পুরো পড়তেন। কখনো বা সূরা আল আ'লা এবং সূরা আল গাশিয়া পড়তেন। উভয় ঈদেই তিনি এমনটি করতেন।

মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কোন্ নামাযে কি ধরণের কিরাত পড়েছেন, এই হলো তার সঠিক নির্দেশিকা। খুলাফায়ে রাশেদীন তাঁর এই নির্দেশিকার অনুসারী ছিলেন।

আবু বকর রা. ফজর নামাযে সূরা বাকারা শেষ করতেন। ফলে সালাম ফেরাতে সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময় হয়ে যেতো। একদিন লোকেরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো : ওহে আল্লাহ্র রসূলের খলিফা! সূর্যোদয়ের তো সময় হয়ে গেছে? তিনি জবাব দেন : সূর্যোদয়ের ব্যাপারে তোমরা আমাকে অসতর্ক মনে করোনা। উমর রা. ফজর নামাযে সূরা ইউসুফ, সূরা আন নহল, সূরা হুদ, সূরা বনি ইসরাঈল এবং অনুরূপ অন্যান্য সূরা পড়তেন।

ফজর নামাযে রসূলুল্লাহ্ সা. যে লম্বা কিরাত পড়তেন তা যদি রহিতই হতো, তবে সেটা খুলাফায়ে রাশেদীন এবং লম্বা কিরাতের সমালোচন-কারীদের কাছে গোপন থাকতোনা। সহীহ্ মুসলিমে জাবির বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ্ সা. ফজর নামাযে সূরা ক্বাফ পড়তেন এবং এরপর তাঁর নামায সংক্ষেপ হতো।' এখানে 'এরপর' মানে ফজরের পরে। অর্থাৎ তাঁর ফজরের কিরাত লম্বা হতো এবং ফজরের পরের নামাযগুলোতে কিরাত সংক্ষেপ হতো। একথার প্রমাণ হযরত আব্বাস-এর স্ত্রী উম্মুল ফদলের বক্তব্য। তিনি (তাঁর স্বামীর পুত্র) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে আরাফাতে সূরা 'আল মুরসালাত' পড়তে শুনে জিজ্ঞাসা করলেন : বাবা! তুমি না আমাকে বলেছিলে, তুমি রসূলুল্লাহ্ সা.-কে জীবনের শেষ মাগরিব নামাযে এ সূরাটি পড়তে শুনেছিলে?'

আর জাবির ও সামুরার হাদিসে 'এরপর' শব্দটিতে 'এর' সর্বনাম রয়েছে। 'এর' সর্বনামটির অন্তরালে এখানে নির্দেশিত নামটি উহ্য বা গোপন রয়েছে।

একথা সকলেরই জানা, সর্বনাম সবসময় পূর্বোল্লেখিত নামের পরিবর্তেই

---

২. সূরা জুমা এবং সূরা মুনাফিকুন এই দুটি সূরারই শেষাংশ 'ইয়া আইউহাল্লাযীনা আ-মানু' দিয়ে শুরু ।

ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই এখানে 'এরপর' বলতে ফজরের পরে বুঝতে হবে, এছাড়া অন্য কিছু বুঝার অবকাশ নাই।

সুতরাং উক্ত হাদিসের 'এরপর' অর্থ হলো, রসূল সা. ফজরের পরের নামাযগুলোর কিরাত সংক্ষেপে করতেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সেদিনের পর থেকে সব নামাযের কিরাত সংক্ষেপ করেছেন। এই অর্থ হয়ে থাকলে সেটা খুলাফায়ে রাশেদীনের কাছে গোপন থাকতোনা। তাঁরা রসূল সা.-এর 'রহিতকারী' আমলের কথা জেনেও 'রহিত' আমলের অনুসরণ করে সন্তুষ্টি থাকতেন না।

কিরাত সংক্ষেপ করা সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ সা.-এর বক্তব্য তোমাদের কেউ ইমামতি করলে সে যেনো কিরাত সংক্ষেপ করে।' আর হযরত আনাসের বর্ণনা : রসূলুল্লাহ সা. সব নামাযের ক্ষেত্রেই কিরাত সংপেক্ষ করার নীতি অবলম্বন করতেন।' এ দুটো বক্তব্যেরই মানদণ্ড হবে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা.-এর আমল। অর্থাৎ এ দুটো হাদিসে যে সংক্ষেপনের কথা বলা হয়েছে, তার বাস্তব রূপ ছিলো কিরাত পড়ার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সা.-এর বাস্তব আমল- যা এতোক্ষণ আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

এ দুটো বক্তব্য থেকে রসূল সা.-এর বাস্তব আমল-এর বিপরীত কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণ করার অবকাশ নেই। কারণ তিনি এক রকম করবেন আর অন্যরকম বলবেন- তা কিছুতেই হতে পারেনা। নি:সন্দেহে তিনি সেরকম সংক্ষেপ করার কথাই বলেছেন, যেরকমটি তিনি নিজে পড়তেন। একথাও সকলেরই জানা যে, তাঁর পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকেরাও নামায পড়তো।

এই লম্বা ও সংক্ষেপ কিরাত সংক্রান্ত ইখতিলাফের মীমাংসা এটা হতে পারে যে, তিনি প্রথম প্রথম খুব দীর্ঘ কিরাত পড়তেন এবং পরবর্তীকালে তা কিছুটা সংক্ষেপ করে কম লম্বা কিরাত পড়তেন। এই সমাধানটির পক্ষে দলিলও আছে। ইমাম নাসায়ী এবং অন্যান্য হাদিসের ইমামগণ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে কিরাত সংক্ষেপ করার কথা বলতেন এবং তিনি আমাদের ইমামতি করতেন সূরা আস সাফফাত দিয়ে।" সুতরাং সংক্ষেপের উদাহরণ হলো সূরা আস সাফফাত। (আল্লাহই অধিক জানেন)

রসূলুল্লাহ সা. কোনো নামাযের জন্যে কোনো সূরা নির্দিষ্ট করে সে নামাযে কেবল সে সূরাই পড়তেন- এমনটি করতেন না। তবে জুমা এবং দুই ঈদের নামায এর ব্যতিক্রম।

আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাদা বলেছেন : ছোট বা বড় এমন কোনো সূরা নেই, যেটি রসূল সা. ফরয নামাযে ইমামতি করার সময় পড়েন নাই।' হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদে।

রসূলুল্লাহ সা. এক নামাযে একটি পূর্ণ সূরা পড়তেন। কখনো এক রাকাতে একটি পূর্ণ সূরা পড়তেন, আবার কখনো একটি সূরাকে ভেংগে দু'রাকাতে পড়তেন। কখনো কখনো সূরার প্রথম অংশ পড়তেন। কিন্তু কোনো সূরার মাঝের বা শেষের অংশ পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই।

তিনি নফল নামাযে একই রাকাতে দু'টি সূরা পড়েছেন। কিন্তু ফরয নামাযে এক রাকাতে দুটি সূরা পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি রাকাতে দুটি করে সূরা পড়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সেটা একটা এজমালি কথা। এমনটি তিনি ফরয নামাযে করেছেন, নাকি নফল নামাযে, সেকথা এখানে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই।

আবু দাউদে জুহাইনা গোত্রের জনৈক ব্যক্তির যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে ঐ ব্যক্তি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে ফজরের উভয় রাকাতে সূরা যিলযাল পড়তে শুনেছি।' কিন্তু ঐ ব্যক্তিই একথা বলার পর বলেন : 'তবে তিনি উভয় রাকাতে সূরা যিলযাল কি ভুলবশত পড়েছেন, নাকি ইচ্ছাকৃত, সেটা আমি জানিনা।'

রসূলুল্লাহ সা. দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় প্রথম রাকাতের কিরাত লম্বা করতেন। ফজরসহ প্রত্যেক নামাযেই এমনটি করতেন। কখনো কখনো প্রথম রাকাত ততোক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করতেন, যতোক্ষণে মুসল্লিদের (মসজিদে আসার) পদক্ষেপের শব্দ বন্ধ হতো। অর্থাৎ সব মুসল্লি এসে প্রথম রাকাত ধরা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করতেন।

তিনি অন্যান্য নামাযের তুলনায় ফজর নামাযের কিরাত দীর্ঘ করতেন। ফজর নামায দীর্ঘ করার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে :

ক. যেহেতু ফজরের কুরআন পাঠে ফেরেশতারা উপস্থিত থাকেন। এসময় রাত ও দিনের ফেরেশতাদের সমাগম ঘটে। কারণ এটা তাদের ডিউটি বদলের সময়।

খ. যেহেতু ফজর নামাযে রাকাত সংখ্যা কম।

গ. যেহেতু মুসলমানদেরকে ঘুম ও বিশ্রাম থেকে উঠে এসে ফজর নামায ধরতে হয়।

ঘ. যেহেতু এ নামাযের পরেই মুসলমানরা একটা দীর্ঘ সময়ের জন্যে

উপার্জনের কাজে বেরিয়ে পড়ে। তাই দীর্ঘ সময় ধরে যেনো তাদের মধ্যে কুরআনের প্রভাব বিরাজ করে।

ঙ. যেহেতু এসময় মানুষের মন প্রশান্ত থাকে এবং মনোযোগের সাথে কুরআন শুনার, বুঝার ও চিন্তা করার সুযোগ থাকে।

চ. যেহেতু এটাই দিনের প্রথম আমল, তাই এর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং এর মাধ্যমে দিনের সূচনাতেই বেশি বেশি নেকি ও কল্যাণ অর্জন করে নেয়ার আকাংখা পোষণ করতেন।

জ্ঞানী লোকদের পক্ষে শরীয়তের এই হিকমত, তাৎপর্য ও নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বুঝে নিতে কোনোই অসুবিধা হয়না।

তাঁর রুকূ করার পদ্ধতি

রসূলুল্লাহ সা. কিরাত শেষ করে নি:শ্বাস নিয়ে প্রশান্তি অর্জনের জন্যে খানিকটা সময় নিরব থাকতেন। তারপর তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময়কার মতো 'রফে ইয়াদাইন' করতেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে চলে যেতেন।

রুকূতে গিয়ে জড়িয়ে ধরার মতো দু'হাত হাঁটুতে স্থাপন করতেন। দু'বাহু পাঁজর থেকে আলগা করে ফাঁকা করে রাখতেন। পিঠ সোজাসুজি লম্বা করে বিছিয়ে রাখতেন। মাথা পিঠের বরাবর রাখতেন, উঁচু বা নিচু করে রাখতেন না।

তিনি রুকূতে গিয়ে এই ভাষায় তাসবীহ্ উচ্চারণ করতেন :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

কখনো বা এর সাথে নিম্নোক্ত তাসবীহ্ও যোগ করে উচ্চারণ করতেন :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ.

অর্থ (উভয় বাক্যের) আমার মহান প্রভু সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত পবিত্র মহীয়ান। সমস্ত ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার হে আমাদের প্রভু। ওগো আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

তিনি রুকূতে গিয়ে এতোটা সময় থাকতেন যে, উপরোক্ত তাসবীহ প্রায় দশবার পড়া যেতো। সাজদাতেও তিনি এতোটা সময়ই থাকতেন। এ ক্ষেত্রে বারা ইবনে আযেব রা.-এর বক্তব্য কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে। তিনি বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা.-এর মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর পেছনে নামায পড়েছি। তাঁর কিয়াম এবং রুকূর সময় (দৈর্ঘ) সমান

হতো।. সাজদা এবং দুই সাজদার মাঝের বৈঠকও প্রায় সমপরিমাণ সময় নিয়ে হতো।"

এ বক্তব্য থেকে একদল লোক বুঝে নিয়েছেন যে, রসূল সা.-এর কিয়াম ও রুকূ সমপরিমাণ লম্বা হতো এবং সাজদাও সে পরিমাণ লম্বা হতো। আসলে এ ধরনের বুঝ গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই। কারণ রসূলুল্লাহ সা.-এর কিরাতের দৈর্ঘ তো সুপ্রমাণিত। ফজর নামাযে তিনি একশ আয়াত বা তার কিছু কমবেশি পরিমাণ পড়তেন। তাঁর মাগরিবের কিরাত সংক্রান্ত হাদিসও আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে, তিনি মাগরিব নামাযে সূরা আ'রাফ, সূরা তূর এবং সূরা মুরসালাতও পড়তেন। কিন্তু একথা তো সবারই জানা যে, তিনি রুকূ ও সাজদাতে গিয়ে এতোটা দীর্ঘ সময় থাকতেন না।

একথার প্রমাণ সুনান সমূহে[৩] বর্ণিত আনাসের হাদিস। এতে আনাস রা. বলেন : 'রসূলুল্লাহ সা.-এর পরে আমি তাঁর অনুরূপ নামায আর কারো পিছে পড়িনি এই যুবকটি (অর্থাৎ উমর ইবনে আবদুল আযীয) ছাড়া।' বর্ণনাকারী বলেন : আমি উমর ইবনে আবদুল আযীযের রুকূ ও সাজদায় দশবার করে তসবীহ পড়েছি।'

এছাড়া আনাস রা. থেকে বর্ণিত ঐ হাদিসটিও এর প্রমাণ, যাতে তিনি বলেছেন রসূলুল্লাহ সা. আমাদের ইমামতি করার সময় সূরা আস্ সাফফাত পড়তেন।'

এখন বারা ইবনে আযেব রা.-এর বক্তব্যের অর্থ যে কী- তা আল্লাহই ভালো জানেন।[৪]

রসুলুল্লাহ সা.-এর নামাযের বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্বাভাবিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকতো। তিনি যখন কিয়াম (কিরাত) লম্বা করতেন তখন স্বাভাবিকভাবে রুকূ-সাজদাও লম্বা করতেন। আবার যখন কিয়াম সংক্ষিপ্ত করতেন, তখন রুকূ সাজদাও সংক্ষিপ্ত করতেন।

তিনি রাতের নামাযে (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযে) কখনো কখনো রুকূ-সাজদা কিয়ামের সমান লম্বা করেছেন। সূর্যগ্রহণের নামাযেও প্রায় এমনটিই করতেন।

নামাযের বিভিন্ন অংগ ও অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য ও স্বাভাবিকতা বজায় রাখার প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর থেকে প্রাপ্ত নির্দেশিকা তাই, যা উপরে বর্ণনা করা হলো।

---

৩. সিহাহ সিত্তার ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থের মধ্যে বুখারি ও মুসলিম ছাড়া বাকি চারটিকে 'সুনান' বা সুনানে আরবা'আ বলা হয়।

৪. আমাদের মতে "তাঁর কিয়াম ও রুকূর সময় (দৈর্ঘ) সমান হতো"- হযরত বারা ইবনে আযেবের এই বক্তব্যে কিয়াম অর্থ রুকূর পরবর্তী এবং সাজদায় যাবার পূর্ববর্তী কিয়াম।

রাতের (তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল) নামাযে তিনি রুকূতে গিয়ে নিম্নোক্ত দু'আ এবং তাসবীহগুলোও পড়তেন :

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

অর্থ সকল দুর্বলতা, ত্রুটি ও অক্ষমতামুক্ত অতিশয় পাক-পবিত্র তুমি সকল ফেরেশতা ও জিবরিলের প্রভু।"

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّىْ، خَشَعَ لَكَ

سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ وَمَاسْتَقَلَّتْ بِهٖ قَدَمِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

অর্থ : আমার প্রভু! আমি তোমার জন্যে মাথা নতো করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছি এবং তোমারই উপর ভরসা করেছি। তুমিই আমার মনিব। আমার কান, চোখ, মগয, হাড়, শিরা-উপশিরা সবই তোমর প্রতি বিনয়াবনত হয়েছে। আমার পা যতোবার উপরে উঠে আর যতোবার নিচে নামে, তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্যেই উঠে নামে।"

রুকূ থেকে দাঁড়ানো

অতপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় তিনি :

১. রফে ইয়াদাইন করতেন (দুই হাত উঠাতেন)।

২. এবং নিম্নোক্ত তাসবীহ্ পড়তেন : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

অর্থ : আল্লাহ্ শুনেছেন তাঁর বান্দা কার প্রশংসা করেছে?"

এ সময় এবং উপরে বর্ণিত দু'বারসহ তিনি মোট তিন সময় রফে ইয়াদাইন করতেন।[৫]

এই তিন সময় তিনি যে 'রফে ইয়াদাইন' করতেন, সে সম্পর্কে প্রায় ত্রিশজন সাহাবি বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে এর বিপরীত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না। মৃত্যু পর্যন্ত সারাজীবন তিনি এ নিয়মেই নামায পড়তেন।

বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদিসটি সহীহ নয়। মূলত রসূলুল্লাহ্ সা. কখনো এ নিয়ম পরিত্যাগ করেননি এবং এ থেকে প্রত্যাবর্তনও করেননি।

৫. অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকূতে যাবার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময়। অবশ্য সামনে আরেকটি রফে ইয়াদাইনের কথা আসবে।

ইবনে মাসউদ রা.-এর রফে ইয়াদাইন ত্যাগ করাটা এজন্যে ছিলনা যে, তিনি তা রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে জানতে পেরেছেন। তিনি আসলে রফে ইয়াদাইনের সাথে বিরোধও করেননি এবং তার পরিপন্থী কাজও করেননি। ব্যাপারটা হলো, সেকালে আমীর-উমরারা দেরি করে নামাযে আসতেন। ফলে তিনি আযান-ইকামত ছাড়া ঘরেই নামায পড়তেন। এসময় তাঁর দুপাশে দু'জন মুক্তাদি দাঁড়াতো। তিনি ইমাম হিসেবে সামনে না দাঁড়িয়ে তাদের সমান্তরালে তাদের মাঝখানে দাঁড়াতেন। এতে করে রফে ইয়াদাইন করতে অসুবিধা হতো বলে তিনি তা করতেন না।

অথচ তাঁর এই নিয়মের বিপরীতে রয়েছে বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদিস। রসূলুল্লাহ সা. থেকে রফে ইয়াদাইন সম্পর্কে এতোগুলো সহীহ, অকাট্য ও সুপ্রমাণিত আমলী হাদিস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কী করে তা বর্জন করা যেতে পারে? এমনটি অকল্পনীয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে রসূলুল্লাহ সা.-এর কর্মনীতি অনুসরণ করার ওতফীক দান করুন- আমীন।

তিনি রুকূ থেকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতেন। তিনি বলেছেন :

لَاتَجْزِىْ صَلَاةً لَايُقِيْمُ فِيْهَا الرَّجُلُ صُلْبَهٗ فِىْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ○

অর্থ ঐ নামাযের কোনো জাযা নেই, যাতে (নামাযী) ব্যক্তি রুকূ ও সাজদা থেকে মেরুদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ায়না এবং বসেনা।" (সহীহ্ ইবনে খোযায়মা)

রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে কী বলতেন ?

তিনি যখন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন :

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, কখনো বলতেন رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, আবার কখনো বলতেন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

অর্থ : হে আল্লাহ/আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমারই।"

এই তিনটি বাক্যই রসূলুল্লাহ সা. থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ রকম বলাটা সহীহ্ নয় : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ কারণ, তিনি একই বাক্যে 'আল্লাহুম্মা' -এর সাথে 'ওয়াও' যুক্ত করতেন না। রসূলুল্লাহ সা. রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে যে কিয়াম করতেন, তা সময়ের দিক থেকে তাঁর রুকূ ও সাজদার সমান দীর্ঘ হতো। সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে কখনো এই দু'আ পড়তেন :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ○

অর্থ আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির কথা শুনেন (কবুল করেন), যে তাঁর প্রশংসা করে। আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। মহাবিশ্ব পূর্ণ করা প্রশংসা তোমার। এই পৃথিবী পূর্ণ করা প্রশংসা তোমার। এ ছাড়াও তুমি যা চাও, তা পূর্ণ করা প্রশংসা তোমার। তোমার বান্দা যতো গুণ, প্রশংসা ও মর্যাদার কথা বলে, তা পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য ও অধিকারী তুমিই। আমরা সবাই তোমারই দাসানুদাস। আমার আল্লাহ্! তুমি যা দিতে চাও, তা ঠেকাবার কেউ নেই। আর তুমি যা না দিতে চাও, তা দেয়ার সাধ্য কারো নেই। কোনো ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা ও বিত্তশালী ব্যক্তির বিত্ত তোমার দরবারে তার কোনো উপকারে আসেনা।"

সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রুকুর পরের কিয়ামে তিনি এই দু'আও করতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ○

অর্থ ওগো আল্লাহ্! আমার ভুলত্রুটি থেকে আমাকে পানি, বরফ এবং ঠাণ্ডা বস্তু দিয়ে ধুইয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দাও। গুনাহ্খাতা থেকে আমাকে সেরকম মুক্ত করো, যেমনিভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করে ধবধবে করা হয়। উদয়াচল এবং অস্তাচলের মাঝে তুমি যেরকম দূরত্ব সৃষ্টি করেছো, আমার ও আমার গুনাহ্ খাতার মাঝে তুমি সেরকম দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও।"

তাছাড়া রুকূর পরের কিয়ামে তিনি নিম্নের কথাগুলোও অনেকবার উচ্চারণ করতেন :

لِرَبِّىَ الْحَمْدُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ ○

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আমার রবের, সমস্ত প্রশংসা আমার প্রভুর.....।

এভাবে তাঁর এই কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকূর সমপরিমাণ দীর্ঘ হয়ে যেতো।

তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে এতোটা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন (কিয়াম করতেন) যে, লোকেরা বলাবলি করতো : হয়তো তিনি ভুলে গেছেন।

সহীহ মুসলিমে আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ সা. যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রুকূ থেকে দাঁড়াতেন, তখন এতোটা সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা বলতাম 'হয়তো তিনি সন্দেহে পড়েছেন।' অতপর সাজদায় যেতেন। তারপর দুই সাজদার মাঝখানে এতোটা দীর্ঘসময় বসে থাকতেন যে, আমরা বলতাম 'হয়তো তিনি ভুলে গেছেন।'

সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সা. সূর্যগ্রহণের নামাযে রুকূর পরের এই কিয়ামটি এতোই দীর্ঘ করতেন যে, তা প্রায় রুকূর সমান দীর্ঘ হতো। আর তাঁর সে রুকূ হতো রুকূর পূর্বেকার কিয়ামের সমান দীর্ঘ।

রুকূ এবং রুকূর পরবর্তী কিয়াম (দাঁড়ানো) সম্পর্কে এগুলোই হচ্ছে রসূলুল্লাহ সা. থেকে সুপ্রমাণিত কথা। এগুলোর সাথে কোনো বিরোধ নেই এবং এগুলোর বিপরীত কোনো কথা নেই। কোনো সূত্রেই কোনো কথা নেই।

বাকি থাকলো বারা ইবনে আযেব রা. বর্ণিত হাদিসটি। সহীহ্ বুখারিতে বারা ইবনে আযেব রা. থেকে এ সম্পর্কে যে হাদিস উল্লেখ হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা.-এর রুকূ ও সাজদা, এবং জলসা ও কিয়ামের (বসা ও দাঁড়ানোর) সময় প্রায় সমপরিমাণ হতো।"

তবে কিরাত পড়ার কিয়াম এবং তাশাহ্হুদ পড়ার জলসা এগুলোর থেকে ব্যতিক্রম। কারণ নামাযে দুই ধরনের কিয়াম (দাঁড়ানো) এবং দুই ধরনের জলসা (বসা) হয়ে থাকে। বারা রা. রসূলুল্লাহ সা.-এর রুকূ, সাজদা এবং কিয়াম ও জলসা সমান হতো বলে রুকূর পরবর্তী কিয়াম এবং দুই সাজদার মধ্যবর্তী জলসাই বুঝিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের এ অর্থ গ্রহণ করলেই অন্যসবগুলো সহীহ হাদিসের সাথে এ বক্তব্যের কোনো বিরোধ থাকেনা। কারণ রসূলুল্লাহ সা.-এর কিয়াম এবং তাশাহ্হুদের জলসা যে নামাযের অন্যান্য আরকান থেকে দীর্ঘ হতো, সে কথাতো সুস্পষ্ট এবং সুপ্রমাণিত।

আমাদের উস্তাদ (ইমাম ইবনে তাইমিয়া) বলেছেন, বনি উমাইয়ার শাসকরা নামাযের এই দুটি রুকন সংক্ষেপ করে ফেলেছে। এভাবে তারা নামাযের আরো বিভিন্ন অংগে হস্তক্ষেপ করে বিভিন্ন রকম বিদআত সৃষ্টি করেছে। যেমন তকবীর পূর্ণ না করা, অনেক দেরি করে নামায পড়া ইত্যাদি। এমনকি তাদের সৃষ্টি করা এসব বিদআতকে তারা সুন্নত মনে করতো।

তাঁর সাজদায় যাবার পদ্ধতি

এভাবে প্রশান্তির সাথে (রুকূর পরবর্তী) কিয়াম শেষ করে রসূলুল্লাহ্ সা. 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন। এসময় তিনি 'রফে ইয়াদাইন' করতেন না।

তবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি এ সময়ও 'রফে ইয়াদাইন' করতেন। ইবনে হাযম রহ. প্রমুখ এ বর্ণনাকে সহীহ্ বলেছেন। আসলে এটা একটা অনুমানভিত্তিক বক্তব্য। মূলত রসূলুল্লাহ্ সা. সাজদায় যাবার সময় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন না। রাবির (হাদিস বর্ণনাকারীর) ভুলের কারণে তিনি এসময় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন বলে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

সাজদায় যাবার সময় রসূলুল্লাহ্ সা. হাতের পূর্বে হাঁটু যমীনে স্থাপন করতেন। তারপর দুই হাত, অতপর কপাল এবং সবশেষে নাক স্থাপন করতেন।

হাত আগে না হাঁটু আগে?

তিনি যে হাতের আগেই হাঁটু স্থাপন করতেন, একথা সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন শরীক > আসেম ইবনে কুলাইব থেকে > তিনি তাঁর পিতা থেকে > তিনি ওয়ালে ইবনে হিজর রা. থেকে। ওয়ালে রা. বলেন : "আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ্ সা. যখন সাজদা করতেন, তিনি দুই হাতের পূর্বে দুই হাঁটু স্থাপন করতেন। যখন সাজদা থেকে উঠতেন, তখন দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত উঠাতেন।"[৬]

-এর বিপরীত করতে তাঁকে দেখা যায়নি।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত একটি মরফু হাদিস এক্ষেত্রে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। হাদিসটি হলো : 'তোমাদের কেউ যখন সাজদায় যাবে, সে যেনো উটের নিয়মে না বসে, বরং সে যেনো দুই হাঁটুর আগে দুই হাত রাখে।'[৭]

এ হাদিসটির বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। তবে সম্ভবত, হাদিসটির মধ্যে কোনো না কোনো রাবি থেকে কিছু কল্পনা প্রসূত কথা ঢুকে পড়েছে। তাছাড়া এর প্রথমাংশ দ্বিতীয়াংশের সাথে অসংগতিপূর্ণ। হাঁটুর আগে যদি হাত রাখা হয়, তবে সেটা উটের মতোই বসা হয়। কারণ উট তার দুই হাতই আগে রাখে, হাঁটু নয়।

হাঁটুর আগে হাত রাখার পক্ষের লোকেরা যখন জানতে পারলেন, উট হাঁটুর আগে হাত বিছিয়ে দেয়, তখন তাঁরা ব্যাখ্যা দিলেন, উটের হাঁটু তার

---

৬. দেখুন তিরমিযি, নামায অধ্যায়।
৭. দেখুন, আবু দাউদ।

হাতের মধ্যেই থাকে, পায়ে নয়। আসলে এই ব্যক্তিগণের কথা কয়েক কারণে গ্রহণযোগ্য নয় :

এক : উট বসার সময় প্রথমে তার হাত দুটিই বিছিয়ে দেয়, তখন তার দুই পা দাঁড়ানো থাকে। আবার যখন বসা থেকে দাঁড়ায় তখন তার পা দুটি আগে উঠে এবং হাত দুটি তখনো মাটিতেই থাকে।

হাদিসে এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করতেই তো রসূল সা. নিষেধ করেছেন এবং তিনি এর বিপরীত করেছেন।

রসূলুল্লাহ সা. যমীনে প্রথমে সে অংগই স্থাপন করতেন, যেটি যমীনের বেশি কাছাকাছি, যেটি স্বাভাবিকভাবে আগে মটিতে স্থাপিত হতো। আবার উঠার সময় একটির পর একটি করে সেসব অংগই আগে উঠাতেন, যেগুলো পর্যায়ক্রমে মাটি থেকে বেশি উপরে থাকতো। তিনি সাজদায় যাবার সময় প্রথমে দুই হাঁটু রাখতেন, তারপর দুই হাত, তারপর কপাল। আবার সাজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে মাথা উঠাতেন তারপর দুই হাত, অতপর দুই হাঁটু।

এটাই উটের পদ্ধতির বিপরীত। এভাবে রসূলুল্লাহ সা. জন্তু-জানোয়ারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন, হিংস্র পশুদের মতো যমীনে হাত বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন, কুকুরের মতো হাত ছড়িয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন এবং কাকের মতো ঠোকর মারতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া তিনি সালামের সময় ঘোড়ার লেজের মতো হাত উঠাতেও নিষেধ করেছেন।

দুই তারা যে বলেছেন, 'উটের হাঁটু উটের হাতে থাকে'- এ এক বিস্ময়কর কথা। কোনো ভাষাবিদের পক্ষে এর অর্থ বুঝা এবং একথা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ হাঁটু হাতে নয়, পায়ে থাকে- এটাই সর্বজনবিদিত।

তিন সত্যিই যদি রসূলুল্লাহ সা. হাঁটুর আগে হাত রাখার কথা বলে থাকেন, তাহলে তিনি বলতেন তোমরা উটের মতো বসবে এবং হাঁটুর আগে হাত রাখবে।' তাহলেই বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো।

আমার ধারণা, আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত এ হাদিসটির বক্তব্য প্রথমত সঠিকই ছিলো। প্রথমে হাদিসটি সম্ভবত "........সে যেনো দুই হাতের আগে দুই হাঁটু রাখে'- ছিলো। পরবর্তীতে বর্ণনাকারীদের দ্বারা বক্তব্যের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে। যেমনটি হয়েছে আরো বিভিন্ন হাদিসের ক্ষেত্রে। যেমন সেহেরি খাওয়া সংক্রান্ত ইবনে উমর রা.-এর হাদিস। এতে তিনি রসূল সা. থেকে বর্ণনা করেছেন : বিলাল অধিক রাতে আযান দেয়। সুতরাং তার আযানের পরও তোমরা পানাহার করতে থাকো যতোক্ষণ না

ইবনে উম্মেম মাকতুম আযান দেয়।” এখানে পরবর্তী কোনো কোনো রাবি বিলালের জায়গায় ইবনে উম্মে মাকতুম এবং ইবনে উম্মে মাকতুমের জায়গায় বিলালের নাম উল্লেখ করেছেন। অন্য একটি হাদিসে পরবর্তী কোনো রাবি জান্নাতের স্থলে জাহান্নাম এবং জাহান্নামের স্থলে জান্নাত উল্লেখ করে গোলমাল করে ফেলেছেন।

- এভাবে এই হাদিসটিতে পরবর্তী কোনো রাবি হাতের স্থলে হাঁটু এবং হাঁটুর স্থলে হাত বলে ফেলেছেন বলে মনে হয়। আর সমস্যার সমাধান রয়েছে উটের বিশ্রাম গ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে। এক্ষেত্রে ওয়ায়েল বিন হিজরের হাদিসই সঠিক।

আগে হাঁটু স্থাপনের পক্ষে আবু হুরাইরা রা. থেকেই আরো বর্ণনা রয়েছে।

আবু বকর ইবনে আবি শাইবা > মুহাম্মদ ইবনে ফুযাইল থেকে > তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সায়ীদ থেকে > তিনি তাঁর দাদা থেকে > তিনি আবু হুরাইরা রা. থেকে > তিনি রসূলুল্লাহ সা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সাজদায় যাবে সে যেনো হাতের আগেই হাঁটু রাখে। সে যেনো উটের মতো না বসে।”

আছরম তাঁর সুনান গ্রন্থে সহীহ সূত্রে আবু হুরাইরা রা. থেকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদিসটি ওয়ায়েল বিন হিজর বর্ণিত হাদিসটির সাথে হুবহু মিলে যায়। আরেকটি অনুরূপ হাদিস দেখুন :

ইবনে খুযাইমা তাঁর সহীহ হাদিস সংকলনে মুসআব ইবনে সা'আদ থেকে হাদিস উল্লেখ করেছেন। মুসআব তাঁর পিতা সা'আদ রা. থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমরা হাঁটুর আগে হাত রাখতাম। এমনটি দেখে রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে হাতের আগে হাঁটু রাখার নির্দেশ দেন।”

এমতাবস্থায় আবু হুরাইরা রা.-এর প্রথম হাদিসটির বর্ণনার মধ্যে যদি গোলমাল নাও সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবু সেটি মনসুখ (রহিত) হয়ে যায়। আল মুগনী প্রণেতা ইমাম ইবনে কুদামা সহ অন্যান্য হাদিস বিশারদগণের এটাই অভিমত।

এছাড়াও হাদিসটি অগ্রহণযোগ্য হবার আরো দুটি কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো :

এক : হাদিসটির সনদে (বর্ণনাসূত্রে) একজন রাবি (বর্ণনাকারী) রয়েছেন ইয়াহ্ইয়া বিন সালামা বিন কুহাইল। ইনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, এই ব্যক্তি রাবি হিসেবে পরিত্যাজ্য (মাতরূক)। ইবনে হিব্বান বলেছেন, এ ব্যক্তি রাবি হিসেবে খুবই দুর্বল-অযোগ্য (মুনকার), তাকে

কিছুতেই নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। ইবনে মুয়ীন তো তাকে রাবি হবার বিষয়টি উড়িয়েই দিয়েছেন।

দুই : মুসআব ইবনে সা'আদ তার পিতা সা'আদ থেকে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, সেটিকে এ বিষয়ের সমন্বয়কারী হাদিস হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। হাদিসটি নির্ভরযোগ্যও বটে। এ হাদিসে সা'আদ রা. বলেন আমরা ওরকম করতাম, অতপর রসূরুল্লাহ সা. আমাদেরকে হাঁটুতে হাত রাখতে নির্দেশ দেন।" আল মুগনী প্রণেতা (ইমাম ইবনে কুদামা) হাদিসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন : আবু সায়ীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা হাঁটুর আগে হাত রাখতাম। এমনটি দেখে রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে হাতের আগে হাঁটু রাখার নির্দেশ দেন।"

এ বর্ণনাটিতেও কোনো বর্ণনাকারী সা'আদ এবং আবু সায়ীদ- এই দুই নামের মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে ফেলেছেন। এ হাদিসটির সনদে সাহাবির নামের ক্ষেত্রে গোলমাল থাকলেও হাদিসটির মূল বক্তব্য (মতন) ঠিকই আছে। তাই এ হাদিসটিকে হাত আগে না হাঁটু আগে- এই সমস্যার সমন্বয়কারী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ

- সাহাবিগণ প্রথমদিকে হাতই আগে রাখতেন।
- পরে রসূল সা. হাঁটু আগে রাখার নির্দেশ দেন।

তাছাড়া আবু হুরাইরার প্রথম হাদিসটির সনদকে ইমাম বুখারি, ইমাম তিরমিযি, দারু কুতনি এবং আবু হাতিমও বিশুদ্ধ বলেননি।

এবার দেখা যাক, এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের 'আছার' (আচরণ) কী ছিলো? প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনুল মুনযির তাঁদের হাদিস সংকলনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন : উমর রা. সব সময় হাতের আগে হাঁটু যমীনে রাখতেন।"

ইমাম তাহাবি ফাহাদ থেকে > তিনি উমর ইবনে হাফস্ থেকে > তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ছাত্র আলকামা ও আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনই বলেছেন : আমরা আমাদের ইলমের মধ্যে একথা খোদাই করে রেখেছি যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. রুকূর পরে উটের মতো তার হাঁটুর উপর ভর করে নুইয়ে পড়তেন এবং হাতের আগেই হাঁটু-স্থাপন করতেন।

ইমাম তাহাবি হাজ্জাজ বিন আরতাতের সূত্রে ইব্রাহীম নখয়ীর এ বক্তব্যও উল্লেখ করছেন : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখন সাজদায় যেতেন, তখন হাতের পূর্বেই তিনি হাঁটু যমীনে স্থাপন করতেন।

ইমাম তাহাবি আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন আবু মারযুক থেকে > তিনি ওহাব থেকে > তিনি শো'বা থেকে > তিনি মুগীরা থেকে। মুগীরা বলেন, আমি ইব্রাহীম নখয়ীকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে সাজদায় যাবারকালে হাঁটুর আগে যমীনে হাত রাখে। জবাবে তিনি বললেন : আহমক কিংবা পাগল ছাড়া কেউ কি এমনটি করে?

ইবনুল মুনযির বলেছেন, হাত আগে না হাঁটু আগে এ বিষয়টি নিয়ে জ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যাদের মত হলো, হাতের আগে হাঁটু রাখতে হবে, তাদের মধ্যে রয়েছেন- উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ইব্রাহীম নখয়ী, মুসলিম ইবনে ইয়াসার, সুফিয়ান সওরী, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহ্উইয়া, আবু হানীফা এবং তাঁর শিষ্যগণ ও কুফাবাসী।

পক্ষান্তরে যাদের মতে হাঁটুর আগে হাত রাখতে হবে, তাদের মধ্যে রয়েছেন, মালিক ও আওযায়ী। তাঁরা বলেছেন, আমরা দেখতে পেয়েছি লোকেরা হাঁটুর আগে হাত রাখেন।' আহলে হাদিসের মতও এটাই।

বায়হাকীতে আবু হুরাইরা রা.-এর হাদিসটি কিছুটা ভিন্ন ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : তোমাদের কেউ যখন সাজদা করে, তখন সে যেনো উটের মতো লুটিয়ে না পড়ে। বরং সে যেনো হাঁটুর উপর হাত রাখে।"

বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি যদি সুরক্ষিত ও অবিকৃত (মাহফুয) থেকে থাকে, তবে এটি সাজদায় যাবারকালে হাঁটুর আগে হাত রাখার পক্ষে একটি দলিল। তবে কয়েকটি কারণে ওয়ায়েল বিন হিজর বর্ণিত হাদিসটি (অর্থাৎ হাতের আগে হাঁটু রাখার হাদিসটি) গ্রহণ করা উত্তম। কারণগুলো হলো :

১. আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত (অন্যান্য) হাদিস থেকে হাতের আগে হাঁটু রাখার বিষয়টি প্রামাণিত হয়েছে। একথা বলেছেন খাত্তাবি প্রমুখ হাদিস বিশারদগণ।
২. আবু হুরাইরা রা. কর্তৃক বর্ণিত এ হাদিসের মূল বক্তব্য (মতন) অনেকটা গোলমেলে। বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনায় বক্তব্যের গোলমাল লক্ষ্য করা যায়। কখনো বলা হয়েছে : হাঁটুর আগে যেনো হাত রাখে।' কখনো বলা হয়েছে : হাতের আগে যেনো হাঁটু রাখে।' কখনো বা মূল বক্তব্যের কিছু অংশ বাদ দিয়ে বলা হয়েছে।
৩. ইমাম বুখারি ও দারু কতনি প্রমুখ বড় বড় হাদিস বিশারদগণ আবু হুরাইরা রা.-এর হাঁটুর আগে হাত রাখার, হাদিসটির সনদকে ত্রুটিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. একদল আহলে ইল্‌ম হাঁটুর আগে হাত রাখার বর্ণনাকে মনসুখ (রহিত) হয়ে গেছে বলে মনে করেন। ইবনুল মুনযির বলেছেন, অনেকেই এ বর্ণনাটি বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করেন।

৫. রসূলুল্লাহ সা. যেহেতু উটের মতো সাজদায় লুটিয়ে পড়তে নিষেধ করেছেন, তাই উটের পদ্ধতি পরিহার করার জন্যেও ওয়ায়েল বিন হিজরের বর্ণনাটি উত্তম।

৬. বড় বড় সাহাবিগণের আছার (আমল) সম্পর্কে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাও হাতের আগে হাঁটু রাখার পক্ষে। উমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহুম হাতের আগে হাঁটু রাখতেন। তাঁদের কেউই আবু হুরাইরা রা.-এর বর্ণনার অনুরূপ আমল করেছেন বলে প্রমাণ নেই। কেবলমাত্র উমর রা. কখনো এমনটি করেছেন বলে একটি ভিন্নমত পাওয়া যায়।

৭. ওয়ায়েল বিন হিজর রা. বর্ণিত হাদিসের সমর্থনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এবং আনাস রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসও রয়েছে। কিন্তু আবু হুরাইরা রা. এর সমর্থনে অন্য কোনো সাহাবি বর্ণিত হাদিস নেই।

৮. অধিকাংশ লোকই ওয়ায়েল বিন হিজর রা. বর্ণিত হাদিসের অনুসারী। আর আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত এ হাদিসটির অনুসরণ করেছেন কেবল ইমাম আওযায়ী এবং ইমাম মালিক। আবু দাউদ যে বলেছেন, আহলে হাদিস আবু হুরাইরার হাদিসটি অনুসরণ করে, এর অর্থ- আহলে হাদিসের কিছু লোক। কারণ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম ইস্‌হাক এ হাদিসের অনুসরণ করেননি।

৯. আবু হুরাইরা রা.-এর হাদিসটি কওলী (বাণীগত) হাদিস। অন্যদিকে ওয়ায়েল বিন হিজর রা.-এর হাদিসটি ফি'লী (রসূলুল্লাহ সা. এর কর্মের বর্ণনাগত) হাদিস। ফি'লী হাদিস কওলী হাদিসের তুলনায় অধিক মাহফুয (সংরক্ষিত ও অবিকৃত) থাকে। তাই এদিক থেকেও ওয়ায়েল বিন হিজর রা.-এর বর্ণনাটি উত্তম।

১০. ওয়ায়েল বিন হিজর রা. রসূলুল্লাহ সা.-এর সাজদায় যাবার যে বাস্তব (ফি'লী) বর্ণনা দিয়েছেন, তা অন্যান্য সহীহ্ বর্ণনা থেকেও প্রমাণিত হয়। রসূলুল্লাহ সা.-এর নামাযের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত (ফি'লী) সমস্ত বর্ণনাই প্রমাণিত ও সহীহ্। আর এটিও সেরকমই একটি বর্ণনা সুতরাং এ বর্ণনাটি এ সংক্রান্ত বিধান হিসেবে গ্রহণীয়। এর বিপরীত বর্ণনাটিকে এর চাইতে অগ্রাধিকার দেবার মতো মজবুত যুক্তি নেই।
- এ হলো আমাদের বুঝ - জ্ঞানের কথা। তবে প্রকৃত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে।

তিনি কিসের উপর সাজদা করতেন?

রসূলুল্লাহ সা. বেশিরভাগ সময়ই যমীনের উপর সাজদা করতেন। কখনো কখনো পানি, কাদামাটি খেজুর পাতার মাদুর, খেজুর আঁশের গদি এবং শুকনো চামড়ায় সাজদা করেছেন।

তিনি কিভাবে সাজদা করতেন ?

রসূলুল্লাহ সা. কপাল ও নাক যমীনে স্থাপন করে সাজদা করতেন। তিনি পাগড়িতে ঢাকা কপালে নয়, খালি কপালে সাজদা করতেন। পাগড়িতে ঢাকা কপালে সাজদা করতেন বলে কোনো সহীহ্ হাদিসে প্রমাণ নেই। এমনকি কোনো হাসান হাদিসেও এর প্রমাণ নেই।

তবে আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'আল মুসান্নাফ' গ্রন্থে আবু হুরাইরা রা.-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন "রসূলুল্লাহ সা. পাগড়ির প্যাঁচের উপর সাজদা করতেন।"

এ হাদিসটি যাদের মুখে বর্ণিত হয়ে এসেছে, তাদের একজন হলো আবদুল্লাহ ইবনে মুহাররায। এ ব্যক্তি হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য নয়, পরিত্যাজ্য (মাতরূক)।

আবু আহমদও জাবির রা.-এর সূত্রে অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটির বর্ণনাসূত্রে আমর ইবনে শোহর এবং জাবির আল জা'ফী নামক দু'ব্যক্তি রয়েছেন। এরা দু'জনই অবিশ্বস্ত ও পরিত্যাজ্য (মাতরূক)। একজন পরিত্যাজ্য ব্যক্তি থেকে আরেকজন পরিত্যাজ্য ব্যক্তি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

মারাসীলে আবু দাউদে বর্ণিত একটি হাদিসের বক্তব্য এরূপ একদিন রসূলুল্লাহ সা. তাঁর মসজিদে এক এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখেন। কপাল জুড়ে পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় লোকটি সাজদা করছিল। তখন রসূলুল্লাহ সা. তার কপাল থেকে পাগড়ি সরিয়ে দেন।'

তিনি যখন সাজদা করতেন, কপাল ও নাক যমীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন। দুই বাহু দূরে সরিয়ে রেখে বগল ফাঁকা করে রাখতেন। বগল এতোটা ফাঁকা করতেন যে, বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো। ইচ্ছে করলে দুই বাহুর এই ফাঁক দিয়ে ছোট ছাগল ছানা দৌড়ে যেতে পারতো। (বুখারি ও মুসলিম)

তিনি সাজদায় দুই হাতের তালু কখনো ঘাড় আবার কখনো কান বরাবর রাখতেন।

সহীহ্ মুসলিমে বারা রা. থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন তুমি যখন সাজদা করবে, হাতের তালু দুটি যমীনে স্থাপন করবে এবং দুই কনুই উপরে উঠিয়ে রাখবে।'

তিনি সাজদায় গিয়ে পিঠ সোজা রাখতেন। দুই পায়ের আংগুলের মাথাগুলো (বাঁকিয়ে) কিবলামুখী করে রাখতেন। হাতের তালু ও আংগুল বিছিয়ে রাখতেন, তবে একেবারে মিলিয়ে রাখতেন না, আবার বেশি ফাঁকাও রাখতেন না।

ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ্ হাদিস সংকলনে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. যখন রুকূ করতেন, তখন হাতের আংগুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা রাখতেন, আর যখন সাজদা করতেন, তখন মিলিয়ে রাখতেন।'

এভাবে তিনি হাঁটু, হাতের তালু, পায়ের পাতার সম্মুখভাগ, এবং কপাল ও নাক এতমীনানের (প্রশান্তির) সাথে যমীনে স্থাপন করে পিঠ সোজা করে সাজদায় অবস্থান করতেন।

তিনি সাজদায় কী বলতেন?

রসূলুল্লাহ্ সা. সাজদায় গিয়ে বিভিন্ন তাসবীহ্ উচ্চারণ করতেন এবং দু'আও করতেন। সহীহ সূত্রে জানা যায়, তিনি বিভিন্নরূপ তাসবীহ ও দু'আ করতেন। তিনি কখনো এই তাসবীহ পাঠ করতেন :

○ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلٰى অর্থ : আমার মহান প্রভু পবিত্র ত্রুটিমুক্ত।

- এই তাসবীহ তিনি নিজেও পড়তেন এবং সাহাবিগণকে পড়তে নির্দেশ দিতেন। কখনো নিম্নোক্ত তাসবীহ পাঠ করতেন :

○ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

অর্থ হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! তোমার প্রশংসাসহ তুমি পবিত্র ত্রুটিমুক্ত। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও।'

কখনো এই তসবীহ করতেন :

○ سُبُّوحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

অর্থ : অতিশয় পবিত্র ত্রুটিমুক্ত তুমি জিবরিল ও সমস্ত ফেরেশতার প্রভু।"

কখনো উচ্চারণ করতেন এই তাসবীহ্ :

○ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

কখনো পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ○

অর্থ হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি পেয়ে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে চাই। তোমর ক্ষমার উসিলায় তোমার শাস্তি থেকে বাঁচতে চাই। তোমার সত্তার উসিলায় আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। আমি তোমার ততোটা প্রশংসা করতে অক্ষম, তুমি নিজেই তোমার যতোটা প্রশংসা করেছো হে প্রভু!"

কখনো এই দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ اَنْتَ رَبِّىْ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ فَاَحْسَنَ صُوَرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ○

অর্থ : আমার আল্লাহ! তোমারই উদ্দেশ্যে আমি সাজদা করেছি। তোমারই প্রতি আমি ঈমান এনেছি। আর তোমারই প্রতি আমি আত্মসমর্পণ করেছি। তুমিই আমার মালিক ও মনিব। আমার মুখমণ্ডল তাঁরই প্রতি সাজদায় অবনত, যিনি এ মুখমন্ডলকে সৃষ্টি করেছেন, সর্বোত্তম আকৃতি দান করেছেন এবং তাতে চোখ কান দিয়ে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন। সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা তুমি হে আল্লাহ, বড় বরকতময় তোমার নাম।" (সহীহ মুসলিম)

কখনো সাজদায় গিয়ে এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَّتَهٗ وَسِرَّهٗ ○

অর্থ হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও আমার সমস্ত গুনাহ, সামনের ও পেছনের, প্রথমের ও শেষের, প্রকাশ্যের ও গোপনের।" (মুসলিম)

কখনো এই দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ○

অর্থ হে আল্লাহ্! ক্ষমা করে দাও আমার সব ভ্রান্তি, অজ্ঞতা, বাড়াবাড়ি- যা তুমি আমার চাইতে অধিক জানো। আমার আল্লাহ্! মাফ করে দাও আমার সব সীমালংঘন, অক্ষমতা, অনিচ্ছাকৃত ভুল, ইচ্ছাকৃত ভুল এবং এরকম আরো যা কিছু আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আয় আল্লাহ্! মাফ করে দাও আমার আগে পরের এবং গোপন ও প্রকাশ্যের সব গুনাহ্। তুমিইতো আমার ত্রাণকর্তা। তুমি ছাড়া তো আর কোনো ত্রাণকর্তা নেই।"

সাজদায় তিনি কখনো বা এই দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَّاَمَامِىْ نُوْرًا وَّخَلْفِىْ نُوْرًا وَّفَوْقِىْ نُوْرًا وَّتَحْتِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا ○

অর্থ হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে নূর (আলো) সৃষ্টি করে দাও! আমার যবানে নূর দাও! আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দাও! আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দাও! আমার ডানে নূর দাও! আমার বামে নূর দাও! আমার সামনে নূর দাও! আমার পেছনে নূর দাও! আমার উপরে নূর দাও! আমার নিচে নূর দাও! আমার মধ্যে নূর সৃষ্টি করে দাও আর আমার নূরকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করে দাও।"

রসূলুল্লাহ্ সা. সাজদার দু'আর ক্ষেত্রে ইজতিহাদ (উদ্ভাবন) করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন : সাজদায় বান্দা আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী হয়। তোমরা সাজদায় বেশি বেশি দু'আ করো। সাজদা দু'আ কবুলের উপযুক্ত সময়।' এখানে তিনটি কথা সুস্পষ্ট :

এক : সাজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়।

দুই : আল্লাহ্ সাজদায় দু'আ বেশি বেশি কবুল করেন।

তিন : তাই সাজদায় গিয়ে বেশি বেশি দু'আ করো।

সাজাদায় রসূলুল্লাহ্ সা. দুই ধরনের দু'আ বেশি বেশি করতেন। সেগুলো হলো :

এক : আল্লাহর প্রশংসামূলক দু'আ।

দুই : প্রার্থনামূলক দু'আ।

সাজদার বিরাট মর্যাদা

আল্লাহর বাণী (আল কুরআনের) তিলাওয়াত এবং দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর সামনে অনুগত ও বিনীত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে নামাযের 'কিয়াম' যেমন মর্যাদাবান, ঠিক তেমনি সাজদাও আল্লাহর কাছে বিরাট মযাদার অধিকারী। আল্লাহকে সাজদা করার মর্যাদা অনেক অনেক বেশি। কারণ-

১. রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে বান্দা তার মা'বুদের সবচেয়ে নিকটতর হয়, সে হলো সাজদাকারী।

২. মা'দান বিন আবু তালহা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর মুক্ত দাস সাওবান রা.-কে বলেছিলাম আমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দিন, যাতে আমি উপকৃত হতে থাকবো। জবাবে তিনি বললেন : বেশি বেশি সাজদা করো। কারণ, আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি যখনই কোনো বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সাজদা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দেন এবং তার গুনাহসমূহ থেকে একটি গুনাহ মুছে দেন।'

   মা'দান বলেন, অতপর আমি গিয়ে আবুদ দারদা রা.-এর সাথে সাক্ষাত করি এবং একই বিষয়ে জানতে চাই। তিনিও আমাকে সাওবানের মতো একই হাদিস শুনান।

৩. রবীয়া ইবনে কা'ব আল আসলামি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট জান্নাতে তাঁর সাথি হবার তামান্না প্রকাশ করলে তিনি তাকে বলেন : তবে তুমি বেশি বেশি সাজদা করে আমাকে সাহায্য করো।'

৪. সূরা আলাকের শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

   وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ "সাজদা করো আর (আমার) নৈকট্য অর্জন করো।"

৫. ছোট বড় সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহর প্রতি সাজদায় অবনত হয়।

৬. সাজদার মাধ্যমেই বান্দা তার প্রভুর প্রতি সর্বাধিক অবনত হবার সুযোগ পায় এবং সর্বাধিক ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করে। তাই এটাই প্রভুর কাছে দাসের সর্বোত্তম সম্মানজনক অবস্থা।

৭. সাজদাই তো হলো ইবাদত ও দাসত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ। কারণ, বিনয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও দাসোচিত আনুগত্য প্রকাশের জন্যে সাজদাই মনিবের কাছে সর্বাধিক প্রিয় হয়ে থাকে।

তিনি সাজদায় কতোক্ষণ থাকতেন?

রসূলুল্লাহ সা. নামাযের সকল অংগের (আরকানের) মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতেন। তিনি যখন দীর্ঘ কিয়াম (কিরাত পাঠ) করতেন, তখন সেই

অনুপাতে রুকূ এবং সাজদাও দীর্ঘ করতেন। যেমন সূর্যগ্রহণের নামায এবং রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযে তিনি কিয়ামও সুদীর্ঘ করতেন এবং রুকূ সাজাদাও।

আবার যখন কিয়াম (কিরাত পাঠ) তুলনামূলক সংক্ষেপ করতেন, তখন রুকূ-সাজদাও সেই অনুপাতে ছোট করতেন। সাধারণত তিনি ফরয নামাযেই এমনটি করতেন।

এই ভারসাম্য রক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায় বারা ইবনে আযেব রা-এর হাদিস থেকে। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা.-এর কিয়াম, রুকূ ও সাজদা ছিলো ভারসাম্যপূর্ণ। এগুলোর দৈর্ঘ প্রায় কাছাকাছি ছিলো।'

এখানকার আলোচনা থেকে আমরা তিনটি কথা পেলাম :

১. রসূলুল্লাহ সা. নামাযের অংগগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেন। কিরাত দীর্ঘ করলে রুকূ-সিজদাও দীর্ঘ করতেন। কিরাত ছোট করলে রুকূ- সাজদাও ছোট করতেন।

২. সূর্য গ্রহণ ও রাতের নামাযে কিয়াম ও রুকূ সাজদা খুব বেশি দীর্ঘ করতেন।

৩. তুলনামূলকভাবে ফরয নামাযে কিয়াম ও রুকূ সাজদা ছোট করতেন।

তাঁর সাজদা থেকে উঠে বসা

অতপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদা থেকে মাথা উঠাতেন। এসময় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন না। সাজদা থেকে উঠার সময় তিনি হাতের আগে মাথা উঠাতেন।

তারপর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর প্রশান্তির সাথে বসতেন। ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। ইমাম নাসায়ী এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে সহীহ সূত্রে হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন 'সুন্নত হলো, বাম পা পেতে দিয়ে তার উপর বসতে হবে এবং ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে আংগুলগুলো কিবলামুখী করে রাখতে হবে।'

এ সময়কার বসার ধরণ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. থেকে এছাড়া আর কোনো প্রকার পদ্ধতির কথা জান যায় না।

এ সময় তিনি দুই হাত দুই উরুর উপর রাখতেন। হাতের কনুই উরুর উপর এবং হাতের মাথা হাঁটুর উপর রাখতেন। বাম হাতের তালু বাম হাতের হাঁটুর উপর বিছিয়ে দিতেন। ডান হাতের ডান পাশের আংগুল দুটি মুষ্টিবদ্ধ রাখতেন আর বৃদ্ধাংগুলি মধ্যমার উপর রেখে একটা গোলাকার বৃত্তের মতো বানাতেন এবং শাহাদাত আংগুল (তর্জনি) উপরের দিকে উঠিয়ে দু'আ পড়তে থাকতেন এবং সেটিকে নাড়াতেন। এ হাদিস বর্ণনা করেছেন ওয়ায়েল ইবনে হিজর রা.।

আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. থেকে এ সম্পর্কে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, তাতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. দু'আ পড়ার সময় শাহাদাত আংগুল দিয়ে ইশারা করতে থাকতেন, নাড়াতেন না।"

এই 'নাড়াতেন না' একথাটি পরবর্তীতে কেউ (কোনো রাবি) বাড়িয়ে বলেছেন বলে মনে হয়। কারণ, একথাটুকুর বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমেও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর সূত্রে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি এই বর্ধিতাংশ অর্থাৎ 'নাড়াতেন না' একথাটি উল্লেখ করেননি। বরং তাতে তিনি এভাবে বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযে বসতেন, তখন বাম পায়ের পাতা দুই উরু ও জঙ্ঘার মাঝখানে রাখতেন এবং ডান পায়ের উপর বসতেন। বাম হাতের তালু বাম হাটুর উপর রাখতেন। ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর রাখতেন এবং তর্জনি দিয়ে ইশারা করতেন।"

আবু দাউদের হাদিসে যে 'নাড়াতেন না' কথাটি আছে, সেটা এখানে নেই। তাছাড়া আবু দাউদের হাদিসের এই 'নাড়াতেন না' কথাটি যে নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে কথা বলা হয়নি।

এক্ষেত্রে ওয়ায়েল ইবনে হিজর রা. এর হাদিস মজবুত ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। তাছাড়া আবু হাতিম তাঁর সহীহ সংকলনে বলেছেন, এটি সহীহ হাদিস।

দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে যে দু'আ পড়তেন

রসূলুল্লাহ সা. পয়লা সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তির সাথে বসতেন। দুই সাজদার মধ্যবর্তী এ বৈঠকে তিনি নিম্নরূপ দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ○

অর্থ : আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে বলবান করো, আমার মান-মর্যদা বড়িয়ে দাও, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো, আমাকে সুস্থ রাখো এবং জীবিকা দান করো।"[৭]

হুযাইফা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে নিম্নরূপ দু'আ পড়তেন : رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ○

অর্থ : প্রভু! আমাকে মাফ করে দাও। প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

৭. তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। হাকিম থেকে ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখের সূত্রেও এ দু'আর কথা জানা যায়।

দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠক লম্বা করা

রসূলুল্লাহ সা. দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠক সাজদার সমান লম্বা করতেন।

তামাম হাদিসেই এর প্রমাণ রয়েছে। সহীহ সংকলন সমূহে আনাস রা. থেকে হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. দুই সাজদার মাঝখানে এতোটা দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, আমরা বলতাম, হয়তো তিনি ভুলে গেছেন কিংবা সংশয়ে পড়েছেন।'

এটাই সুন্নত। সাহাবিদের যুগের পরে অধিকাংশ লোকই এ সুন্নত ত্যাগ করেছে।

দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে দাঁড়ানো

প্রথম সাজদা থেকে উঠে প্রশান্তির সাথে বসা ও দু'আ করার পর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সাজদায় যেতেন। দ্বিতীয় সাজদায়ও পয়লা সাজদার অনুরূপ করতেন।

রসূলুল্লাহ সা. দ্বিতীয় সাজদা শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে দাঁড়াতেন।

দাঁড়বার সময় তিনি দুই হাতে দুই পা ও হাঁটু ধরে উরুর উপর ভর করে দাঁড়াতেন। তাঁর এ আমল বর্ণিত হয়েছে ওয়ায়েল ইবনে হিজর এবং আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে।

তিনি হাত যমীনে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন না।

বিশ্রামের বৈঠক ও এ ব্যাপারে মতভেদ

মালিক ইবনে হুয়াইরিস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে দাঁড়াবার আগে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে না বসে দাঁড়াতেন না। এই জলসা (বসা)-কে বিশ্রামের জলসা বলা হয়।

তবে এই বিশ্রামের বসা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে- এই বসাটা কি সুন্নত? প্রত্যেকের জন্যেই কি তা অনুকরণীয়? নাকি তিনি কোনো অসুবধার কারণে এমনটি করেছিলেন?

এ বিষয়ে দু'রকম বর্ণনাই পাওয়া যায়।

খুল্লাল বলেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল মালিক ইবনে হুয়াইরিসের বর্ণনা মেনে নিয়ে বিশ্রামের বৈঠকের পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইউসুফ ইবনে মূসা আমাকে খবর দিয়েছেন, আবু উমামাকে সাজদা থেকে দাঁড়াবার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন সাজদা থেকে দাঁড়াতে হবে দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে।' -একথার দলিল রিফা'আ বর্ণিত হাদিস। কিন্তু ইবনে আজলানের হাদিস থেকে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়না যে, রসূলু সা. দু'পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতেন।

অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক সাহাবি (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) রসূলুল্লাহ সা.-এর নামাযের বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা কেউই এই বিশ্রামের বৈঠকের কথা উল্লেখ করেননি।

এই বৈঠকটি সম্পর্কে শুধুমাত্র আবু হুমায়েদ এবং মালিক ইবনে হুয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ আছে।

রসূলুল্লাহ সা. যদি নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে এই আমলটি করতেন, তবে তাঁর নামাযের বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি বর্ণনাকারী বিপুল সংখ্যক সাহাবি অবশ্যি তা উল্লেখ করতেন। একবার তিনি একাজটি করেছেন বলেই সেটা নামাযের সুন্নত বলে প্রমাণিত হয়না। তবে তিনি এমনটি সুন্নত হিসেবে করেছেন বলে যদি প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রেই তা অনুকরণীয়। আর যদি ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধার কারণে একবার তিনি তা করে থাকেন তবে তা নামাযের একটি সুন্নত বলে পরিগণিত হবেনা। - এটাই এই মতভেদের সমাধান।

দ্বিতীয় রাকাত কিভাবে পড়তেন?

রসূলুল্লাহ সা. পয়লা রাকাতের সাজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়েই সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করতেন। দাঁড়ানোর পর পয়লা রাকাতের মতো একটু থামতেন না, বা কিছুক্ষণ নিরব থাকতেন না।

তবে দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পূর্বে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পড়তেন কি না- সে বিষয়ে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

অবশ্য, তাঁরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এটা নামাযের শুরু নয়, মধ্যবর্তী একটি জায়গা।

এখানে 'তায়াউয' পড়া না পড়ার ব্যাপারে দুটি মত সৃষ্টি হয়েছে ইমাম আহমদের দুটি কথা থেকে। তাঁর একদল ছাত্র তাঁর একটি মতের ভিত্তিতে বলেছেন, নামাযের গোটা কিরাতকে যদি একটি কিরাতের সমষ্টি ধরা হয়, তবে একবার 'তায়াউয' পড়াই যথেষ্ট। আর যদি প্রত্যেক রাকাতের কিরাতকে স্বতন্ত্র কিরাত ধরা হয়, তবে প্রত্যেক ফাতিহাতেই তায়াউয পড়তে হবে।

আসলে এক তাকবীরে তাহরীমার অধীনস্থ নামায সমষ্টির সূচনা তো একটিই। তাই একথা পরিষ্কার, সূচনাতে একবার 'তায়াউয' পড়াই যথেষ্ট। সহীহ হাদিস থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন রসূল সা. যখন দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়াতেন, তখন না থেমেই কিরাত আরম্ভ করতেন।'

আসলে রাকাত সমূহের সূচনা প্রথম রাকাতেই হয়।[৮] দুই রাকাতের মাঝখানে যে বিঘ্ন ঘটে, তা বিরতির কারণে ঘটেনা, ঘটে যিকর-এর কারণে। আর যিকর কিরাতের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায়না। কারণ তাতে তো হামদ, তাসবীহ, তাহলীল, সালাত আলান্নাবী এবং অনুরূপ অন্যান্য কথাই উচ্চারণ করা হয়।

রসূলুল্লাহ সা. চারটি বিষয় ছাড়া দ্বিতীয় রাকাত পয়লা রাকাতের মতোই পড়তেন। সে চারটি বিষয় হলো :

১. তাকবীরে তাহরীমা।
২. তাকবীরে তাহরীমার পরে কিছুক্ষণ নিরব থাকা।
৩. ঐ নিরব থাকার সময় প্রারম্ভিক হামদ ও দু'আ পাঠ।
৪. এবং দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় কিছুটা দীর্ঘ করা।

রসূলুল্লাহ সা. দ্বিতীয় রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করতেন না, কিছুক্ষণ নিরব থাকতেন না, নিরব থাকার সময় প্রারম্ভিক যিকর ও দু'আ পাঠ করতেন না। তাছাড়া পয়লা রাকাতের তুলনায় কিছুটা সংক্ষেপ করতেন। তাঁর প্রত্যেক নামাযেই দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় পয়লা রাকাত দীর্ঘ হতো।

প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠক ও প্রাসঙ্গিক কর্মপদ্ধতি

দ্বিতীয় রাকাতের উভয় সাজদা শেষ করে রসূলুল্লাহ সা. যখন তাশাহ্হুদের জন্যে বসতেন, তখন বাম উরুর উপর বাম হাত এবং ডান উরুর উপর ডান হাত রাখতেন। ডান হাতের শাহাদাত আংগুল দ্বারা কিবলার দিকে ইংগিত করতে থাকতেন। এসময় আংগুলটি পুরোপুরি দাঁড় করাতেন না, আবার নিচু করেও রাখতেন না, বরং উপরের দিকে ঈষৎ উঠিয়ে রাখতেন এবং নাড়াতে থাকতেন। বুড়ো আংগুল মধ্যমার উপর রেখে একটা বৃত্তের মতো বানাতেন আর শাহাদাত আংগুল (তর্জনি) উঁচিয়ে তাশাহ্হুদ পড়তে থাকতেন এবং সেটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতেন। এসময় বাম উরুর উপর বাম হাত বিছিয়ে রাখতেন।

দুই সাজাদার মাঝখানে তিনি যেভাবে বসতেন, তাশাহ্হুদের বৈঠকেও (পয়লা বৈঠকে) সেভাবে বসতেন। বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখতেন এবং আংগুলগুলো কিবলামুখী করে দিতেন। এ বৈঠকে এর ব্যতিক্রম বসতে কেউ তাঁকে দেখেনি।

৮. কুরআন পাঠ শুরু করার সময় 'তায়াউয' পড়া জরুরি বলে এই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এক তাকবীরে তাহরীমার অধীনস্থ রাকাতগুলোর সূচনা একটি, নাকি প্রত্যেক রাকাত-এর সূচনা আলাদা আলাদা?

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযে বসতেন, তখন তাঁর বাম পায়ের পাতা তাঁর উরু ও জঙ্ঘার মাঝে রাখতেন এবং ডান পায়ের পাতা বিছিয়ে দিতেন।"

- আসলে এ বর্ণনাটি শেষ বৈঠক সংক্রান্ত। এ সম্পর্কে সম্মুখে আলোচনা আসছে। তাঁর দুইটি বৈঠকের একটির বৈশিষ্ট্য হলো এ রকম।

সহীহ বুখারি ও সহীহ সুমলিমে আবু হুমায়েদ রা. থেকে রসূলুল্লাহ সা.-এর নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. যখন (চার রাকাতের) নামাযে দ্বিতীয় রাকাতের পর প্রথম তাশাহ্হুদের জন্যে বসতেন, তখন তিনি বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন এবং অপর পায়ের (ডান পায়ের) পাতা খাড়া করে রাখতেন। আর যখন শেষ বৈঠকে বসতেন, তখন বাম পায়ের পাতা একটু সামনে এগিয়ে নিয়ে ডান পায়ের জঙ্ঘার (নলার) নিচে রাখতেন। ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখতেন এবং পাছা যমীনে স্থাপন করে পাছার উপর বসতেন।

এখানে আবু হুমায়েদ এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এই দুইজন থেকে ডান পা সম্পর্কে দুটি বিবরণ পাওয়া যায়। আবু হুমায়েদ বলেছেন, ডান পা খাড়া করে রাখতেন আর ইবনে যুবায়ের বলেছেন, বিছিয়ে দিতেন।

কোনো বর্ণনাকারীই একথা বলেননি যে, তিনি প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠকে এরকম করতেন। এরকম কেউ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

তবে রসূলুল্লাহ সা.-এর বসা সম্পর্কে বর্ণনার তারতম্যের কারণে লোকদের মধ্যে কয়েক প্রকার মতামত সৃষ্টি হয়েছে। যেমন : কেউ কেউ উভয় তাশাহ্হুদেই পাছার উপর বসার কথা বলেছেন। এ হচ্ছে মালিক রহ.-এর মযহাব।

- কেউ কেউ উভয় বৈঠকেই বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। এ হচ্ছে আবু হানীফা রহ.-এর মত।

- কেই কেই বলেছেন, সালাম ওয়ালা তাশাহ্হুদের বৈঠকে পাছার উপর বসবে, অন্য তাশাহ্হুদে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। এ হচ্ছে শাফেয়ি রহ.-এর মত।

- কেউ কেউ বলেছেন, দুই তাশাহ্হুদ ওয়ালা নামাযের শেষ তাশাহ্হুদের বৈঠকে পাছার উপর বসতে হবে- উভয় বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্যে। এ হচ্ছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মত।

আর আবদুল্লাহ ইনে যুবায়ের রা. যে বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. ডান পা বিছিয়ে দিতেন, তার অর্থ হলো, তিনি শেষ বৈঠকে তাঁর পাছা যমীনে

স্থাপন করে পাছার উপর ভর দিয়ে বসতেন। ফলে ডান পা বিছিয়ে দিতেন। বাম পা দুই উরু ও জঙ্ঘার মাঝখানে রাখতেন আর পাছা রাখতেন যমীনে।

এ ক্ষেত্রে মতভেদ করা হয়েছে এই নিয়ে যে, এ সময় ডান পায়ের পাতা কোথায় কিভাবে রাখতেন? তা কি বিছিয়ে দিতেন, নাকি খাড়া করে রাখতেন?

প্রকৃত ব্যাপারটি আল্লাহই ভালো জানেন। তবে, আমাদের মতে এখানে পার্থক্যের কিছু দেখা যায়না। কারণ তিনি কখনো ডান পায়ে বসতেন না। বরং তা ডানদিকে বিছিয়ে দিতেন। ফলে তা না খাড়া থাকতো, আর না পুরোপুরি বিছানো থাকতো। এমতাবস্থায় বিছিয়ে দেয়ার অর্থ ডান পায়ের পাতার উল্টা পিঠ বিছিয়ে দিতেন, ফলে তা পুরোপুরি দাঁড়ানো থাকতোনা। দাঁড় করানোর অর্থ পায়ের পাতার নিচের দিক দাঁড় করানো, কারণ এমতাবস্থায় তা বিছানো থাকতো না এবং তিনি তাতে বসতেননা।

তাই আবু হুমায়েদ ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয়ের বক্তব্যই সঠিক।

অথবা বলা যেতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সা. কখনো এরকম করতেন, আবার কখনো ওরকম করতেন। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

প্রথম তাশাহ্হুদে কী পড়তেন?

চার বা তিন রাকাতের নামাযে রসূলুল্লাহ সা. দুই রাকাত পড়ে বসতেন। এটাকেই আমরা প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠক বলেছি। এ বৈঠকে তিনি সবসময় তাশাহ্হুদ পড়তেন।

নাসায়ীতে আবুয্ যুবায়েরের সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি জাবির রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। জাবির রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. কুরআনের মতোই আমাদের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন।[৯]

রসূলুল্লাহ সা. নিম্নরূপ তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ○ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○

অর্থ : সকল মর্যাদাব্যঞ্জক ও সম্মানকজন সম্বোধন আল্লাহর জন্যে। সমস্ত শান্তি, কল্যাণ ও প্রাচুর্যের মালিক আল্লাহ। সর্বপ্রকার পবিত্রতার মালিকও

৯. তিনি এসময় তাশাহ্হুদ পড়তেন ভুলে গেলে শেষ বৈঠকে সাহু সাজদা করতেন। (বুখারি)। তাশাহ্হুদ নি:শব্দে পড়া সুন্নত। (আবু দাউদ)।

তিনি। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র সকল নেক বান্দার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ তাঁর দাস ও রসূল।"

নাসায়ীতে জাবির রা.-এর হাদিসে নিম্নরূপ তাশাহ্‌হুদের কথা বর্ণিত হয়েছে :

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ○ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ○ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ○

অর্থ : বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি, সকল সম্মানজনক সম্বোধন আল্লাহ্‌র জন্যে। আল্লাহ্‌ই সমস্ত শান্তি, কল্যাণ, প্রাচুর্য ও সর্বপ্রকার পবিত্রতার মালিক। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র সব নেক বান্দাহর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল। আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রর্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"

এই হাদিসটি ছাড়া আর কোনো হাদিসে তাশাহ্‌হুদের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্'-র উল্লেখ হয়নি। অবশ্য এ হাদিসটির সনদে (বর্ণনা সূত্রে) কিছুটা ক্রটি আছে।

রসূলুল্লাহ সা. এই তাশাহ্‌হুদটি (প্রথম তাশাহ্‌হুদ) খুবই সংক্ষেপে করতেন।

তিনি এই তাশাহ্‌হুদে কবর আযাব, জাহান্নামের আযাব, জীবদ্দশা ও মৃত্যুকালীন ফিতনা এবং মসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকেও আশ্রয় চাইতেন না। অবশ্য রসূলুল্লাহ সা. সাধারণভাবে সব সময় এই চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলার কারণে কেউ কেউ প্রথম তাশাহ্‌হুদেও এগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পসন্দ করেন। তবে এই আশ্রয় প্রর্থনা শেষ তাশাহ্‌হুদের সাথেই অধিকতর সহীহ্।

প্রথম তাশাহ্‌হুদের বৈঠক থেকে দাঁড়ানো

তাশাহ্‌হুদ শেষ করে রসূলুল্লাহ্ সা. 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে দাঁড়াতেন। তিনি পায়ের পাতার বুক এবং হাঁটু যমীনে ঠেকিয়ে দুই উরুতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. এসময় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন।

বুখারিতেও কোনো কোনো সূত্রে একথাটি বর্ণিত হয়েছে। তবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সব সূত্রের বর্ণনায় সর্বসম্মতভাবে এখানে রফে ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ নেই।

অবশ্য আবু হুমায়েদ আস্ সায়েদীর বর্ণনা থেকে অকাট্যভাবে এখানে রফে ইয়াদাইনের কথা প্রমাণিত হয়। তিনি রসূলুল্লাহ সা.-এর নামাযের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

"রসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াতেন, আল্লাহু আকবার (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা) বলতেন এবং রফে ইয়াদাইন করতেন। এ সময় দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। তিনি নামাযে এমনভাবে দাড়াতেন যে, শরীরের প্রতিটি অংগ স্ব স্ব স্থানে প্রশান্তির সাথে প্রতিষ্ঠিত হতো। তারপর কিরাত পাঠ করতেন। কিরাত শেষে দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে 'রফে ইয়াদাইন' করতেন। তারপর রুকূ করতেন। হাতের আংগুলগুলো হাঁটুতে রাখতেন স্বাভাবিকভাবে। মাথা পিঠ বরাবর রাখতেন। মাথা বরাবরের চাইতে ঝুঁকিয়েও রাখতেন না, উঠিয়েও রাখতেন না। অতপর 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে মাথা উঠাতেন। এসময় রফে ইয়াদাইন করতেন। হাতগুলো কাঁধ বরাবর উঠাতেন। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তির সাথে দাঁড়াতেন, এমনকি শরীরের প্রতিটি অংগ স্ব স্ব স্থানে বহাল হতো। এরপর সাজদার জন্যে যমীনের দিকে ঝুঁকে পড়তেন। সাজদার সময় দুই বাহু পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন। পায়ের আংগুলগুলো কিবলার দিকে মুড়িয়ে (কিবলামুখী) রাখতেন। তারপর দুই পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন।[১০] অতপর দ্বিতীয় সাজদায় যেতেন। অতপর 'আল্লাহু আকবার' বলে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। প্রশান্তির সাথে বসতেন, এমনকি শরীরের প্রতিটি অংগ স্ব স্ব স্থানে বহাল হতো। তারপর (দ্বিতীয় রাকাতের জন্যে) দাঁড়াতেন। দ্বিতীয় রাকাতের আরকানগুলোও প্রথম রাকাতের মতোই করতেন। অতপর দ্বিতীয় রাকাতের তাশাহ্হুদ শেষ করে যখন দাঁড়াতেন, দাঁড়াবার সময় 'রফে ইয়াদাইন' করতেন। রফে ইয়াদাইনে হাতগুলো কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন, যেমনটি করতেন নামাযের শুরুতে। অতপর বাকি নামায এই একই পদ্ধতিতে পড়তেন। অতপর শেষ সাজদায়, যে সাজদার পর সালাম ফিরাতে হয়, দুই পা (ডান দিকে) বের করে দিতেন এবং বাম পাছা যমীনে ঠেকিয়ে তার উপর ভর করে বসতেন।"

---

১০. হযরত আবু হুমায়েদ রা.-এর অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, এ সময় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন।

- এ বর্ণনাটি গ্রহণ করা হয়েছে সহীহ্ আবু হাতিম থেকে।

- সহীহ্ মুসলিমেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তিরমিযিতেও সহীহ্ সূত্রে আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. এসব স্থানে রফে ইয়াদাইন করতেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে কী পড়তেন?

প্রথম তাশাহ্হুদ থেকে দাঁড়িয়ে তিনি শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তেন। তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।

অবশ্য ইমাম শাফেয়ি শেষ দু'রাকাতেও সূরা ফাতিহার সাথে কিরাত মিলানোকে মুস্তাহাব মনে করেন। এজন্য তিনি আবু সায়ীদ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সহীহ মুসলিমে। তাতে আবু সায়ীদ রা. বলেন রসূলুল্লাহ সা.-এর যুহরের কিয়াম থেকে আমরা অনুমান করতাম তিনি প্রথম দুই রাকাতে সূরা 'আস সাজদার' সমপরিমাণ কিরাত পড়তেন আর শেষ দুই রাকাতে প্রথম দুই রাকাতের অর্ধেক পরিমাণ পড়তেন।[১১] তাছাড়া আমরা তাঁর আসরের নামাযের কিয়াম থেকে অনুমান করতাম, তিনি আসরের প্রথম দুই রাকাতে তার অর্ধেক পরিমাণ পড়তেন। (সহীহ মুসলিম)

অন্যদিকে একটি সুস্পষ্ট ও সর্বজন স্বীকৃত হাদিস হচ্ছে আবু কাতাদা রা. বর্ণিত হাদিস। এ হাদিসে পরিষ্কারভাবে তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. শেষ দু'রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তেন, সাথে অন্য কিরাত মিলাতেন না। আবু কাতাদা রা. বলেন :

"রসূলুল্লাহ সা. আমাদের নিয়ে নামায পড়তেন। তিনি যুহর এবং আসরের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে আরো দু'টি সূরা মিলিয়ে পড়তেন। কখনো কখনো আমাদের শুনিয়ে পড়তেন।"

- বুখারি ও মুসলিম উভয়ের বর্ণনায়ই একথাগুলো আছে। মুসলিমে এই আবু কাতাদার হাদিসে অতিরিক্ত একথাগুলোও আছে "এবং শেষ দুই রাকাতে তিনি শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তেন।"

বুখারি ও মুসলিমে আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত এই হাদিস দু'টি থেকে এ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে স্পষ্ট ও অকাট্য নির্দেশনা পাওয়া যায়।

---

১১. উল্লেখ্য সূরা আস সাজদার আয়াত সংখ্যা ৩০ (ত্রিশটি)। সুতরাং এই হাদিসের বক্তব্য হলো, প্রথম দুই রাকাতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ এবং শেষ দুই রাকাতে পনের আয়াত পরিমাণ পড়তেন।

অপরদিকে এক্ষেত্রে আবু সায়ীদ রা.-এর বক্তব্য অনুমানভিত্তিক।

এক্ষেত্রে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রসূল সা.-এর সাধারণ রীতি ছিলো তিনি শেষ দুই রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তেন, সেই সাথে আর কোনো সূরা কিরাত মিলাতেন না। -এর দলিল আবু কাতাদার হাদিস।

তবে কখনো কখনো শেষ দুই রাকাতেও সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা-কিরাত মিলাতেন। -এর দলিল আবু সায়ীদ রা-এর হাদিস। তবে এমনটি করা তাঁর সাধারণ নিয়ম ছিলনা। এটা ছিলো তাঁর সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম কাজ।

নামাযে তাঁর রীতি ও রীতির ব্যতিক্রম

বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি কখনো কখনো সাধারণ রীতির ব্যতিক্রমও করতেন। যেমন ফজর নামাযে দীর্ঘ কিরাত পড়া ছিলো তাঁর সাধারণ রীতি। কিন্তু কখনো কখনো হালকা কিরাতও পড়তেন। মাগরিব নামাযে তাঁর রীতি ছিলো ছোট কিরাত পড়া, কিন্তু কখনো কখনো দীর্ঘ কিরাতও পড়তেন। তাঁর সাধারণ রীতি ছিলো ফজর নামাযে দু'আ কুনূত না পড়া, কিন্তু কখনো কখনো পড়তেন। তাঁর সাধারণ রীতি ছিলো যুহর ও আসরের নামাযে নি:শব্দে কিরাত পড়া, কিন্তু কখনো কখনো সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কিরাত শুনতেন। সাধারণত তিনি 'বিস্‌মিল্লাহ' নি:শব্দে পড়তেন কিন্তু কখনো কখনো শব্দ করে পড়তেন।

মোট কথা, রসূল সা. তাঁর নামাযের কোনো কোনো পদ্ধতিতে মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রম করতেন। সেটা হতো তাঁর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এবং সাময়িক। উদ্দেশ্য ছিলো মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রম করার অবকাশ রাখা। কিন্তু এই অবকাশটা তাঁর রীতি ছিলনা।

যেমন, একবার তিনি এক ব্যক্তিকে ঘোড়ায় করে একটি বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে পাঠান। তাকে পাঠাবার পর তিনি নামাযে দাঁড়ান। নামাযের মধ্যে তিনি বারবার সে ব্যক্তির পথ পানে তাকাচ্ছিলেন।

অথচ সহীহ বুখারিতে আয়েশা রা. থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রসূল সা.-কে নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন : এটা শয়তানের প্রতারণা। সে এভাবে প্রতারণা করে বান্দাকে নামায থেকে অমনোযোগী করতে চায়।.........

কুরআন হাদিস সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন, এমন ব্যক্তির পক্ষে এ দুটি হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়। তিনি

নামাযের মধ্যে আল্লাহর ব্যাপারে কখনো অমনোযোগী হতেন না। ঘোড় সওয়ার সংবাদ বাহকের হাদিসটি যুদ্ধাবস্থার সাথে জড়িত। রণাঙ্গণে প্রায়ই তিনি 'সালাতুল খাউফ' পড়তেন। মুসলমানদের কল্যাণের জন্যেই তিনি ঐ নামাযে প্রতীক্ষিত সংবাদ বাহকের আগমন পথে তাকাচ্ছিলেন। এটা তাঁর সাধারণ রীতি ছিলনা।

প্রথম দুই রাকাত এবং পয়লা রাকাত লম্বা করতেন

রসূলুল্লাহ সা.-এর রীতি ছিলো, তিনি চার রাকাতের নামাযে শেষ দুই রাকাতের চাইতে প্রথম দুই রাকাত লম্বা করতেন। আবার প্রথম দুই রাকাতে দ্বিতীয় রাকাতের চাইতে পয়লা রাকাত লম্বা করতেন। -এ কারণেই সাআদ রা. উমর রা.-কে বলেছিলেন : আমি পয়লা দুই রাকাত লম্বা করবো এবং শেষের দুই রাকাত হ্রস্ব করবো। রসূল সা-এর সাথে আমি এভাবেই নামায পড়েছি।

রসূল সা.-এর রীতি ছিলো, তিনি অন্যসব নামাযের চাইতে ফজর নামায দীর্ঘ করতেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন প্রথমত আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নামাযই দুই দুই রাকাত করে ফরয করেছিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ সা. যখন হিজরত করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুকীম অবস্থায় ফজর ছাড়া অন্যান্য নামায (দুই রাকাত) বৃদ্ধি করে দিলেন। দীর্ঘ কিরাতের কারণে ফজর নামাযকে পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ দুই রাকাত) রাখলেন। আর মাগরিবকে দিনের 'বিতর' হিসেবে তিন রাকাত রাখলেন।"

- এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু হাতিম এবং ইবনে হিব্বান তাঁদের সহীহ সংকলনে। হাদীসটির মূল বক্তব্য সহীহ বুখারিতেও বর্ণিত হয়েছে।

সকল নামাযেই রসূলুল্লাহ সা.-এর এই রীতি ছিলো যে, তিনি শেষ অংশের তুলনায় প্রথমাংশ দীর্ঘ করতেন।

- সূর্য গ্রহণের নামাযও তিনি এভাবেই পড়তেন।

- রাতের নামাযও তিনি এভাবেই পড়তেন। তবে রাতের নামায যেহেতু তিনি দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তেন, সে জন্যে প্রথম দুই রাকাত অধিক লম্বা করতেন। পরের দুই রাকাত তার তুলনায় কম লম্বা করতেন। এভাবেই সামনের দিকে পড়তেন এবং শেষ করতেন। আর তিনি যে রাতের প্রথম দুই রাকাত খাটো করে পড়তে বলেছেন, সেটা তাঁর এ রীতির খেলাফ নয়। কারণ সে দু'রাকাত রাতের নামায সমূহের উদ্বোধনী নামায। উদ্বোধনী দুই রাকাত তিনি ছোটই করতেন, যেমন ফজরের সুন্নত দুই রাকাত ফরয দুই রাকাতের তুলনায় ছোট করতেন। কারণ এ দুই রাকাত ছিলো ফজরের উদ্বোধনী নামায।

তাই এই ছোট দুই রাকাতের ফলে রাতের নামায দীর্ঘ করার রীতির ব্যত্যয় ঘটেনা। যেমন, তিনি সা. বলেছেন : 'বিতরকে রাতের শেষ নামায বানাও।' অথচ তিনি প্রায়ই বিতরের পরপর বসে বা দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নফল নামায পড়তেন। এতে বিতর রাতের শেষ নামায হবার ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনা।

আবার দেখুন, তিনি সা. মাগরিবকে দিনের বিতর বলেছেন, কিন্তু মাগরিবের পর পরই শাফায়াত লাভের উদ্দেশ্যে দুই রাকাত সুন্নত নামায পড়তে বলেছেন। এর ফলে মাগরিব দিনের বিতর হবার ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনা।

আসলে তিনি সা. মাগরিবের ফরযের পর দুই রাকাত পড়তেন ফরযকে হিফাযত করার জন্যে। রাতের শেষ নামায বিতরের পরে দুই রাকাত পড়তেন ঐ বিতরকে হিফাযত করার জন্যে। এটা সাধারণ কথা যে, সাহায্যকারী বা হিফাযতকারী নামায মূল নামাযের বৈশিষ্ট্যের ব্যত্যয় ঘটায়না। একথা সকল ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

শেষ তাশাহ্হুদের বৈঠক

- রসূলুল্লাহ্ সা. যখন শেষ তাশাহ্হুদের জন্যে বসতেন, তখন (বাম) পাছা যমীনে রেখে পাছার উপর ভর দিয়ে বসতেন এবং দুই পা একদিকে (ডান দিকে) বের করে দিতেন।

- পাছার উপর ভর করে বসার ক্ষেত্রে যে তিন প্রকার পদ্ধতি তাঁর সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, এটা তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে সুনানে আবু দাউদে এবং আবু হাতিম-এর সহীহ্ সংকলনে আবু হুমায়েদ আস সায়েদী রা. থেকে।

- দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে সহীহ্ বুখারিতে সেই আবু হুমায়েদ আস সায়েদী রা. থেকেই। তিনি বলেন : রসূল সা. যখন শেষ রাকাতে বসতেন, তখন বাম পা একটু সামনে এগিয়ে নিতেন, ডান পা খাড়া করে রাখতেন এবং পাছার উপর বসতেন।

- এ পদ্ধতিটি প্রায় পয়লা পদ্ধতির মতোই। উভয় ক্ষেত্রেই পাছার উপর বসার কথা রয়েছে। তবে এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য শুধু পা রাখার ক্ষেত্রে।

- তৃতীয় পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের হাদিসে। ইবনে যুবায়ের রা. বলেন : এসময় রসূল সা. তাঁর বাম পা উরু ও ডান জঙ্ঘার মাঝখানে রাখতেন এবং ডান পায়ের পাতা বিছিয়ে দিতেন।'

- আবুল কাসেম হারবি তাঁর গ্রন্থে এ পদ্ধতিকে সমর্থন করেছেন। পা রাখার ক্ষেত্রে প্রথম দুই পদ্ধতি থেকে এ পদ্ধতির পার্থক্য রয়েছে। হয়তো

বা রসূল সা. কখনো এ রকম করতেন। আবার কখনো ওরকম করতেন। স্পষ্টত এটাই মনে হয়। অথবা বর্ণনাগত কারণেও এ তারতম্য সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

- রসূল সা. প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠক এবং শেষ তাশাহ্হুদের বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য করতেন। শেষ বৈঠকে তিনি পাছার উপর বসতেন। প্রথম বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপর বসতেন।

- ইমাম আহমদ বলেছেন, প্রথম বৈঠক এবং শেষ বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যেই তিনি এমনটি করতেন। প্রথম বৈঠকের পর আবার উঠে দাঁড়াতে হবে বলে তিনি পায়ের পাতার উপর বসে দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত থাকতেন। আর শেষ বৈঠকের পর দাঁড়াবার প্রস্তুতি থাকেনা বলে, সে বৈঠকে এতমীনান ও প্রশান্তির সাথে বসতেন। শেষ তাশাহ্হুদের মাধ্যমে নামায শেষ হচ্ছে বলেই প্রশান্তির সাথে পাছার উপর গোটা দেহ ভর করে বসতেন।

- আবু হুমায়েদ রা. রসূল সা.-এর প্রথম বৈঠক এবং শেষ বৈঠকের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিনি রসূল সা.-এর শেষ বৈঠক বুঝাবার জন্যে বিভিন্ন বর্ণনায় এভাবে শব্দ প্রয়োগ করেছেন :
- "যখন তিনি শেষ রাকাতে বসতেন।"
- "যখন তিনি চতুর্থ রাকাতে বসতেন।"
- "যখন তিনি সালামের বৈঠকে বসতেন, তখন দুই পা বের করে দিতেন এবং পাছার উপর ভর করে বসতেন।"

এই শেষ বাক্যটি থেকে ইমাম শাফেয়ি প্রমুখ এই দলিলও গ্রহণ করেছেন যে, সালামের বৈঠক হলেই দুই পা বের করে পাছা মাটিতে রেখে পাছার উপর ভর করে বসতে হবে, চাই সেটা চার রাকাতী নামায হোক, কিংবা দুই রাকাতী, অথবা তিন রাকাতী।

- অবশ্য হাদিসের প্রকাশ্য ভাষা থেকে এমনটি বুঝা যায়না, তবে হাদিসের বক্তব্য থেকে এভাবে প্রকাশ পায়।

- হাদিসে বাহ্য বক্তব্য তো প্রথম বৈঠকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর এটাকে দ্বিতীয় বৈঠক বা সালামের বৈঠক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং হাদিসের বাহ্য বক্তব্য থেকে এটা তিন রাকাতী বা চার রাকাতী নামাযের শেষ বা দ্বিতীয় বৈঠকের বৈশিষ্ট্য বলেই প্রমাণিত হয়।

এতো গেলো এ বৈঠকের একদিক। অপরদিকে তিনি যখন তাশাহ্হুদের জন্যে বসতেন, তখন ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং তিন আংগুল মিলিয়ে রেখে শাহাদাত আংগুল খাড়া করতেন। অপর বর্ণনায়

এসেছে, তখন তিন আংগুল মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আংগুল খাড়া করতেন। আর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন। (সহীহ্ মুসলিম : ইবনে উমর রা.)

এদিকে ওয়ায়েল ইবনে হিজর রা. বর্ণনা করেছেন : আমি দেখেছি রসূল সা. তাশাহ্হুদের বৈঠকে বসে বাম হাত বাম উরুর উপর বিছিয়ে রেখেছেন। ডান হাতের কনুই ডান উরুর উপর বিছিয়ে রেখেছেন এবং দুটি আংগুলের একটি দিয়ে আরেকটিকে চেপে ধরে একটি কুণ্ডলীর মতো পাকান আর শাহাদাত আংগুল খাড়া করে সেটি নাড়াতে থাকেন ও দু'আ করতে থাকেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারমি : ওয়ায়েল ইবনে হিজর রা.)

সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা-এর বর্ণনায় আছে : "তিনি বাম হাত বাম হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। এ সময় তিনি তিপ্পান্ন বুঝানোর জন্যে আংগুল যেভাবে জুড়ে নেয়া হয়, সেভাবে জুড়ে নিতেন এবং শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন।"

- আসলে এই সবগুলো বর্ণনাই এক। যেমন-

ক. যে বর্ণনায় বলা হয়েছে : তিন আংগুল মুষ্টিবদ্ধ রাখতেন; তাতে বুঝানো হয়েছে, মধ্যমাও মিলানো থাকতো, তর্জনির (শাহাদাত আংগুলের) মতো সেটি উন্মুক্ত থাকতোনা।

খ. যে বর্ণনায় বলা হয়েছে, দুই আংগুলের একটি দিয়ে আরেকটি চেপে ধরতেন, তাতে বুঝানো হয়েছে, পাশের দুই আংগুল যেভাবে মিলানো থাকতো, মধ্যমা সেভাবে বা সেগুলোর বরাবরে মিলানো থাকতোনা।

গ. আর যে বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিপ্পান্ন বুঝানোর মতো আংগুল জুড়ে নিতেন, সেখানে মধ্যমা জুড়ে নেয়ার কথাই বলা হয়েছে। তবে তা পাশের দুই আংগুলের সাথে নয়, বরং বৃদ্ধাংগুলের সাথে।

তিনি দুই হাত দুই উরুর উপর বিছিয়ে রাখতেন। উরু এবং হাতের মাঝে ফাঁক রাখতেন না। হাতের কনুই উরুর শেষ প্রান্তের সাথে মিলে থাকতো।

- বাম হাতের আংগুলগুলো বাম উরুর উপর বিছিয়ে রাখতেন।

আংগুল কিবলামুখী রাখতেন

রসূলুল্লাহ সা. তাশাহ্হুদের সময় হাতের আংগুল কিবলামুখী করে রাখতেন। এছাড়াও রফে ইয়াদাইন এবং রুকূ ও সাজদার সময় তিনি হাতের আংগুল কিবলামুখী রাখতেন। তিনি সাজদার সময় দুই পায়ের আংগুলও কিবলামুখী করে রাখতেন।

প্রত্যেক বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়তেন

রসূলুল্লাহ সা. প্রথম বৈঠকের মতো শেষ বৈঠকেও তাশাহ্হুদ পড়তেন। তিনি দুই রাকাত পরপর তাশাহ্হুদ পড়তেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে কুরআনের সূরার মতো তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রথম বৈঠকে যেরকম তাশাহ্হুদ পড়তেন, শেষ বৈঠকেও একই রকম তাশাহ্হুদ পড়তেন। তাঁর তাশাহ্হুদের বর্ণনা আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি।

রসূলুল্লাহর প্রতি সালাত (দরূদ)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, সে যেনো আল্লাহর হামদ ও ছানা (আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ব) বর্ণনা করে এবং তাঁর নবীর উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করে। অতপর যেনো সে ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো দু'আ করে।"

হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ফুযালা ইবনে উবায়েদ। ইমাম তিরমিযি এটিকে সহীহ হাদিস বলেছেন।[১২]

রসূলুল্লাহ সা. নিজেও নিজের উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করতেন। সাহাবাগণকেও শিখিয়ে গেছেন তাঁরা কোন্ ভাষায় তাঁর প্রতি সালাত[১৩] পাঠ করবে।[১৪]

---

১২. অনুরূপ হাদীস মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী এবং আবু দাউদেও বর্ণিত হয়েছে। রসূল সা. তাঁর প্রতি সালাম শেষে দরূদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস থেকে উভয় তাশাহ্হুদের পরেই দরূদ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে কেউ কেউ প্রথম তাশাহ্হুদের পরে দরূদ পড়াকে মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু তাদের মতের পক্ষে হাদিসের প্রমাণ নাই।

১৩. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর 'জামউল ইফহাম' গ্রন্থে 'সালাত'-এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশে রসূল সা.-এর প্রতি সালাত পাঠ করাকে 'দরূদ' বলা হয়। এটা ফার্সি শব্দ। রসূল সা. উপর সালাত পাঠানোর জন্যে দু'আ করা মানে- তার জন্যে রহমতের দু'আ করা। আবুল আলিয়্যা (র) বলেছেন, রসূল সা. এর উপর সালাত পাঠানোর জন্যে দু'আ করা মানে তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা বাড়িয়ে দেবার জন্যে দু'আ করা।

১৪. রসূল সা. এর প্রতি কোন্ ভাষার সালাত (দরূদ) পাঠ করতে হবে, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এখানে তা উল্লেখ করেননি। তাই আমরা হাদিস গ্রন্থাবলী থেকে কতিপয় সালাত (দরূদ) এখানে উল্লেখ করছি :

- বুখারি. মুসলিম, তাহাবি, হুমায়দি, বায়হাকি ও নসায়ীতে বর্ণিত দরূদ (সালাত) :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ
اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ○ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ○`

নবীর জন্যে 'সালাত' পাঠ করা মানে নবীর জন্যে রহমত, সম্মান, মর্যাদা, প্রশংসা ও কল্যাণের দু'আ করা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করো। তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতিও অনুরূপ করো, যেমনটি করেছিলে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি সপ্রশংসিত ও মহা সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের বরকত (কল্যাণ) দান করো, যেমন বরকত দান করেছিলে ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের। নিশ্চয়ই তুমি সপ্রশংসিত মহা সম্মানিত।"

- মুসনাদে আহমদ ও নাসায়ীতে এই দরূদের উল্লেখ হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

- সহীহ মুসলিমে এই দরূদের উল্লেখ রয়েছে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ فِى الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

- মুসনাদে আহমদ ও তাহাবিতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. নিজের জন্যে এই দরূদ পড়ে দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ بَيْتِهٖ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

- বুখারি নাসায়ী তাহাবি এবং মুসনাদে আহমদে এই দরূদের কথাও বর্ণিত হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ ○

- বুখারি মুসলিমে এই দরূদটিও উল্লেখ হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

তিনি নামাযের ভিতর সাত জায়গায় দু'আ করতেন

রসূলুল্লাহ্ সা. নামাযের মধ্যে সাত জায়গায় দু'আ করতেন। সে সাতটি স্থান নিম্নরূপ :

১. তাকবীরে তাহরীমার পর, নামায শুরুর প্রাক্কালে।

২. কিরাত শেষে রুকূতে যাবার পূর্বে বিতর নামাযে এবং সাময়িকভাবে ফজর নামাযে দু'আ কুনূত পড়া। অবশ্য এ স্থানে দু'আ করার বিষয়ে যে হাদিস আছে, তা সহীহ কিনা- সে সম্পর্কে প্রশ্ন আছে।

৩. রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَرِدِ . اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ ○

অর্থ : আল্লাহ্ তার কথা শুনেন (কবুল করেন), যে তাঁর প্রশংসা করে। আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমার! আসমান ভরা প্রশংসা তোমার, যমীন ভরা প্রশংসা তোমার! এ ছাড়াও তুমি যা চাও, তা পূর্ণ করা প্রশংসা তোমার। হে আল্লাহ্! আমাকে বরফ, ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুইয়ে পবিত্র ও পরিষ্কার করে দাও! হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ্ খাতা থেকে আমাকে পবিত্র করে দাও, যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে ধবধবে পরিষ্কার করা হয়।"

৪. তিনি রুকূর মধ্যেও দু'আ করতেন। বলতেন :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ○

অর্থ : পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ্, আমাদের প্রভু! প্রশংসা তোমারই হে প্রভু, আমাকে মাফ করে দাও।"

৫. সাজদায়। সাজদায়ই তিনি বেশি দু'আ করতেন।
৬. দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে।
৭. তাশাহ্হুদের পরে এবং সালামের পূর্বে।

তিনি নিজে এসব স্থানে দু'আ করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও দু'আ করতে বলেছেন।[১৫]

---

১৫. তাশাহ্হুদের পরে এবং সালামের পূর্বে যে সব দু'আ, তন্মধ্যে রসূল সা. উপর সালাত (দরূদ)ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কারণ সালাত (দরূদ)ও এক প্রকার দু'আ।

সালাম ফিরানোর পূর্বে রসূলুল্লাহর বিভিন্ন দু'আ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রসূল সা. নামাযের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দু'আ করতেন। কোন্ স্থানে কি কি দু'আ করতেন তাও কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। তাশাহ্হুদের পরে রসূলুল্লাহ সা. নিজে বিভিন্ন দু'আ করেছেন এবং সাহাবাগণকেও বিভিন্ন দু'আ শিখিয়েছেন। এখানে তাঁর কতিপয় দু'আ উল্লেখ করা হলো, যেগুলো বিশেষভাবে তাশাহ্হুদের পরে এবং সালামের পূর্বে পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ - (بخارى ومسلم)

অর্থ : আয় আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে কবর আযাব থেকে পানাহ্ চাই, মসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাই এবং জীবন কালের ও মৃত্যুর পরের ফিতনা থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই পাপ কাজ এবং ঋনগ্রস্ত হওয়া থেকে।" (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

- রসূলুল্লাহ সা. সব সময় এ কয়টি জিনিস থেকে পানাহ্ চাইতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[১৬]

- রসূলুল্লাহ সা. কখনো এই দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِى فِيْمَا رَزَقْتَنِى○

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গুণাহ মাফ করে দাও। আমার ঘর আমার জন্যে প্রশস্ত করে দাও, আর তুমি আমাকে যে জীবিকাই দান করবে, তাতে কল্যাণ ও প্রাচুর্য দাও।"

---

১৬. সহীহ মুসলিম এবং নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. সাহাবাগণকে তাশাহ্হুদের পরে নিম্নোক্ত ভাষায় চারটি জিনিস থেকে পানাহ্ চাইতে আদেশ করেছেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ مَسِيْحِ الدَّجَّالِ○

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ্ (আশ্রয়) চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, কবর আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মসীহে দাজ্জালের ক্ষতি থেকে।"

নাসায়ীতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. নামাযে এভাবেও আল্লাহর কাছে পানাহ (আশ্রয়) চাইতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ بَعْدُ ○

অর্থ : হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে পানাহ চাই আমার কৃতকর্মের ক্ষতি থেকে এবং ভবিষ্যতে যেসব কাজ করতে পারবোনা, সেগুলোর ক্ষতি থেকে।"

কখনো এই দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَّاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ○

অর্থ হে আল্লাহ! তোমার হুকুম পালনে আমি তোমার কাছে অটলতা ও অগ্রগামীতা প্রার্থনা করছি। সত্য-সঠিক পথে চলার জন্যে মনের দৃঢ়তা প্রার্থনা করছি। তোমার কাছে আমার প্রার্থনা- আমি যেনো তোমার নি'আমতের শোকর আদায় করি এবং সর্বোত্তম পন্থায় তোমার ইবাদত করি। আমি তোমার কাছে চাই একটি প্রশান্ত হৃদয় আর একটি প্রকৃতভাষী যবান। আমি তোমার কাছে চাই- তুমি যা কিছু আমার জন্যে ভালো মনে করো। আমি সেইসব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, যা কিছু তুমি আমার জন্যে ক্ষতিকর মনে করো। আমার যতো দোষত্রুটি তোমার জ্ঞানে আছে, আমি সেগুলো থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাই।"[১৭]

---

১৭. হাদিসে তাশাহ্হুদের পরের আরো বিভিন্ন দু'আ উল্লেখ আছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন রকম দু'আ করেছেন সাহাবাগণকেও শিখিয়েছেন, আবার কোনো সাহাবীর নিজস্ব দু'আও সমর্থন করেছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম তাঁর গ্রন্থে সব দু'আ উল্লেখ করেননি। তাই আমার টীকায় আরো কতিপয় দু'আ উল্লেখ করছি :

- নাসায়ী এবং মুসতাদরকে হাকিমে রসূলুল্লাহ সা. নামাযে এই দু'আ পড়তেন বলে উল্লেখ হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًالِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًالِّىْ. اَللّٰهُمَّ وَاَسْئَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْئَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضٰى وَاَسْئَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لَّا يَبِيْدُ وَاَسْئَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَاتَنْفَدُّ وَلَاتَنْقَطِعُ وَاَسْئَلُكَ الرِّضٰى بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْئَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْئَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَاَسْئَلُكَ الشَّوْقَ اِلٰى لِقَاءِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءِ مُّضِرَّةٍ وَلَافِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ ○ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ ○

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার গায়েব সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সৃষ্টির উপর তোমার যে শক্তি তা দ্বারা আমাকে ততোদিন জীবিত রেখো যতোদিন আমার জন্য হায়াতকে তুমি উত্তম

মনে করবে। আর যখন আমার জন্য মৃত্যুকে উত্তম মনে করবে, তখন আমাকে মৃত্যু দিও। হে আল্লাহ! আমি গোপনে ও প্রাকশ্যে আল্লাহভীতি কামনা করি, রাগ ও সন্তুষ্টির মুহূর্তে আমি সত্য কথা বলা ও সুবিচার করার তাওফীক প্রার্থনা করি। অভাব ও প্রাচুর্যের মধ্যে মিতব্যয়িতা চাই। তোমার কাছে অফুরন্ত নিয়ামত চাই। চোখের অবিচ্ছিন্ন শীতলতা চাই। মৃত্যুর পর তোমার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি। পর জীবনে শান্তি, শীতলতা চাই। তোমার চেহারার প্রতি দৃষ্টি লাভের আনন্দ প্রার্থনা করি। তোমার সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ কামনা করি কোনো ক্ষতিকর বিষয় এবং পথভ্রষ্টকারী ফিতনা ছাড়া। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমন্ডিত করো এবং আমাদেরকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও।"

- রসূলুল্লাহ সা. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-কে নামাযে এই দু'আ করতে শিখিয়েছেন :

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ○

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার হিসাব নিও সহজ করে। (মুসনাদে আহমদ, হাকিম)

- বুখারি ও মুসলিমে উল্লেখ হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. আবু বকর রা. কে নামাযে নিম্নোক্ত দু'আ করতে বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ
مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, তুমি ছাড়া আর কেউ তা মাফ করতে পারে না। তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা করো এবং আমাকে রহম করো। নিশ্চয়ই তুমি অত্যাধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"

- মুসনাদে ইমাম আহমদ, আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারি, তায়ালিসি এবং ইবনে মাজাহ্তে বর্ণিত হয়েছে, নামাযে পড়ার জন্যে রসূলুল্লাহ সা. মা আয়েশাকে এই দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ وَمَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَاَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ
وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ
عَمَلٍ وَاَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَاسَالَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ ص وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ
مَاسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ وَّاَسْئَلُكَ مَاقَضَيْتَ لِىْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ
تَجْعَلَ عَاقِبَتَهٗ لِىْ رُشْدًا ○

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার জানা-নাজানা, দ্রুত প্রাপ্য এবং বিলম্বিত সকল কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে দ্রুত ও বিলম্বিত সকল মন্দ থেকে যা আমি জানি এবং যা জানি না- পানাহ চাই। আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই এবং তা

উল্লেখ করেছি। রসূলুল্লাহ্ সা. সাজদায় যেসব দু'আ করতেন, সেগুলো যদিও আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি, তবু সাজদায় পঠিত তাঁর আরেকটি দু'আ এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি :

رَبِّ اعْطِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ○

অর্থ আমার প্রভু! আমাকে আমার নফসের তাকওয়া দান করো এবং আমার নফস্‌কে পরিশুদ্ধ করো, তুমিই নফসের সর্বোত্তম পবিত্রতাদানকারী আর তুমিই তো তার অভিভাবক।"

লাভ করার সহায়ক কথা ও কাজ কামনা করি এবং তোমার কাছে তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ সা. যে কল্যাণ কামনা করেছেন সে সকল কল্যাণ কামনা করি। তোমার কাছে যে মন্দ ও অকল্যাণ থেকে তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ সা. আশ্রয় চেয়েছেন আমি সে সকল মন্দ ও অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে আমার ভাগ্যে নির্ধারিত বিষয় সমূহের ভালো পরিণাম কামনা করি।"

- রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে তাশাহ্হুদে নিম্নোক্ত দু'আ পড়তে শুনে বলে উঠেন : একে মাফ করে দেয়া হয়েছে, একে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَلِيْ ذُنُوْبِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! তুমি এক ও একক। কারুর মুখাপেক্ষী তুমি নও, তুমি সেই সত্তা, যিনি কোনো সন্তান জন্ম দেননি এবং নিজেও জন্ম নেননি, যার কোনো সমকক্ষ নেই, আমার গুনাহ মাফ করো, তুমি নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (আবু দাউদ, নাসায়ী)

- আবু দাউদ, নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ, আদাবুল মুফরাদ, তাবরানি প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ الْمَنَّانُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ○

রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে তাশাহ্হুদে এই দু'আটি পড়তে শুনে সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা কি জানো, সে কি দিয়ে দু'আ করেছে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সর্বাধিক জানেন। তিনি বলেন, আমার প্রাণ যার হাতে, তাঁর শপথ করে বলছি : সে আল্লাহর মহান নাম সহকারে দু'আ করেছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে আল্লাহর 'ইসমে আযম' সহকারে দু'আ করেছে। ঐ নামে তাঁকে ডাকা হলে তিনি জবাব দেন এবং কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করেন।

এই দু'আটির অর্থ হলো :

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। সকল প্রশংসা তোমার, তুমি ছাড়া

ইমাম এক বচনে নাকি বহু বচনে দু'আ করবে?

রসূলুল্লাহ সা. নামাযে যতো দু'আ করেছেন বলে হাদিসে উল্লেখ ও সংরক্ষিত হয়েছে, তা সবই একবচনে, অর্থাৎ তিনি নিজের জন্যে দু'আ করেছেন। এমনকি সাহাবাগণকে নামাযে যেসব দু'আ করতে শিখিয়েছেন, সেগুলোও এক বচনে। যেমন, তিনি নামাযে এভাবে (নিজের জন্যে এক বচনে) দু'আ করতেন : رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ ০

অর্থ : আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম করো এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো।"

সব দু'আই তিনি এভাবে একবচনে করতেন। নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার পর প্রথম দু'আ করতেন। তাও এক বচনেই এভাবে করতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَرَدِ . اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ...

অর্থ হে আল্লাহ! বরফ, ঠাণ্ডাবস্তু এবং ঠাণ্ডা পানি দিয়ে আমার গুনাহ-খাতা ধুইয়ে মুছে আমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দাও। হে আল্লাহ! আমার আর আমার গুনাহ-খাতার মাঝে সেরকম দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছো উদয়াচল আর অস্তাচলের মাঝে।..... (পুরো হাদিসটিই এভাবে একবচন)।

এখন এ বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করেছে একটি হাদিস। হাদিসটি মুসনাদে আহমদ এবং সুনান গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে সাওবান রা. থেকে। তিনি বলেন, নবী করীম সা. বলেছেন :

কোনো ইলাহ নেই, তুমি এক ও একক, তোমার কোনো শরিক নেই। হে মহাপোকারী আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, হে মহান ও সম্মানিত, হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।"

- মুসলিম এবং আবু আওয়ানা বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. তাশাহ্হুদের পরে এবং সালামের পূর্বে সর্বশেষ এই ভাষায় প্রার্থনা করতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ ০

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার আগের ও পরের সব গুনাহ, গোপন ও প্রকাশ্য সব গুনাহ, আমার সব সীমালংঘন এবং যা সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে অধিক জানো, আমার সে সব গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই এগিয়ে দাও এবং তুমিই পিছিয়ে দাও। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"

"কোনো ব্যাক্তি যদি কোনো কওমের ইমাম (নেতা) হয়, আর দু'আ করার সময় যদি কেবল নিজের জন্যেই দু'আ করে, তবে সে খিয়ানত করে।"

ইবনে খুযাইমা তাঁর সহীহ্ হাদিস সংকলনে এই হাদিসটিকে মওজু হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ

- হাদিসেটিকে নামাযে একবচনে নিজের জন্যে দু'আ করার দলিল হিসেবে গ্রহণ করে সাওবান রা. থেকে বর্ণিত হাদিসকে রদ (খন্ডন) করে দেন।

আমি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে বলতে শুনেছি, সাওবান রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটির ভাষ্য কেবল দু'আ কুনূত ধরনের সামগ্রিক দু'আর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নামাযে তো কেবল সেইসব দু'আই করতে হবে, যেগুলো রসুলুল্লাহ সা. নিজে করেছেন, করতে শিখিয়েছেন এবং অনুমোদন করেছেন।[১৮]

রসূলুল্লাহর সালাম ফিরানো পদ্ধতি

দু'আ শেষ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ٥

অর্থ আপনাদের প্রতি সালাম (শান্তি) ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক' বলে প্রথমে ডান দিকে ফিরতেন এবং একই বাক্য উচ্চারণ করতে করতে পরে বাম দিকে ঘাড় ফিরাতেন।

তিনি এভাবে সালাম বলে দু'দিকে ঘাড় ফিরাতেন বলে পনেরজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন :

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু।

২. সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহ আনহু।

৩. সহল বিন সা'আদ আস সায়েদী রাদিয়াল্লাহ আনহু।

৪. ওয়ায়েল বিন হিজর রাদিয়াল্লাহ আনহু।

৫. আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহ আনহু।

৬. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহ আনহু।

৭. আম্মার ইবনে ইয়াসের রাদিয়াল্লাহ আনহু।

---

১৮. আমাদের মতে সাওবান রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটি সহীহ্ না হলেও হাদিসটির বক্তব্য সঠিক। আর সে বক্তব্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তথা সামষ্টিক ইমামতের (নেতৃত্বের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু।
৯. জাবির বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১০. বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১১. আবু মালিক আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১২. তলক ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১৩. আউস ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১৪. আবু রমছা রাদিয়াল্লাহ আনহু।
১৫. আদী ইবনে উমায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু।

রসূল সা. সামনের দিকে ফিরে থাকা অবস্থায়ই কেবল একটি সালাম বলে নামায শেষ করতেন বলেও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ বক্তব্য কোনো সহীহ সূত্র থেকে প্রমাণিত নয়। এ ক্ষেত্রে কেবল আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটিই বিবেচনায় আনা যেতে পারে। সুনান[১৯] গ্রন্থাবলীতে তাঁর হাদিসটি সংকলিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনাটি হলো :

"নামায শেষে রসূলুল্লাহ সা. 'আস্সালামু আলাইকুম উচ্চারণ করে কেবল একটি সালামই বলতেন এবং সেটা তিনি এতোটা শব্দ করে উচ্চারণ করতেন যে, আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠতাম।"

কতিপয় সংগত কারণে এই হাদিসটি ত্রুটিপূর্ণ এবং সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সে কারণগুলো হলো :

১. আয়েশা রা.-এর বক্তব্য থেকে পরিস্কার বুঝা যায়, তিনি রসূল সা.-এর রাত্রের (নফল বা তাহাজ্জুদ) নামায সম্পর্কে একথা বলেছেন।
২. এছাড়া আয়েশা রা. ঘুমে থাকার কারণে প্রথম সালামটি না শুনে হয়তো দ্বিতীয় সালামটি শুনে থাকবেন।
৩. যারা দুই সালামের কথা বর্ণনা করেছেন, তাঁরা জাগ্রত অবস্থায় এবং রসূল সা. এর সাথে নামায পড়া অবস্থায় তাঁকে দুই সালাম করতে দেখেছেন।
৪. দুই সালাম সংক্রান্ত হাদিসগুলো অধিকাংশই সহীহ, বাকীগুলো হাসান আর সংখ্যায়ও অনেক।
৫. আয়েশা রা. এখানে এক সালামের কথা উল্লেখ করলেও দুই সালামের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন।

- এসব কারণে দুইদিকে দুই সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করার বিষয়টিই সুপ্রতিষ্ঠিত।

---

১৯. 'সুনান গ্রন্থাবলী' বলতে বুঝায় তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহকে। এই চারটি গ্রন্থকে একত্রে 'সুনানে আরবায়া' (সুনান চতুষ্টয়)ও বলা হয়।

পরবর্তীতে উমাইয়া শাসকরা মদিনাসহ বিভিন্ন শহরে এক সালামের প্রচলন করে। ফলে সেই সময়কার প্রজন্মের কিছু লোকের ধারণা হয়, এক সালামের মাধ্যমেই বুঝি নামায শেষ করতে হয়। মসজিদে এসে এক সালাম দেখে তাদের মধ্যে এ ধরণা জন্মে। কিন্তু রসূলুল্লাহ সা. নিজে নামাযের যে রীতি প্রচলন করেছেন এবং খুলাফায়ে রাশেদীন যে রীতির অনুসরণ করেছেন আর সহীহ হাদিসের মাধ্যমে যেগুলো সুপ্রমাণিত হয়েছে, তার বিপরীত কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।

এক সালাম সংক্রান্ত আরো যে দুয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলো সবই দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ ও বাতিল।

সালামের পরে মুক্তাদিদের নিয়ে মুনাজাত (দু'আ) করা প্রসংগ

সালাম ফিরানোর পর কিবলার দিকে ফিরে, কিংবা মুক্তাদিদের দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে দু'আ বা মুনাজাত করার যে প্রথা চালু হয়েছে, তার কোনো প্রমাণ রসূলুল্লাহ সা. থেকে পাওয়া যায়না। সহীহ বা হাসান কোনো সূত্রেই পাওয়া যায়না। আবার অনেকেই খাস করে ফজর এবং আসর নামাযের পর মুক্তাদিদের দিকে ফিরে এরূপ মুনাজাত করার রীতি চালু করেছেন। কিন্তু এটাও রসূলুল্লাহ সা. কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীনের কোনো একজন থেকেও প্রমাণিত নয়। এমনটি করার কোনো নির্দেশ বা ইংগিতও তিনি উম্মতকে প্রদান করেননি।

যারা সালামের পর কিবলার দিকে ফিরে কিংবা ফজর ও আসরের পরে মুক্তাদিদের দিকে ফিরে মুনাজাত করার প্রথা চালু করেছেন, এটা তারা সুন্নতের বিকল্প হিসেবে চালু করেছেন। এটাকে তারা ভালো কাজ মনে করেন। সুন্নতের পরিবর্তে এমনটি করা ভালো কাজ কিনা তা আল্লাহই ভালো জানেন।

হাদিসে নামায সংক্রান্ত যতো দু'আর কথা উল্লেখ হয়েছে, সবই রসূলুল্লাহ সা. নামাযের ভিতরে করেছেন এবং নামাযের ভিতরে করার জন্যেই নির্দেশ দিয়েছেন।

বান্দা যতোক্ষণ নামাযে থাকে, ততক্ষণ তো প্রকৃতপক্ষে তার প্রভুর সাথে তার মুনাজাত (গোপন কথাবার্তা) হয়। সেজন্যে রসূল সা. নামাযের ভিতরেই দু'আ করেছেন এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন। তখনইতো বান্দা তার প্রভুর একান্ত নিকটে থাকে, সেটাই তো চাওয়ার (দু'আর) প্রকৃত সময়।

কিন্তু যখন সে নামাযের সালাম ফিরায়, তখনতো মুনাজাত (গোপন কথাবার্তা)-এর ধারা ছিন্ন হয়ে যায়। তাই মোক্ষম সময়ই প্রভুর কাছে

চাওয়া উচিত, অর্থাৎ নামাযের ভিতর। এটাই সুন্নত। এটাই উত্তমপন্থা। সুন্নতের বিপরীত নিজেদের কোনো রীতি বানিয়ে নেয়া উত্তম নয়।

তবে হ্যাঁ, যে কোনো সময় যে কেউ আল্লাহর কাছে চাইতে পারে, দু'আ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তার উচিত, প্রথমে তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর প্রভৃতি রসূল সা. -এর শিখানো পদ্ধতিতে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ করা। অতপর যা ইচ্ছা দু'আ করা, চাওয়া।

এমনটি করা হলে এটা আলাদা একটা ইবাদতের পরে দু'আ করা হলো। নামাযের সাথে আর এর সম্পর্ক থাকলোনা। এভাবে নামাযের সাথে যুক্ত করে সালামের পরে হাত উঠিয়ে দু'আ বা মুনাজাত করার বানানো প্রথা চালু করা থেকে বাঁচা যায়।[২০]

এভাবে যেকোনো সময় দু'আ করা যায়। এভাবে আল্লাহর স্মরণ এবং রসূল সা.-এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠের পর দু'আ করলে সে দু'আও কবুল হয়। ফুযালা ইবনে ওবায়েদ বর্ণিত হাদিস থেকে এটা বুঝা যায়। কিন্তু নামাযের বাইরের দু'আকে নামাযের সাথে যুক্ত করা ঠিক নয়।

জুতা পরে এবং এক কাপড়ে নামায পড়া

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. কখনো কখনো খালি পায়ে নামায পড়তেন, আবার কখনো কখনো জুতা পরে নামায পড়তেন। (আবু দাউদ)

ইহুদীদের বিপরীত করার জন্যে তিনি জুতা পরে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : তোমরা ইহুদীদের বিপরীত করো, তারা জুতা ও চামড়ার মোজা পরে নামায পড়েনা। (আবু দাউদ)

তিনি বলেছেন তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে, সে যেনো জুতা পরে থাকে। তবে খুলতে চাইলে খুলে যেনো তা দুই পায়ের মাঝখানে

---

২০. বাংলাদেশে ও আশেপাশের অঞ্চলের লোকেরা নামাযের সাথে একাজকে একাকার করে ফেলেছে। অজ্ঞ লোকেরা নামাযের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাকে নামাযের অংগ বা নামাযের সাথে যুক্ত মনে করে। অথচ রসূল সা. এবং সাহাবায়ে কিরাম এমনটি করেননি। নামাযের ইমামগণ এমনটি করাকে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। অনেক ইমাম এমনটি করেন মুক্তাদিদের মন রক্ষার্থে, না করলে ইমামতি রক্ষা করা যাবে না বলে। আসলে যে কাজটি আদৌ সুন্নত নয়, এমন একটি কাজকে সুন্নত বানিয়ে নেয়া, এমনকি ফরযের মতো অনিবার্য করে নেয়াটা কি যুক্তিসংগত হতে পারে?

রাখে।[২১] যেখানে সেখানে জুতা রেখে কাউকে কষ্ট না দেয়।" (আবু দাউদ)

রসূলুল্লাহ সা. কখনো কখনো এক কাপড়ে নামায পড়তেন। আবার কখনো কখনো দুটি কাপড় পরে নামায পড়তেন। তবে দুই কাপড় পরেই বেশিরভাগ পড়তেন।[২২/১]

নামাযে তাঁর আনন্দ, প্রশান্তি, বিনয় ও কান্না

- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন, মাথা কিছুটা ঝুঁকিয়ে আনত করে রাখতেন।

- নামায রসূলুল্লাহ সা.-এর চোখ জুড়াতো। নামাযের মধ্যেই তিনি আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করতেন। তিনি বলতেন :

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلاَةِ ○

অর্থ : নামাযে আমার চোখ জুড়ায়। নামাযের মধ্যে আমি আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করি।"

তিনি বিলালকে উদ্দেশ্য করে বলতেন : يَابِلاَلُ اَرِحْنَا بِالصَّلاَةِ ○

অর্থ : বিলাল! নামাযে ডেকে আমার হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে দাও!"

- তিনি বলছেন নামাযে একটা মনোযোগ, ধ্যান, মগ্নতা ও তন্ময়তা আমাকে ঘিরে রাখে।" (বুখারি, মুসলিম)

- রসূলুল্লাহ সা. প্রায়ই নামাযে কাঁদতেন। কান্নায় তাঁর বুকের ভেতর গুমগুম আওয়ায হতো। সাহাবীগণ নামাযে তাঁর কান্না শুনতেন। (আহমদ, নাসায়ী, আবু দাউদ)

---

২১. আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমা এবং হাকিম সহীহ সূত্রে আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : একদিন রসূলুল্লাহ সা. আমাদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যেই তিনি নিজের জুতা খুলে বাম পাশে রাখেন। এটা দেখে মুক্তাদিরাও সবাই নিজ নিজ জুতা খুলে ফেলে। নামায শেষ করে তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কেন জুতা খুললে? আমরা বললাম : আপনাকে খুলতে দেখে আমরাও জুতা খুলে রেখেছি। তখন তিনি বললেন : জিবরিল এসে খবর দিয়েছেন : আমার জুতায় অপবিত্রতা আছে। সে জন্যে আমি জুতা খুলে রেখেছি। তোমরা মসজিদে এলে নিজ নিজ জুতা দেখে নিয়ো-তাতে কোনো অপবিত্রতা আছে কিনা? যদি ময়লা কিছু থাকে, তা মুছে ফেলবে এবং জুতা পরেই নামায পড়বে।"

২২/১. মুসানাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, কাপড়ের অভাব থাকার কারণেই রসূলুল্লাহ সা.-এর কখনো কখনো এক কাপড়ে নামায পড়া হতো। সচ্ছলতার সময় দুই কাপড়ে নামায পড়াই উত্তম।

- গোটা নামাযের বিভিন্ন স্থানে বার বার তিনি পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। গুনাহের জন্যে মাফি চাইতেন। দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অকল্যাণ থেকে ত্রাণ প্রার্থনা করতেন। দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় মংগল কামনা করতেন। এভাবে পুরো নামাযে আল্লাহর সাথে মুনাজাত (একান্ত আবেদন নিবেদন) করতে থাকেতেন।

- নিশি রাতে গোটা দুনিয়া যখন ঘুমাতো, তখন তিনি প্রভুর সান্নিধ্যে হাযির হতেন নামাযের মাধ্যমে।

- প্রভুর শোকর আদায়ের জন্যে তিনি নামায পড়তেন।

- বিপদের সময় তিনি নামায পড়তেন।

- যুদ্ধের সয়দানে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

- প্রভুর সাহায্য প্রার্থনার জন্যে তিনি সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

নামাযে তাঁর সতর্কতা

রসূলুল্লাহ সা. নামাযে নিজের হৃদয়-মনকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিবিষ্ট করতেন, নিজেকে আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে উপস্থিত করতেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণাংগ মনোসংযোগ স্থাপন করতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি নামাযের মধ্যে পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনা করতেন। মুসল্লিদের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখতেন। এখানে সহীহ সূত্রে বর্ণিত এ ধরনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলো :

১. তিনি নামাযকে দীর্ঘ করতেন। কিরাত দীর্ঘ করতেন। সে অনুযায়ী রুকূ সাজদাও দীর্ঘ করতেন। কিন্তু যখনই নামাযের মধ্যে কোনো শিশুর কান্না শুনতেন, তখন তাঁর সাথে নামাযরত শিশুর মায়ের মনের অবস্থা বিবেচনা করে নামায সংক্ষেপ করে দ্রুত শেষ করে দিতেন।

২. কোনো এক যুদ্ধে তিনি একজন অশ্বারোহীকে একটি তথ্য সংগ্রহ করে আনার জন্যে পাঠান। তাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নামাযে দাঁড়ান। নামাযরত অবস্থায় তিনি তাঁর প্রেরিত সেই অশ্বারোহীর আগমণ পথে তাকাচ্ছিলেন। নামাযরত অবস্থায়ও তিনি তাঁর প্রেরিত অশ্বারোহীর ব্যাপারে অসতর্ক হননি।

৩. একবার তিনি তাঁর নাতনী উমামা বিনতে আবিল আস্ (তাঁর কোনো একজন কন্যার মেয়ে)-কে ঘাড়ে নিয়ে ফরয নামায পড়ান। রুকূ ও সাজদায় গেলে ওকে নামিয়ে পাশে বসিয়ে রাখতেন। সাজদা থেকে দাঁড়াবার সময় আবার ঘাড়ে উঠিয়ে নিতেন। (বুখারি ও মুসলিম)

৪. কখনো কখনো তিনি সাজদায় গেলে তাঁর নাতি হাসান বা হুসাইন এসে তাঁর পিঠে বসতো। ওর পড়ে যাবার আশংকায় তখন তিনি সাজদা দীর্ঘ করতেন।

৫. কখনো এমন হতো যে, তিনি নামায পড়ছেন, ঘরের দরজা বন্ধ। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এসে দরজার কড়া নাড়ছেন। তিনি নামাযরত অবস্থায় গিয়ে আয়েশাকে দরজা খুলে দেন এবং ফিরে এসে নামাযের বাকি অংশ শেষ করেন। (আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী)

৬. তাঁর নামায পড়া অবস্থায় যদি কেউ তাঁকে সালাম দিতো, তিনি হাতে ইশারা করে তার সালামের জবাব দিতেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, জাবির রা. বলেন রসূলুল্লাহ সা. আমাকে কোনো একটি কাজে পাঠান। আমি ফিরে এসে দেখি তিনি নামায পড়ছেন। নামাযরত অবস্থায়ই আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি ইশারা করে আমার সালামের জবাব দিলেন।

আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. নামাযরত অবস্থায় ইশারা-ইংগিত করতেন। (মুসনাদে আহমদ)

সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে, সুহাইব রা. বলেন : একবার রসূলুল্লাহ সা. নামায পড়ছিলেন। এসময় আমি তাঁর নিকট দিয়ে যাবার সময় তাঁকে সালাম করলাম। তিনি ইশারায় আমার সালামের জবাব দেন।

একবার রসূলুল্লাহ সা. কুবায় এলেন। তিনি কুবার মসজিদে নামায পড়ছিলেন এমন সময় একদল আনসার সাহাবী এলেন। তারা নামাযরত অবস্থায়ই তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি ইশারা করে তাদের সালামের জবাব দেন।

ইমাম তিরমিযি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন এটি সহীহ হাদিস।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তন করে রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে সাক্ষাত করতে এলাম। এসে দেখি তিনি নামায পড়ছেন। এ অবস্থায় আমি তাঁকে সালাম দিই। তিনি মাথায় ইশারা করে আমার সালামের জবাব দেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকি।

নামাযে ইশারা করার ক্ষেত্রে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস বিরোধ সৃষ্টি করে। হাদিসটি আবু গাতফান আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন যে ব্যক্তি নামাযে বোধগম্য ইশারা করবে, সে যেনো পূণরায় নামায পড়ে নেয়।"

ইমাম দারু কুতনি বলেছেন, এটি বাতিল হাদিস-এটি গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, ইমাম আবু দাউদ আমাকে বলেছেন : এই হাদিসের বর্ণনাকারী আবু গাতফান একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। তার বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করা যায়না। অপরদিকে এ হাদিসটি এ সংক্রান্ত সহিহ্ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক। হযরত আনাস এবং হযরত জাবির প্রমুখ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. নামাযরত অবস্থায় ইশারা ইংগিত করতেন।

৭. রসূলুল্লাহ সা. (রাত্রে) যখন ঘরে নামায পড়তেন, আয়েশা রা. তাঁর সাজদার জায়গায় আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকতেন। তিনি যখন সাজদায় যেতেন, আয়েশাকে সরে যাবার জন্যে তার গায়ে টিপ দিতেন, বা চিমটি কাটতেন। তখন আয়েশা রা. পা গুটিয়ে নিতেন। তিনি সাজদা সেরে দাঁড়িয়ে গেলে আয়েশা রা. পূণরায় পা বিছিয়ে দিতেন। (বুখারি)

৮. একবার রসূলুল্লাহ সা. নামায পড়ছিলেন। এমন সময় শয়তান আসে তাঁর নামাযে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে। তিনি শয়তানের গলা চেপে ধরেন, এমনকি এতে শয়তানের লালা বা জিহ্বা বেরিয়ে তাঁর হাতে লাগে। (মুসনাদে আহমদ, দারু কুতনি)

৯. তিনি কখনো কখনো মিম্বরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। সেখানেই রুকূ করতেন। সাজদার সময় মিম্বর থেকে নেমে পেছনে সরে এসে যমীনের উপর সাজদা করতেন। সাজদা শেষ হলে আবার মিম্বরে গিয়ে দাঁড়াতেন। (বুখারি, মুসলিম)

১০. তিনি একবার একটি দেয়ালকে সামনে রেখে নামায পড়ছিলেন। এসময় একটি চতুষ্পদ জানোয়ার (কুকুর) তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে উদ্যত হয়। তিনি সামনে এগিয়ে জানোয়ারটির পেট দেয়ালের সাথে ঠেকিয়ে দেন। ফলে জানোয়ারটি তাঁর পিছে দিয়ে পথ অতিক্রম করতে বাধ্য হয়। (তাবরানি, হাকিম, ইবনু খুযাইমা)

১১. একবার তিনি নামায পড়ছিলেন। এসময় বনি আবদুল মুত্তালিবের দুটি বালিকা হাতাহাতি করতে করতে তাঁর সামনে এসে পড়ে। তিনি নামাযরত অবস্থায়ই ওদের ধরেন এবং একজনকে আরেকজন থেকে ছাড়িয়ে দেন। ইমাম আহমদের বর্ণনায় একথাও আছে যে, মেয়ে দুটি নবী করীম সা.-এর হাঁটু আঁকড়ে ধরলো। অতপর তিনি তাদের ছাড়িয়ে দেন, কিংবা থামিয়ে দেন। কিন্তু নামায অব্যাহত রাখেন।

১২. একবার তিনি নামাযে দাঁড়ালে একটি বালক তাঁর সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হয়। তিনি তাকে হাতে ইশারা করে ফিরে যেতে বললে সে ফিরে যায়। (মুসনাদে আহমদ)

১৩. আরেকবার তিনি নামায পড়ছিলেন। এমন সময় একটি বালিকা তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। তিনি তাকে হাতে ইশারা করলে সে ফিরে যায়। (সুনান গ্রন্থাবলী)

১৪. তিনি কখনো কখনো নামাযরত অবস্থায় সাজদার জায়গায় ফুঁক দিতেন। অবশ্য ফুঁক দেয়ার হাদিসটি প্রশ্ন সাপেক্ষে। যদিও হাদিসটি মুসনাদে আহমদ ও সুনান গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ হয়েছে। এটি মূলত রসূল সা. থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়ে আসেনি।

১৫. তিনি নামাযে কাঁদতেন।

১৬. তিনি নামাযে গলা ঝেড়ে নিতেন। গলা ঝেড়ে ইশারাও করতেন। আলী রা. বলেন আমি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় দু'বার রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে যেতাম। আমি গিয়ে ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইতাম। আমার আগমণের সময় কখনো তিনি নামাযরত থাকতেন। এ সময় তিনি গলা ঝেড়ে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। (সুনানে নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ)

ইমাম আহমদও নামাযে গলা ঝাড়তেন এবং এটাকে তিনি নামায বিনষ্টকারী মনে করতেন না।

এভাবে নামাযে গভীর তন্ময়তা ও আল্লাহমুখীতা সত্ত্বেও তিনি অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করতেন এবং এগুলোকে নামায বিনষ্টকারী মনে করতেন না।

ফরয নামাযে দু'আ কুনূত (বা কুনূতে নাযেলা)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. একমাস অনবরত যুহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর নামাযে দু'আ কুনূত পড়েছেন। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি ফজর নামাযে একমাস দু'আ কুনূত পড়েছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে তিনি মাগরিব নামাযে দু'আ কুনূত পড়েছেন।

মূলত উপরের হাদীসটিই সঠিক। আসলে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই দু'আ কুনূত পড়েছেন।

- তিনি সব সময় দু'আ কুনূত পড়েননি।
- তিনি বিপদকালে দু'আ কুনূত পড়েছেন।
- দু'আ কুনূতে তিনি কারো জন্যে দু'আ এবং কারো জন্যে বদ দু'আ করতেন।

তিনি যে নামাযে দু'আ কুনূত পড়তেন, সে নামাযের শেষ রাকাতে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহু বলে রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে দু'আ কুনূত পড়তেন। দু'আ কুনূত পড়ার পর সরাসরি সাজদায় চলে যেতেন। তিনি দু'আ কুনূত এবং সাজদার মাঝখানে অন্যকিছু করতেন না।

রসূলুল্লাহ সা. যখন দু'আ কুনূত পড়তেন, তখন মুক্তাদিগণ 'আমীন' বলতেন।

সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন কারো জন্যে দু'আ কিংবা কারো জন্যে বদ দু'আ করতে চাইতেন, তখন রুকূর পরে দু'আ কুনূত পড়তেন। রুকূর পরে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহু রাব্বানা লাকাল হামদ্' বলার পর কিছুদিন তিনি এই দু'আ করেছেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ

عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ ○

অর্থ হে আল্লাহ! অলীদ, সালামা বিন হিশাম এবং আইয়াশ বিন আবি রবিআ'কে রক্ষা করো। হে আল্লাহ! তুমি মুদার সম্প্রদায়কে শক্ত করে পাকড়াও করো এবং তাদের উপর ইউসুফ (আ:)-এর কওমের মতো বছরের পর বছর দুর্ভীক্ষ দাও।"

আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমদে ইবনে আব্বাস রা. থেকে যে বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, তিনি কখনো কখনো দু'আ কুনূতে এই বলে বদ দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ○

অর্থ হে আল্লাহ! লিহইয়ান, রা'ল, যাকওয়ান এবং আ'সিয়্যা সম্প্রদায়ের উপর অভিশাপ নাযিল করো। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করেছে।"

আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসূল সা.-এর সাধারণ রীতি ছিলো, যখন বিপদাপদ দেখা দিতো, তখনই দু'আ কুনূত (কুনূতে নাযেলা) পড়তেন। বিপদাপদ দূর হয়ে গেলে পড়া ছেড়ে দিতেন। তিনি শুধু ফজর নামাযেই দু'আ কুনূত পড়াটা নির্দিষ্ট করেননি, অন্যান্য নামাযেও পড়তেন। তবে ফজর নামাযেই বেশি পড়তেন।

মুহাদ্দিসগণ বিপদে আপদে দু'আ কুনূত পড়া মুস্তাহাব মনে করেন। অবশ্য হাদিস সম্পর্কে তাঁরাই বেশি ওয়াকিফহাল। তাঁদের মতে দু'আ কুনূত পড়া এবং ছেড়ে দেয়া দুটোই সুন্নত। তাঁরা মনে করেন, পড়াটাও ভালো, না পড়াটাও ভালো। কারণ রসূল সা. পড়েছেন বলেও হাদিসে আছে, আবার ত্যাগ করেছেন বলেও হাদিসে আছে।

ইমাম যদি মুক্তাদিদের জানিয়ে বা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে দু'আ কুনূত শব্দ করে পড়ে, তবে তাতে দোষ নেই। উমর রা. মুক্তাদিদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে শুরুটা শব্দ করে পড়তেন। ইবনে আব্বাস রা. জানাযায় সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়তেন, যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নত।

ইমামের সশব্দে 'আমীন' বলাটাও এরকমই একটি ব্যাপার। আসলে এগুলো সেইসব মতভেদ (ইখতিলাফ), যেগুলোর উভয়টা করাই মুবাহ্ (বৈধ), কিংবা করা বা না করা উভয়টাই মুবাহ। যেমন নামাযে রফে ইয়াদাইন করা এবং ত্যাগ করা উভয়টাই বৈধ। যেমন, বিভিন্ন প্রকারের তাশাহ্হুদের যে কোনোটি পড়াই বৈধ। যেমন বিভিন্ন আযান ও ইকামতের যে কোনোটি অবলম্বন করাই বৈধ।

কিন্তু, এখানে বৈধ অবৈধ আলোচনা করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য তো কেবল রসূল সা. কী করতেন, কিভাবে করতেন-তা উল্লেখ করা। কারণ তিনি আমাদের নমুনা এবং মাপকাঠি। এ গ্রন্থে আমরা কেবল তাঁর রীতি ও নীতিই অনুসন্ধান করে প্রকাশ করতে চাই। তিনিই তো পূর্ণাংগ পথ প্রদর্শক। তিনিই আমাদের অনুকরণীয়, অনুসরণীয়।

ফরয নামাযে দু'আ কুনূত পড়ার ব্যাপারে যেসব হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলোর সারকথা প্রকাশ হয়েছে ইসলামের একজন বিজ্ঞ আলিমের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, রসূলুল্লাহ সা. কুনূতে নাযেলা (দু'আ কুনূত) কেবল কোনো কওম বা ব্যক্তির জন্যে দু'আ করা কিংবা বদ দু'আ করার জন্যেই পড়েছেন। তারপর যখন তাঁর দু'আর ফল দেখা গেছে, তখন তিনি তা ত্যাগ করেন। তাছাড়া তিনি দু'আ কুনূত শব্দ করেও পড়েছেন, আবার নি:শব্দেও পড়েছেন। তিনি দু'আ কুনূত পড়েছেন আবার তা পড়া ত্যাগও করেছেন। শব্দ করে পড়ার চাইতে বেশি সময় নি:শব্দে পড়েছেন। কুনূত যতো দিন পড়েছেন, তার চাইতে বেশিদিন পড়েননি। কুনূতের ব্যাপারে এই ছিলো তাঁর রীতি। তাছাড়া ফরয নামাযে তিনি রুকূ থেকে দাঁড়িয়েই দু'আ কুনূত পড়তেন। এটাই প্রমাণিত।

সাহু সাজদা (ভুলের সাজদা)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের যেমন ভুল হয়, আমারও ভুল হয়। আমি কোনো কিছু ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।" (বুখারি)

নামাযে রসূলুল্লাহ সা.-এর ভুল হওয়াটা তাঁর উম্মতের জন্যে আল্লাহর নি'আমতের পূর্ণতা। এভাবেই আল্লাহ পাক তাদের জন্যে তাদের দীনকে পূর্ণ করেছেন। কারণ এ প্রক্রিয়াতেই তারা জানতে পেরেছে- নামাযে ভুল হলে তাদের করণীয় কী?

মুআত্তায়ে মালিকে একটি সূত্রবিচ্ছিন্ন হাদিসে রসূলুল্লাহ সা.-এর এই বাণীটি উল্লেখ হয়েছে : আমি ভুলে যাই কিংবা আমাকে ভুলানো হয়, যাতে করে আমি সে বিষয়ে (লোকদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে এবং ব্যাখ্যা দিয়ে) তাদেরকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারি।"

আসলে রসূলুল্লাহ সা.-এর মাঝে মধ্যে ভুলে যাবার কারণেই শরীয়তে ভুলের বিধান তৈরি হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. একদিন তাঁদের সাথে নিয়ে যুহর নামায পড়েন। এ সময় তিনি প্রথম দুই রাকাতের পর না বসেই দাঁড়িয়ে যান। মুক্তাদিরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। এভাবে নামায শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলো, লোকেরা সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিল। ঠিক এমনি সময় রসূলুল্লাহ সা. (শেষ তাশাহ্হুদের এই বসা অবস্থাতেই) সালাম ফিরানোর পূর্বে 'আল্লাহু আকবার' বলে দুটি সাজদা করেন। অতপর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন। (বুখারি-মুসলিম)

এ থেকে এই নিয়ম জানা গেলো যে, কেউ যদি নামাযের আরকান (ফরয) ছাড়া অন্য কোনো অংশ ভুলবশত ছেড়ে দেয়, তবে তাকে সালামের পূর্বে ভুলের সাজদা করতে হবে।

এভাবে ভুলবশত নামাযের কোনো অংগ ছাড়া পড়লে তিনি আবার সেটা সম্পন্ন করার জন্যে প্রত্যাবর্তন করতেন না। যেমন একবার তিনি ভুলবশত প্রথম তাশাহ্হুদের বৈঠক ছেড়ে দাঁড়িয়ে যান। লোকেরা পেছন থেকে 'সুবহানাল্লাহ' বলা সত্ত্বেও তিনি না বসে তাদের দাঁড়য়ে যেতে ইংগিত করেন।

ইয়াযীদ ইবনে হারূণ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার মুগীরা ইবনে শু'বা রা. আমাদের নামায পড়ান। দু'রাকাত পড়ার পর তিনি না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদিরা 'সুবহানাল্লাহ্' বললো। কিন্তু তিনি তাদের

ইশারায় দাঁড়াতে বললেন। অতপর নামায শেষ করে সালাম ফিরালেন। তারপর দুটি সাজদা করলেন। অতপর আবার সালাম ফিরালেন। শেষে বললেন, রসূলুল্লাহ সা. এমনটিই করতেন। হাদিসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযি বলেছেন এটি সহীহ হাদিস।

ভুলের সাজদা সালাম ফিরানোর আগে না পরে এ বিষয়ে হাদিসের মধ্যে কিছুটা বিরোধ দেখা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনার হাদিসে থেকে জানা যায় সালাম ফিরানোর পূর্বে। মুগীরার হাদিস থেকে জানা যায় সালাম ফিরানোর পরে। আসলে বিভিন্ন যুক্তিসংগত কারণে আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা বর্ণিত হাদিসটিই অধিকতর সঠিক। তবে উভয় পদ্ধতিই সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাই যে কোনো একটি পদ্ধতিই অবলম্বন করা যেতে পারে।

রসূলুল্লাহ সা. থেকে নামাযে কয়েক ধরনের ভুল সম্পর্কে জানা যায়। যেমন-

১. একবার রসূলুল্লাহ সা. ইশা, যুহর, কিংবা আসর নামায দুই রাকাত পড়েই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। সালাম ফিরাবার পর কিছু কথাবার্তাও বলেন। অতপর বাকি (দুই রাকাত) নামায পূর্ণ করেন। তারপর সালাম ও কালামের পর দুটি সাজদা করেন। প্রতিটি সাজদায় যাওয়া ও উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলেন।

২. আবু দাউদ ও তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সা. লোকদের নামায পড়ালেন, নামাযে ভুল করলেন, তারপর দুটি সাহু সাজদা করলেন। অতপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরান। ইমাম তিরমিযি বলেছেন এই হাদিসটি হাসান ও গরীব।

৩. একদিন তিনি চার রাকাতের তিন রাকাত নামায পড়িয়ে মুক্তাদিদের দিকে ফিরলেন। তখন তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রা. তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বলেন, আপনি নামায তিন রাকাত পড়েছেন, এক রাকাত পড়তে ভুলে গেছেন। তখন তিনি বিলালকে ইকামত দিতে নির্দেশ দেন। বিলাল ইকামত দেন। তিনি লোকদের আবার নামায পড়ান। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ।

৪. একদিন তিনি যুহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়ালেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো- যুহরের নামায কি এক রাকাত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, সেটা আবার কি? তখন তারা বললেন, আপনি আজ পাঁচ রাকাত পড়েছেন। একথা শুনে তিনি (সালাম ফিরাবার পর) দুটি সাজদা করেন। (বুখারি ও মুসলিম)

৫. একদিন তিনি আসর নামায তিন রাকাত পড়িয়ে ঘরে চলে গেলেন। তখন খিরবাক নামক যুল ইয়াদাইন (লম্বা হাতওয়ালা) একজন লোক তাঁর পিছে পিছে গিয়ে তাঁকে বিষয়টি খুলে বললো। তার কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে চাদর টানতে টানতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন এর কথা কি ঠিক? তারা বললেন জী-হ্যাঁ। তখন তিনি বাকি এক রাকাত পড়িয়ে সালাম ফিরালেন। তারপর দুটি (সাহু) সাজদা করলেন এবং পুনরায় সালাম ফিরালেন। (সহীহ মুসলিম)

নামাযে ভুল এবং ভুলের সাজদা সম্পর্কে রসূল সা. থেকে সর্বমোট এই পাঁচ প্রকার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

তিনি ভুলের সাজদা সালামের আগেও করেছেন, পরেও করেছেন। এ ব্যাপারে ইমামগণের মতামত নিম্নরূপ :

১. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে সব ধরণের ভুলের সাজদা সালামের পূর্বে করতে হবে।

২. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সব ধরণের ভুলের সাজদা সালামের পরে করতে হবে।

৩. ইমাম মালিক (র) বলেছেন, ভুলবশত নামাযে কোনো কিছু কম করার ক্ষেত্রে সাহু সাজদা সালাম ফিরাবার আগে করতে হবে। ভুলবশত নামাযে কোনো কিছু বেশি পড়লে ভুলের সাজদা সালাম ফিরানোর পরে করতে হবে। আর একই নামাযে যদি উভয় প্রকার ভুল হয়ে যায়, তবে সাহু সাজদা সালাম ফিরানোর আগে করতে হবে। আবু উমর বলেছেন, এটাই ইমাম মালিকের মযহাব। তবে কেউ যদি তাঁর মতের ব্যতিক্রম করতো, তবে তাতেও তিনি নিষেধ করতেননা। কারণ, তাঁর মতে এ বিষয়ে মতভেদ করার অবকাশ রয়েছে।

৪. এ বিষয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত কি? সে সম্পর্কে আছরম বলেন আমি শুনেছি ইমাম আহমদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-ভুলের সাজদা সালাম ফিরানোর আগে, নাকি পরে? জবাবে তিনি বলেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে সালামের পরে। রসূলুল্লাহ সা. এমনই করেছেন।

৫. ইমাম দাউদ (যাহেরি) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যে পাঁচটি ক্ষেত্রে সাহু সাজদা করেছেন, কেউ যেনো সে পাঁচটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কারণে সাহু সাজদা না করে।

সন্দেহের সাজদা

নামাযের ভিতরে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হলে রসূল সা. ফিরে নামায পড়েননি। তিনি বলেছেন, সন্দেহের ক্ষেত্রে বিশ্বাস যেদিকে প্রবল হবে, সে অনুসারে নামায শেষ করে সালাম ফিরানোর আগে সাজদা করে নেবে এবং সন্দেহ ত্যাগ করবে।

আবু সায়ীদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযের মধ্যে সংশয়ে পড়ে যায় এবং কয় রাকাত পড়েছে, তিন রাকাত না চার রাকাত, তা স্থির করতে না পারে, তখন সে যেনো সন্দেহ পরিত্যাগ করে এবং বিশ্বাস যেদিকে প্রবল হয়, সেটাকেই যেনো ভিত্তি বানায় (গ্রহণ করে)। অতপর সে সালাম ফিরাবার পূর্বে দুটি সাজদা করে নেবে। (সহীহ মুসলিম)

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে : তোমাদের কেউ যখন নামাযের মধ্যে সংশয়ে পড়ে যাবে, তখন সে যেনো, কোনো একটিকে সঠিক ধরে নিয়ে নামায পড়ে নেয় এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সাজদা করে নেয়। (বুখারি, মুসলিম)। একটি বর্ণনায় একথাও উল্লেখ আছে অতপর সে যেনো সালাম ফিরায় এবং তারপর দুটি সাজদা করে নেয়।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন : সন্দেহ দুই প্রকার। একটি হলো তাহাররী (প্রবর ধারণা), আর অপরটি হলো একীন (নিশ্চিত বিশ্বাসের মধ্যে কিছুটা সন্দেহ)। ইমাম আহমদের মতে তাহাররীর ক্ষেত্র মুসল্লি সালামের পরে সাজদা করবে, আর একীনের ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে সাজদা করবে।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালিক (র) বলেছেন কেউ যদি নামাযের মধ্যে সন্দেহে পড়ে, তবে সে যেনো সন্দেহে ডুবে না থাকে, বরং যেনো একটি ধারণার উপর একীন স্থাপন করে। ইমাম আহমদেরও একটি মত এটাই।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন : কেউ যদি নামাযের মধ্যে সংশয়ে পড়ে, আর এই সংশয় যদি প্রথমবারের মতো হয়, তবে সে যেনো দ্বিতীয়বার নামায পড়ে নেয়। কিন্তু সে যদি প্রায়ই সন্দেহে পড়ে, তবে সে যেনো 'প্রবল ধারণা' অথবা 'একীনের' ভিত্তিতে নামায অব্যাহত রাখে।

নামাযে চোখ বন্ধ করা

চোখ বন্ধ করে নামায পড়া রসূলুল্লাহ সা. এর রীতি ছিলনা। সহীহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, তাশাহ্হুদের দু'আ পড়ার সময় রসূলুল্লাহ সা. তাঁর হাতের শাহাদাত আংগুলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সে দৃষ্টি আংগুলের বাইরে যেতোনা।

- সহীহ্ বুখারিতে আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা রা.-এর একটি বিশেষ ধরনের পর্দা ছিলো। তিনি সেটিকে ঘরের এক দিকে টানিয়ে রেখেছিলেন। রসূল সা. আয়েশাকে সেটা সরিয়ে ফেলতে বলেন। আরো বলেন : পর্দাটিতে অংকিত ছবি নামায থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

- তিনি যদি নামাযে চোখ বন্ধ করে রাখতেন, তবে পর্দায় চিত্রিত ছবি কেমন করে তাঁর চোখে বাধতো?

- অবশ্য এ হাদিস দ্বারা নামাযে চোখ বন্ধ করা না জায়েয বলে প্রমাণিত হয় না।

ফকীহগণ নামাযে চোখ বন্ধ করার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ইমাম আহমদ প্রমুখ নামাযে চোখ বন্ধ করাকে মাকরূহ্ বলেছেন। তাঁদের মতে এটা ইহুদীদের কাজ।

কিন্তু অন্যরা নামাযে চোখ বন্ধ করাকে বৈধ মনে করেন। তাঁদের মতে চোখ বন্ধ করার মাধ্যমে নামাযে খুশূ-খুযূ অর্জন এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অনুভব করাটা সহজ হয়। আর এটাই হলো নামাযের প্রাণ এবং উদ্দেশ্য।

এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, নামাযে চোখ খোলা রেখে যদি খুশূ-খুযূ এবং মনোনংযোগ ঠিক রাখা যায়, তবে খোলা রাখাই উত্তম। আর যদি খোলা রাখলে বিভিন্ন দৃশ্যের কারণে মনস্থির ও খুশূ-খুযূ সৃষ্টি না হয়, তবে চোখ বন্ধ করাটা অবশ্যি দোষণীয় নয়। বরং শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী এ ধরনের অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখাটাই উত্তম ও পছন্দনীয়।

সুতরা (আড়াল)

রসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন কোনো কিছুর সামনে দাঁড়াতেন, অথবা সামনে কিছু দাঁড় করিয়ে দিতেন, কিংবা অন্তত সামনে একটা রেখা এঁকে দিতেন। তিনি নামাযের সামনে আড়াল সৃষ্টিকারী (সুতরা) কিছু রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি কখনো দেয়াল সামনে রেখে নামায পড়েছেন। তখন তাঁর সাজদা ও দেয়ালের মাঝখান দিয়ে একটি বকরী বা ভেড়া পার হবার জায়গায় থাকতো মাত্র। তাঁর ও সুতরার মাঝে এর চাইতে বেশি দূরত্ব থাকতোনা। বরং তিনি সুতরার নিকটবর্তী দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়েছেন।

কখনো তিনি খাট, কাঠ, গাছ, কিংবা মসজিদের খুঁটিকে সামনে রেখে নামায পড়েছেন।

যখন যুদ্ধের সফরে থাকতেন, কিংবা কোনো খোলা মাঠে নামায পড়তেন,

তখন সামনে হাতিয়ার গেড়ে সেটাকে সুতরা বানিয়ে নামায পড়তেন এবং লোকেরা তাঁর পেছনে নামায পড়তো।

কখনো বাহন সামনে রেখে নামায পড়েছেন, বাহনকেই সুতরা বানিয়েছেন। কখনো কখনো সোয়ারীর আসনকে সুতরা বানিয়েছেন।

তিনি মুসল্লিদের নির্দেশ দিয়েছেন,কোনো আড়াল পাওয়া না গেলে অন্তত তীর বা লাঠি সামনে পুতে নিয়ে সেটাকে সুতরা বানিয়ে যেনো তারা নামায পড়ে। তীর বা লাঠিও পাওয়া না গেলে অন্তত সামনে মাটিতে যেনো একটি রেখা এঁকে নেয়।[২২/২]

আবু দাউদ বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি, মাটিতে রেখা আঁকলে সেটা নতুন চাঁদের মতো আড়াআড়ি আঁকবে। আবদুল্লাহ বলেছেন, লম্বালম্বি আঁকবে। আর লাঠি গাড়লে সেটা খাড়া করে গাড়বে।

সুতরা না থাকলে কি নামায ভংগ হবে?

যদি নামাযীর সামনে সুতরা না থাকে, তবে এমতাবস্থায় নামাযের সামনে দিয়ে বালেগা নারী, গাধা ও কালো কুকুর অতিক্রম করলে নামায ভংগ হবে বলে সহীহ সূত্রে জানা যায়। এ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু যর, আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

অবশ্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা উপরোক্ত মতের সাথে সাংঘর্ষিক। তিনি বলেছেন, তিনি রসূল সা.-এর সাজদার জায়গায় আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকতেন। রসূল সা. সাজদা করার সময় তার পায়ে চিমটি কাটতেন, তখন

২২/২. বুখারি, মুসলিম ও সহীহ ইবনে খুযাইমা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, কেউ সামনে সুতরা (আড়াল) রেখে নামায পড়া সত্ত্বেও যদি কোনো লোক তার নামাযের সামনে দিয়ে অর্থাৎ আড়ালের ভিতর দিক দিয়ে অতিক্রম করতে উদ্যত হয়, তবে নামাযী যেনো বুক দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করে।' কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে : তাকে যেনো সাধ্যমতো প্রতিহত করে।' অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে : তাকে যেনো (ইশারায়) দুইবার নিষেধ করে। এতেও যদি সে না মানে, তবে তার সাথে লড়তে হবে, কারণ সে শয়তান।

বুখারি, মুসলিম ও সহীহ ইবনে খুযাইমা গ্রন্থে আরো উল্লেখ হয়েছে : নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানতো, এর পরিণতি কতো ভয়াবহ, তবে সে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করাকেও উত্তম মনে করতো।

এখানে 'চল্লিশ পর্যন্ত' মানে-চল্লিশ দিন, বা চল্লিশ বছর অথবা চল্লিশ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

তিনি পা গুটিয়ে নিতেন। তিনি সাজদা থেকে উঠে দাঁড়ালে আয়েশা রা. আবার পা ছড়িয়ে দিতেন।

এই উভয় ধরনের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য হলো, অতিক্রম করা আর অবস্থান করার। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

সালাম ফিরিয়ে রসূল সা. কী করতেন? কী পড়তেন?

(ফরয) নামাযের সালাম ফিরানোর পর রসূলুল্লাহ্ সা. কী করতেন, কীভাবে বসতেন? কী পাঠ করতেন এবং কী কী যিকর-আযকার করতেন-এ পর্যায়ে সেসব কথাই আলোচনা করা হবে।

সহীহ্ মুসলিমে আয়েশা ও সাওবান রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. যখন সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন, তখন তিনবার أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) বলতেন।[২৩] তারপর বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থ হে আল্লাহ্! শান্তির উৎস তুমি, তোমার থেকেই আসে শান্তি। হে প্রতাপশালী মহা মর্যাদার অধিকারী! তুমি বড়ই বরকতময়-প্রাচুর্যশালী।"

সালাম ফিরানোর পর এই কথাগুলো বলতে যতোটুকু সময় ব্যয় হতো, কেবল ততোটুকু সময়ই তিনি কিবলামুখী থাকতেন। এ ব্যক্যটি পাঠ করার পর তিনি উঠে যেতেন, অথবা মুক্তাদিদের দিকে ফিরে বসতেন। কখনো ডানদিক থেকে, কখনো বামদিক থেকে মুক্তাদিদের দিকে ঘুরে বসতেন। বুখারি ও মুসলিম ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ্ সা. অধিকাংশ সময়ই বামদিক থেকে ঘুরে বসতেন।"

সহীহ্ মুসলিমে আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ্ সা. অধিকাংশ সময়ই ডানদিকে ঘুরে বসতেন।

---

২৩. সহীহ্ বুখারি ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : আমরা রসূলুল্লাহ্ সা. এর নামাযের সমাপ্তি বুঝতে পারতাম তাঁর তাকবীর উচ্চারণ করা থেকে।

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সা. সালাম ফিরানোর পর উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন।

সুতরাং হাদিস অনুযায়ী প্রথমে একবার 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করে তারপর তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়া সঠিক বলে মনে হয়। এ পরই 'আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস্ সালাম ....পড়া উচিত।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ সা. ডানদিক থেকেও এবং বামদিক থেকেও ঘুরে বসেছেন। তিনি সোজাসুজি মুক্তাদিদের দিকে ফিরে বসতেন। একদিক বাদ দিয়ে বিশেষ করে আরেকদিকে ঘুরে বসতেন না। সোজাসুজি বসে সকলের দিকে দৃষ্টি দিতেন। ফজর নামায পড়ার পর সূর্য উঠা পর্যন্ত তিনি নামাযের স্থানে বসে থাকতেন।

নামায শেষে যেসব যিকর ও দু'আ পাঠ করতেন

সহীহ বুখারি ও মুসলিমে মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই কথাগুলো বলতেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ - (متفق عليه)

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (হুকুমকর্তা) নাই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক (অংশীদার) নেই। মহাবিশ্বের কর্তৃত্ব কেবল তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। সর্বশক্তিমান তিনি। হে আল্লাহ! তুমি কিছু দিতে চাইলে তা রোধ করার সাধ্য কারো নাই। আর তুমি কিছু না দিতে চাইলে তা দেবার সাধ্য কারো নাই। কোনো সম্পদশালীর সম্পদ, কোনো মর্যাদাবানের মর্যাদা তোমার মোকাবেলায় সম্পূর্ণ নিষ্ফল, একেবারেই অকার্যকর।"

আবু হাতিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নবী করীম সা. নামায শেষ করার পর বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىْ الَّذِىْ جَعَلْتَهُ عِصْمَةَ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ - لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ○

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার দীনকে পরিশুদ্ধ করে দাও, যা আমার সমস্ত কাজের রক্ষক। তুমি আমার দুনিয়াকে ঠিক করে দাও, যেখানে দিয়েছো আমার জীবিকা। হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তোষ দ্বারা তোমার অসন্তোষ থেকে পানাহ চাই। তোমার ক্ষমা দ্বারা তোমার প্রতিশোধ থেকে পানাহ

চাই। আর আমি তোমার (শাস্তি) থেকে তোমার কাছে পানাহ্ চাই। তুমি দিতে চাইলে ফিরাবার সাধ্য কারো নাই, আর না দিতে চাইলে দিবার সাধ্যও কারো নাই। তোমার সম্মুখে কোনো সম্পদশালীর সম্পদ আর কোনো মর্যাদাবানের মর্যাদাই কাজে আসেনা।" (সহীহ্ আবু হাতিম)

হাকিম তাঁর মুসতাদরকে আবু আইউব আনসারী রা. থেকে হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি যখনই তোমাদের প্রিয় নবীর পেছনে নামায পড়েছি, তখন অবশ্যি নামায শেষে তাঁকে একথাগুলো বলতে শুনেছি :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطَائِىْ وَذُنُوْبِىْ كُلَّهَا - اَللّٰهُمَّ ابْعَثْنِىْ وَاحْيِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ اِنَّهُ لَايَهْدِىْ لِصَالِحِهَا وَلَايَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ ٥

অর্থ ওগো আল্লাহ্! আমার সব ভুলক্রটি এবং গুনাহ্ খাতা মাফ করে দাও। হে আল্লাহ্! আমাকে উত্থিত করো, আমাকে জীবন দাও, জীবিকা দাও আর জীবন যাপনের তৌফিক দাও শুদ্ধ আমল ও চরিত্রের ভিত্তিতে। কারণ তুমি তৌফিক না দিলে কেউ সেভাবে জীবন যাপন করতে পারেনা। তুমি ছাড়া কেউ মানুষকে মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে রাখতে পারেনা।"

সহীহ মুসলিমে ইবনে যুবায়ের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন, তখন উঁচুস্বরে এই কথাগুলো উচ্চারণ করতেন :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَانَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ - لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ - لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ -

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। মহাবিশ্বের গোটা রাজত্ব তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। সর্বশক্তিমান তিনি। আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই, তিনি ছাড়া কোনো ভরসাস্থলও নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমকর্তা নেই। আমরা কেবল তাঁর ছাড়া আর কারো গোলামি করি না। সমস্ত নি'আমত তাঁর, দানও তাঁরই। তাই সমস্ত উত্তম প্রশংসাও তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁরই আনুগত্য করি- যদিও কাফিররা তা পছন্দ করেনা।"

নামায শেষে ক্ষমা ও আশ্রয় চাওয়া

আবু দাউদে আলী রা. থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন সালাম ফিরাতেন, তখন বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ - اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ○

অর্থ আয় আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দাও! মাফ করে দাও আমার আগে-পরের এবং গোপন ও প্রকাশ্য সব গুনাহ। মাফ করে দাও আমার সব সীমালংঘন। মাফ করে দাও আমার সেইসব গুনাহ্ যা সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে ভালো জানো। এগিয়ে দাও, তুমিই পিছিয়ে দাও। তুমি ছাড়া কোনো ত্রাণকর্তা নেই।"

এ দু'আটি সম্পর্কে ইমাম মুসলিম দুটি মত ব্যক্ত করেছেন।

১. রসূলুল্লাহ্ সা. এটি তাশাহ্হুদ ও সালামের মাঝখানে পড়তেন। মূলত এ মতটিই সঠিক।

২. তাঁর দ্বিতীয় মত হলো রসূল সা. এটি সালামের পরে পড়তেন।

- সম্ভবত রসূলুল্লাহ সা. সালামের আগে এবং পরে উভয় ক্ষেত্রেই এই দু'আটি পড়তেন। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. তাঁর সন্তানদের এই কথাগুলো শিখাতেন এবং বলতেন, রসূলুল্লাহ সা. নামাযের পরে এভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ○

অর্থ : আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ভীরুতা ও কাপুরুষতা থেকে পানাহ চাই। কৃপণ হওয়া থেকে পানাহ্ চাই। আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই বৃদ্ধ বয়সের অক্ষমতা থেকে। তোমার কাছে পানাহ চাই দুনিয়ার ফিতনা[২৪] আর কবরের আযাব থেকে।" (সহীহ্ বুখারি)

নামায শেষে সাক্ষ্য (শাহাদাত) প্রদান

মুসনাদে আহমদে যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক নামাযের পরে, একথাগুলো বলতেন :

২৪. 'ফিতনা' মানে- কঠিন বিপদে ফেলে ঈমানের পরীক্ষা নেয়া।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكِهٖ - اَنَا شَهِيْدٌ اِنَّكَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ - اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اِجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِيْ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ ○ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ- (ابو داؤد)

অর্থ হে আল্লাহ্! আমাদের প্রভু এবং প্রতিটি জিনিসের প্রভু ও মালিক! আমি সাক্ষী, তুমিই একমাত্র প্রভু, তুমি একক, তোমার কোনো শরীক নাই। আয় আল্লাহ্, আমাদের ও প্রতিটি জিনিসের প্রভু! আমি সাক্ষী আছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ তোমার দাস ও রসূল। ওগো আল্লাহ্, আমাদের এবং প্রত্যেকটি জিনিসের প্রভু! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি বান্দাহরা সবাই ভাই ভাই। হে আল্লাহ্, আমাদের প্রভু এবং প্রতিটি জিনিসের প্রভু! দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে ও আমার পরিবারকে তোমার জন্যে একমুখী ও একনিষ্ঠ বানিয়ে দাও। হে মহামর্যাদাবান মহাসম্মানিত! তুমি আমার আবেদন শুনো এবং কবুল করো। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ই মহাবিশ্ব (Universe) আর এই পৃথিবীর আলো। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম তিনি। আমার জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। সর্বোত্তম ভরসাস্থল তিনি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।"

- হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু দাউদ।

নামায শেষে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর বলা

রসূলুল্লাহ সা. তাঁর উম্মতের জন্যে এ রীতিটা পছন্দ করে গেছেন যে, নামায শেষ করার পর তারা-

سُبْحَانَ اللّٰهِ তেত্রিশবার পড়বে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তেত্রিশবার পড়বে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ তেত্রিশবার পড়বে এবং তারপর

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ একবার পড়ে মোট একশত বার পূর্ণ করবে।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের শেষে তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার 'আলহামদুলিল্লাহ', তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার' সর্বমোট নিরানব্বই বার এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছে, অতপর 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু..... আলা কুল্লে শাইয়ীন কাদীর' উচ্চারণ করে একশত পূর্ণ করেছে, তার গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে, এমনকি তা যদি সমুদ্রের বুদ্বুদের মতো ব্যাপকও হয়ে থাকে।

অবশ্য সহীহ্ মুসলিমে কা'আব ইবনে উজরা রা. থেকে এ সম্পর্কে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ঐ ব্যক্তি কখনো নিরাশ হবে না যে প্রত্যেক নামায শেষে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। (সহীহ মুসলিম)

নামাযের পরে পড়ার জন্যে সাহাবাগণকে যা শিখিয়েছেন

আবু যর, আবু আইউব আনসারী এবং আবদুর রহমান বিন গনম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সা. বলেছেন যে ব্যক্তি ফজর এবং মাগরিবের সালাম ফিরাবার সাথে সাথে নিম্নোক্ত কথাগুলো দশবার উচ্চারণ করবে, সেজন্যে তার দশটি নেকি প্রাপ্য হবে, দশটি গুনাহ্ মুছে দেয়া হবে এবং তার মর্যাদার দশটি ধাপ বৃদ্ধি করা হবে। তাছাড়া এই কথাগুলো তার জন্যে চারটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়ার সমতুল্য হবে এবং এই কথাগুলো তার জন্যে শয়তান থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। এগুলো পড়তে থাকলে শিরক ছাড়া অন্যান্য পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারবেনা। আর এই কথাগুলো তার আমলকে সুন্দর করবে। কথাগুলো হলো :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ (صحيح ابن حبان، مسند احمد، ترمذى)

অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো অংশীদার নাই। সমস্ত সাম্রাজ্য ও কর্তৃত্ব শুধু তাঁর। সকল প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সর্বব্যাপী ক্ষমতাবান।" (ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি)

রসূলুল্লাহ সা. এই বাক্যগুলো সম্পর্কে একথাও বলেছেন কোনো ব্যক্তি যদি ফজরের সময় এ বাক্যগুলো উচ্চারণ করে, তবে মাগরিব পর্যন্ত সে

শয়তানের খপ্পর থেকে রক্ষা পাবে। আর সে যদি মাগরিবেও একথাগুলো পাঠ করে, তবে ফজর পর্যন্ত সে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাবে।

- ইমাম তিরমিযি বলেছেন, এই হাদিসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ সংকলনে হারিস ইবনে মুসলিম তাইমীর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সা. আমাকে বলেছেন তুমি যখন ফজর নামায শেষ করবে, তখন অন্য কোনো কথা বলার আগে এই কথাটি সাতবার বলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চেয়ো। মাগরিবের (ফরয) নামাযের পরেও এই কথাগুলো সাতবার বলবে। ফলে, তুমি যদি ঐদিন বা ঐ রাত্রে মারা যাও, তবে আল্লাহ্ তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেবেন। সাতবার মুক্তি চাওয়ার সেই বাক্যটির হলো :

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ -

অর্থ : ওগো আল্লাহ্! আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।"

ইমাম নাসায়ী তাঁর 'আল কবীর' গ্রন্থে আবি উমর রা. থেকে এবং ইমাম বায়হাকি তাঁর 'শুয়াবুল ঈমানে' আলী রা. থেকে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে[২৫], মৃত্যু ছাড়া তার জান্নাতে প্রবেশের পথে আর কোনো বাধা থাকবেনা।

হাদিসটি এছাড়াও আরো বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদিসটি সহীহ ও জয়ীফ হবার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসটি সূত্রের দিক থেকে দুর্বল এবং গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সূত্রের (সনদের) দিক থেকে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও যেহেতু হাদিসটি অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাই এর মধ্যে সত্যতার নির্যাস থাকতে পারে।

মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকি, আবু হাতিম, ইবনে হিব্বান, হাকিম প্রভৃতি গ্রন্থে উকবা ইবনে আমির রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাকে প্রত্যেক নামাযের পরে সূরা ফালাক ও সূরা নাস (কুরআনের শেষ দুইটি সূরা) পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

---

২৫ আয়াতুল কুরসি আল্লাহ্ পাকের অসীম ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত কুরআনের একটি বিখ্যাত আয়াত। এটি সূরা 'আল বাকারার' ২৫৫ নম্বর আয়াত। প্রত্যেক মুমিনেরই আয়াতটি মুখস্ত করা এবং এর অর্থ জানা উচিত।

তাবারানি তাঁর মু'জামে এবং আবু ইয়ালী তাঁর মুসনাদে উমর ইবনে নাবহানের সূত্রে জাবির রা. থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন যে : এমন তিনটি কাজ আছে, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সে কাজগুলো করবে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে, আর জুড়ি হিসেবে লাভ করতে পারবে আয়ত নয়ন হুরদের। সে তিনটি কাজ হলো :

১. নিজের হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দেয়া,
২. গোপন ঋণ পরিশোধ করে দেয়া এবং
৩. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ........ সূরা (সূরা ইখলাস) পাঠ করা।

- আবু বকর রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তিনটির একটি কাজ করলেও কি তা পাওয়া যাবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, একটি কাজ করলেও।

রসূলুল্লাহ সা. মুয়ায রা.-কে প্রত্যেক নামাযের পিছে আল্লাহ্‌র কাছে এভাবে সাহায্য চাইতে অসীয়ত করে গেছেন :

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ○

অর্থ আয় আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করো সবসময় তোমাকে স্মরণ করতে, তোমার শোকর আদায় করতে আর সর্বোত্তম ও সর্বসুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করতে।"

এখানে 'নামাযের পিছে' বলতে সালাম ফিরাবার আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে। আমাদের উস্তাদ (ইমাম ইবনে তাইমিয়া) বলেছেন, নামাযের পিছে মানে- শেষ প্রান্তে। অর্থাৎ সালামের পূর্বে।

●●●

জামাতে নামায পড়া[২৬]

জামাতে নামাযের প্রতি রসূলুল্লাহ্ সা. -এর অত্যাধিক তাকিদ

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার জীবন! আমার ইচ্ছে হয়, কাঠ-খড়ি জমা করার নির্দেশ দিতে। অতপর যখন সেগুলো কুড়িয়ে একত্র করা হবে, তখন নামাযের আযান দেবার নির্দেশ দিতে। অতপর কোনো একজনকে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখতে-কে কে নামায পড়তে আসেনি।" -অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে : আমার ইচ্ছে হয়, যারা আযান শুনেও মসজিদে হাযির হয়না, তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে।" (বুখারি ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যদি লোকদের ঘরে নারী ও শিশু না থাকতো, তাহলে আমি যুবকদের আদেশ দিতাম, সেইসব ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে, যেসব ঘরের লোকেরা ইশার জামাতে হাযির হয়নি। (মুসনাদে আহমদ)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার এক অন্ধ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সা.-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এমন কেউ নেই, যে আমাকে হাত ধরে মসজিদে আনবে।' অতপর লোকটি মসজিদে উপস্থিত হওয়া থেকে অব্যাহিত চায় এবং ঘরে নামায পড়ার অনুমতি চায়। তিনি তাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিয়ে দেন। অনুমতি পেয়ে লোকটি ফিরে রওয়ানা করে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে পুনরায় ডেকে পাঠান। সে ফিরে আসে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বললো জী-হ্যাঁ, শুনতে পাই।' তিনি বললেন : তবে তুমি মসজিদে উপস্থিত হবে।" (সহীহ্ মুসলিম)

আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন :

২৬. এ অধ্যায়টি মূল গ্রন্থে ছিলনা। এটি আমরা সংযোজন করেছি। তবে কোনো মন্তব্য না করে সরাসরি সহীহ্ হাদিস গ্রন্থাবলী থেকে জামাতে নামায পড়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর বাণী ও কর্মনীতি আমরা এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি।

কোনো জনবসতি কিংবা কোনো জনবিরল এলাকায় যদি তিনজন ব্যক্তিও বাস করে, আর তারা যদি নামাযের জামাত কায়েম না করে, তবে অবশ্যি শয়তান তাদের উপর চড়াও হবে। সুতরাং অবশ্যি তুমি জামাত কায়েম করবে। কারণ দলছাড়া ভেড়া-বকরীকে তো অবশ্যি নেকড়ে তার গ্রাস বানাবে। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)

আবু মূসা আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন দুই বা দুইয়ের অধিক লোক হলেই একটি জামাত করতে হবে।" (ইবনে মাজাহ)

উম্মুদ দারদা রা. বলেন, একদিন আবুদ দারদা অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ জিনিস আপনাকে রাগান্বিত করেছে? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, আমি উম্মতে মুহাম্মদীর পরিচয় এছাড়া আর কিছুই জানিনা যে, তারা সবাই মিলে জামাতে নামায পড়ে।" (সহীহ্ বুখারি)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনলো, অথচ জামাতে হাযির হলোনা, তার নামায নাই। তবে কোনো ওযর থাকলে ভিন্ন কথা।" (দারু কুতনি, আবু দাউদ)

জামাতে নামাযের ফযীলত (মর্যাদা)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জামাতে নামায পড়ার মর্যাদা একা পড়ার চাইতে সাতাশ গুণ উর্ধ্বে।" (বুখারি মুসলিম)

উব্বাই ইবনে কা'আব রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : নামাযের প্রথম সারি হলো ফেরেশতাদের সারির মতো। তোমরা যদি প্রথম সারির মর্যাদা সম্পর্কে জানতে, তবে তা পাওয়ার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে। মনে রেখো, একা নামায পড়ার চাইতে দুই ব্যক্তির একত্রে নামায পড়া উত্তম। আর দুই ব্যক্তির একত্রে নামায পড়ার চাইতে তিন ব্যক্তির একত্রে নামায পড়া উত্তম। এভাবে যতো বেশি লোকের জামাত হবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে ততো বেশি প্রিয় হবে।" (আবু দাউদ, নাসায়ী)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (জামাতে নামায পড়ার জন্যে) কোনো একটি মসজিদের দিকে পা বাড়াবে, তার প্রতিটি কদমে আল্লাহ্ পাক তার জন্যে একটি করে পুণ্য লিখে দেবেন, তার একটি করে মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এবং একটি করে পাপ মুছে দেবেন।" (সহীহ্ মুসলিম)

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম, জামাতে নামায পড়ার মধ্যে রয়েছে বিরাট মর্যাদা। অর্থাৎ

১. সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদা।
২. মসজিদে যাবার পথে প্রতি কদমে একটি পুণ্য।
৩. প্রতি কদমে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি।
৪. প্রতি কদমে একটি করে পাপ মোচন।
৫. প্রথম সারিতে দাঁড়ালে ফেরেশতাতুল্য মর্যাদা লাভ।
৬. জামাতে যতো বেশি লোককে শামিল করা যাবে ততো বেশি আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভ।

জামাতে হাযির না হওয়া মুনাফিকীর লক্ষণ

উব্বাই ইবেন কা'আব রা. থেকে বর্ণিত, বলেন : রসূলুল্লাহ সা. পর পর দুইদিন ফজর নামাযের সালাম ফিরিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করেন : অমুক ব্যক্তি কি নামাযে হাযির হয়েছে? সবাই বললো : 'জী-না।' তিনি আবার বললেন : অমুক উপস্থিত হয়েছে কি?' লোকেরা বললো : জী-না।' তিনি বললেন : এই দুইটি (ফজর ও ইশা) নামায মুনাফিকদের জন্যে অন্যান্য নামাযের তুলনায় অধিকতর ভারী। তোমরা যদি জানতে এই দুইটি নামাযের মধ্যে কী পরিমাণ (সওয়াব) নিহিত আছে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাযে উপস্থিত হতে।" (আবু দাউদ, নাসায়ী)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন আল্লাহ্‌র শপথ, আমি সাহাবিগণকে দেখেছি। (তাঁরা কখনো নামাযের জামাত ত্যাগ করতেন না) জামাত ত্যাগ করে তো কেবল সুস্পষ্ট মুনাফিক। নিশ্চয়ই সাহাবিগণের মধ্যে এমন লোকও দেখা গেছে, যাকে দু'পাশ থেকে দুজনে ভর দিয়ে ধরে মসজিদে এনেছে এবং সফের মধ্যে দাঁড় করিয়েছে। (সহীহ মুসলিম)

উসমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মসজিদে আযান হবার পর যে ব্যক্তি বিশেষ জরুরি কাজ ছাড়া বেরিয়ে যায় এবং মসজিদে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা রাখেনা, সে মুনাফিক। (মিশকাত)

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আমি দেখেছি সাহাবায়ে কিরামের সমাজকে। সে সমাজে মুনাফিক এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই জামাতে উপস্থিত না হয়ে থাকতোনা। (সহীহ মুসলিম)

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ভীরু লোক ছাড়া অন্যদের জন্যে নামায ভারী বোঝার মতো। অন্যান্য হাদিসে বলা হয়েছে, মুনাফিকরা

লোক দেখানোর জন্যে নামায পড়ে। কেউ না দেখলে নামায পড়েনা। কেউ দেখলে বাধ্য হয়ে পড়ে।

জামাত আরম্ভ হলে সুন্নত নেই

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন জামাতের জন্যে ইকামত বলা হবে (অর্থাৎ যখন ফরয নামাযের জামাত আরম্ভ হবে), তখন ঐ (ফরয) নামাযটি ছাড়া আর কোনো নামায নেই'- কথাটির অর্থ হলো, ফরয নামাযের জামাত দাঁড়িয়ে গেলে আর অন্য কোনো নামায পড়া যাবেনা।

- এই হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন : ফরয নামাযের জামাত দাঁড়িয়ে গেলে সুন্নত নামায ত্যাগ করতে হবে এবং জামাতে শামিল হয়ে যেতে হবে।

ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন : ফজরের জামাত এক রাকাত পাবার সম্ভাবনা থাকলেও সুন্নত পড়ে নেয়া যাবে। তবে সফের নিকট থেকে দূরে দাঁড়াতে হবে। তাঁর মতে সফের মধ্যে বা নিকটে দাঁড়ানো মকরূহ।

হাদিসের বিশেষজ্ঞদের মতে, এই হাদিস অনুযায়ী জামাতে দাঁড়িয়ে যাবার পর সুন্নত নামায পড়ার কোনো অবকাশ দেখা যায়না। কারণ-

- এমনটি করার অনুমতি রসূলুল্লাহ সা. দেননি।

- সাহাবায়ে কিরাম থেকেও এমনটি করা নযীর নেই।

- ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব অন্যান্য সুন্নত নামাযের তুলনায় বেশি হলেও সেটা সুন্নতই, ফরয নয়।

- মুয়াযিযনের ইকামত দেয়ার অর্থই হলো, ইমামের পক্ষ থেকে জামাতে শরীক হবার আহ্বান। আর (ফরয নামাযের জন্যে) ইমামের আহ্বানে সাড়া দেয়া তো ওয়াজিব।

সুতরাং এ হাদিসটির স্পষ্ট অর্থ এবং যুক্তি অনুযায়ী জামাত শুরু হয়ে গেলে সুন্নত পড়ার অবকাশ থাকেনা।

মসজিদের জামাতে মহিলাদের হাযির হওয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কারো স্ত্রী যদি (জামাতে নামায পড়ার জন্যে) মসজিদে আসতে চায়, তবে সে যেনো তাকে বাধা না দেয়। (বুখারি, মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের স্ত্রীদের মসজিদে আসতে বাধা দিওনা। তবে তাদের জন্যে তাদের ঘরে নামায পড়াই উত্তম।" (আবু দাউদ)

- অপর বর্ণনায় এসেছে তোমরা আল্লাহ্র দাসীদের মসজিদে আসতে বাধা দিওনা।"

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. কলেছেন মহিলাদের জন্যে বৈঠকখানায় নামায পড়ার চাইতে ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া উত্তম এবং অভ্যন্তরীণ ঘরে নামায পড়ার চাইতে তার প্রকোষ্ঠে নামায পড়া উত্তম।" (আবু দাউদ)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী যয়নব রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাদের বলেছেন : তোমাদের (মহিলাদের) কেউ যখন মসজিদে আসে, তখন সে যেনো সুগন্ধি লাগিয়ে না আসে। (সহীহ মুসলিম)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন কোনো মহিলা যেনো সুগন্ধি ব্যবহার করে আমাদের সাথে ইশার নামাযে হাযির না হয়। (সহীহ মুসলিম)

বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন তোমাদের মহিলারা মসজিদে নামায পড়তে আসতে চাইলে তাদের নিষেধ করোনা।" - একথা শুনে বিলাল বললো : আমরা অবশ্যি তাদের মসজিদে যেতে বাধা দেবো।" এতে হযরত আবদুল্লাহ রাগান্বিত হয়ে ছেলেকে বলেন : আমি তোকে আল্লাহ্র রসূলের বাণী শুনাচ্ছি, আর তুই তার বিরোধিতা করছিস? আবদুল্লাহ ইবনে উমরের অপর পুত্র সালেম বলেন : আব্বা মৃত্যু পর্যন্ত আর বিলালের সাথে কথা বলেননি।" (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

তাহাজ্জুদের চাইতে ফজরের জামাতের গুরুত্ব বেশি

আবু বকর ইবনে সুলাইমান ইবনে আবি হাছমা থেকে বর্ণিত একদিন খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ফজরের জামাতে (আমার পিতা) সুলাইমান ইবনে আবি হাছমাকে দেখতে পেলেন না। সেদিন সকালে উমর বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। বাজারের পথেই ছিলো আমার পিতা সুলাইমানের বাসস্থান। খলিফা আমাদের বাড়িতে এসে আমার দাদী শিফা (বিনতে আবদুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করেন কী ব্যাপার, আজ ফজরের নামাযে (তোমার ছেলে) সুলাইমানকে দেখতে পেলাম না কেন? আমার

দাদী বললেন ও রাত জেগে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়েছে। ফলে তার চোখে ঘুম চেপে বসেছে (এবং ঘরে নামায পড়ে) শুয়ে পড়েছে।

একথা শুনে উমর রা. বললেন : আমার কাছে সারারাত জেগে নফল নামায পড়ার চাইতে ফজরের জামাতে হাযির হওয়া অধিক পছন্দনীয়।" (মু'আত্তা ইমাম মালিক)

উমর রা. তাঁর এই বক্তব্য তাহাজ্জুদ বা রাত্রের নফল নামায পড়তে নিরুৎসাহিত করেননি, বরং তিনি এখানে জামাতে নামায এবং নফল নামাযের মধ্যে গুরুত্বের পর্যায় তুলে ধরেছেন। এই হাদিস থেকে জানা গেলো :

১. সুন্নত নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদ বা রাত্রের নামাযের মর্যাদা অনেক বেশি হলেও, ফরয নামায জামাতে পড়ার চাইতে এর মর্যাদা বেশি নয়।

২. ফজরের জামাত মিস হবার আশংকা থাকলে রাত জেগে ইবাদত বন্দেগি বা অন্য কোনো দীনি কাজও করা ঠিক নয়।

৩. এমনকি ফজরের জামাত মিস হবার আশংকা থাকলে রাত জেগে তাহাজ্জুদ নামায পড়াও ঠিক নয়। তবে ফজরের জামাতে হাযির হবার ব্যাপারে আশংকা না থাকলে তাহাজ্জুদ পড়া উত্তম।

জামাতে উপস্থিতির ক্ষেত্রে বিলম্ব ও ব্যতিক্রমের অবকাশ

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি : খাবার উপস্থিত করা হলে এবং পায়খানা-প্রশ্রাবের বেগ সৃষ্টি হলে- এগুলো সেরে নেয়ার আগ পর্যন্ত নামাযে যাবেনা। (সহীহ মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি যখন নামাযের ইকামত বলা হয়, তখন যদি তোমাদের কেউ পায়খানা-প্রশ্রাবের বেগ অনুভব করে, তাহলে সে যেনো আগে পায়খানা-প্রশ্রাব সেরে নেয়।" (তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী, মু'আত্তায়ে মালিক)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন যদি তোমাদের কারো রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, আর তখন নামাযের ইকামত দেয়া হয়, তবে তাড়াহুড়া না করে প্রথমে প্রশান্তির সাথে খেয়ে নেবে (তারপর নামাযে যাবে)। (বুখারি, মুসলিম)

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন তোমরা খাওয়া বা অন্য কোনো কিছুর জন্যে নামায (অর্থাৎ-নামাযের জামাত) পিছিয়ে দিওনা। (শরহে সুন্নাহ)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন প্রবল শীত ও বৃষ্টির রাত্রে তোমাদের কেউ যদি আযান দেয়, তখন সে যেনো একথাও বলে দেয় আপনারা নিজ নিজ আবাসে নামায পড়ুন।" (বুখারি, মুসলিম)

এই হাদিসগুলো থেকে জানা গেলো :

১. খাবার সামনে এল নামাযের ইকামত দিলেও খেয়ে নামাযে যাওয়া উচিত।

২. পায়খানা-প্রশ্রাব চাপলে নামায শুরু হলেও এগুলো আগে সেরে নিতে হবে।

৩. জামাতের সময় নির্ধারিত থাকলে খাওয়া বা অন্য কারণে জামাত পিছানো ঠিক নয়।

৪. প্রচণ্ড, শীত-বৃষ্টি ও ঝড় তুফানের রাত্রে ঘরে নামায পড়ার অবকাশ আছে।

৫. অন্য হাদিস থেকে জানা যায়, রোগ ও শত্রুর ভয় থাকলে ঘরে নামায পড়ার অবকাশ আছে। (আবু দাউদ, ইবনে আব্বাস রা.)

সফ সোজা করা

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ

অর্থ : তোমরা নামাযের সফ (সারি) সোজা করো। কারণ, সফ সোজা করাটাও নামায কায়েমের অন্তর্ভুক্ত। (বুখারি)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ○

অর্থ তোমরা নামাযের সফ (সারি) সোজা করো। কারণ সফ সোজা করাটাও নামায পূর্ণ করার একটি কাজ। (মুসলিম)

নুমান ইবনে বশীর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. তীর সোজা করার

মতোই আমাদের (নামাযের) সফ সোজা করে দিতেন। আমাদের সফ সোজা হলে তিনি তকবীর (তাহরীমা) বলতেন। (মুসলিম, আবুদ দাউদ)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, একদিন নামাযের ইকামত হলে রসূলুল্লাহ্ সা. আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন : তোমাদের সফ সোজা করো এবং পরস্পরের সাথে মিলে দাঁড়াও। (বুখারি)

জাবির বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন তোমরা ফেরেশতাদের মতো সফ বেঁধে দাঁড়াও যেভাবে তারা তাদের প্রভুর কাছে সফ বেঁধে দাঁড়ায়। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ্! ফেরেশতারা কিভাবে তাদের প্রভুর সামনে সফ বেঁধে দাঁড়ায়? তিনি বললেন তারা প্রথমে প্রথম সারিগুলো পূর্ণ করে এবং পরস্পর মিলিত হয়ে দাঁড়ায়। (সহীহ্ মুসলিম)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : পুরুষদের সফ সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম সফ, আর নারীদের সফ সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সর্বশেষ সফ। (সহীহ্ মুসলিম)

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুঝ-সমুঝের অধিকারী, তারা যেনো আমার (ইমামের) নিকটে দাঁড়ায়। অতপর তারা, যারা তাদের নিকটবর্তী। অতপর তারা, যারা তাদের নিকটবর্তী। সাবধান মসজিদে বাজারের ন্যায় হৈ চৈ করা থেকে বিরত থাকো। (মুসলিম)

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলতেন : আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ ঐ লোকদের প্রতি সালাত করেন (অর্থাৎ রহমত বর্ষণ ও দু'আ করেন), যারা প্রথম দিকের সফগুলোতে এগিয়ে আসে। আল্লাহ্র কাছে সেই পা বাড়ানোর চাইতে আর কোনো পা বাড়ানোই এতো অধিক প্রিয় নয়, যে পা সফ মিলানো ও পূর্ণ করার জন্যে বাড়ে। (আবু দাউদ)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা সফ সোজা করবে, বাহু বরাবর করবে, ফাঁক পূর্ণ করবে, পরস্পরের বাহু নরম রাখবে এবং মাঝখানে শয়তানের জন্যে জায়গা রাখবেনা। যে ব্যক্তি সফ মিলিয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তাকে মিলিয়ে দেন। আর যে সফ বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ্ তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রথমে পয়লা সফ পূর্ণ

করো, তারপর দ্বিতীয় সফ। এভাবে পূর্ণ করে যাও। যদি কোনো অপূর্ণতা থাকে, তবে তা যেনো সর্বশেষ সফে থাকে। আবু দাউদ)

ইমাম ও মুক্তাদি কোথায় দাঁড়াবে?

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, একবার রসূলুল্লাহ সা. (নফল) নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমি এসে তাঁকে নামায পড়তে দেখে আমিও তাঁর সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তখন তিনি (নামায রত অবস্থায়ই) আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। এরপর জব্বার ইবনে সখর এসে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালেন। এসময় রসূলুল্লাহ সা. আমাদের দুজনেরই হাত ধরে ঠেলে তাঁর পেছনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। (সহীহ মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : আমি এক রাত্রে আমার খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনার ঘরে রাত্রি যাপন করি। রাতের এক পর্যায়ে দেখলাম, রসুলুল্লাহ সা. (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তখন আমিও উঠে এলাম এবং তাঁর সাথে নামায পড়ার জন্যে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। এসময় তিনি পেছন দিক থেকে হাত এনে আমাকে ধরলেন এবং তাঁর পেছন দিক দিয়ে আমাকে টেনে এনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত : একবার রসূলুল্লাহ সা. আমাদের ঘরে আসেন এবং নামাযে দাঁড়ান। আমি এবং একটি এতীম ছেলে তাঁর পেছনে দাঁড়াই আর (আমার মা) উম্মে সুলাইম দাঁড়ান আমাদের দু'জনের পিছে। (সহীহ মুসলিম)

হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন কোনো ব্যক্তি যখন লোকদের ইমামতি করবে, তখন সে যেনো তাদের (মুক্তাদিদের) চেয়ে উঁচু জায়গায় না দাঁড়ায়। (আবু দাউদ)

সহল ইবনে সা'আদ রা. থেকে বর্ণিত একবার রসূলুল্লাহ সা. মিম্বরের উপর কিবলামুখী দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বললেন। লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়ালো। তিনি ওখানে দাঁড়িয়েই কিরাত (পাঠ) করলেন, রুকূও করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে রুকূ করলো। তারপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে পেছনে সরে এসে মসজিদের মেঝেতে নেমে এলেন এবং সমতল ভূমিতে সাজদা করলেন। সাজদা শেষে আবার মিম্বরে উঠলেন, কিরাত (পাঠ) করলেন, রুকূ করলেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠালেন। অতপর পেছনে সরে এসে সমতল ভূমিতে সাজদা করলেন।

নামায শেষ করে তিনি মুক্তাদিদের লক্ষ্য করে বললেন হে লোকেরা! আমি এজন্যে এমনটি করেছি, যাতে করে তোমরা সঠিকভাবে জেনে শুনে আমার নামায পড়ার নিয়ম অনুসরণ করতে পারো। (বুখারি, মুসলিম)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : একবার রসূলুল্লাহ্ সা. আমার কক্ষে (নফল) নামায পড়েন। এসময় লোকেরা আমার কক্ষের বাইরে থেকে তাঁর পেছনে ইকতেদা করে। (আবু দাউদ)

এই হাদিসগুলো থেকে জানা গেলো :

১. ইমামের সাথে মুক্তাদি মাত্র একজন হলে তিনি ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবেন।

২. একক মুক্তাদি ভুলবশত বা অজ্ঞতা বশত ইমামের বাম পাশে দাঁড়ালে ইমাম তার হাত ধরে নিজের পেছনে দিয়ে তাকে নিজের ডানপাশে নিয়ে আসবেন।

৩. মুক্তাদি একাধিক হলে তারা ইমামের পেছনে দাঁড়াবেন। অজ্ঞতবশত তারা ইমামের পাশে দাঁড়ালে ইমাম তাদের পেছনে ঠেলে দেবেন অথবা (সামনে জায়গা থাকলে) নিজে সামনে এগিয়ে দাঁড়াবেন।

৪. নফল নামাযও জামাতে পড়া যায়।

৫. কোনো ব্যক্তি ইমাম হিসেবে নামায শুরু না করলেও তার পেছনে ইকতেদা করা (নামায পড়া) যাবে।

৬. ইমামের পরে পুরুষরা দাঁড়াবে তারপর শেষে মহিলারা দাঁড়াবে।

৭. ইমাম মুক্তাদিদের চাইতে উঁচু জায়গায় দাঁড়াবেন না। রসূল সা. একবার মিম্বরে দাঁড়িয়েছিলেন সাহাবিদের নামায শিখানোর জন্যে। তবে সাজদা করেন নিচে নেমে এসে।

৮. ইমাম ঘরের ভেতর আর মুক্তাদিরা ঘরের বাইরে থাকলে নামাযের ক্ষতি হয়না।

ইমামতি করবে কে?

আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন কোনো সমাজে তাদের ইমামতি করবে সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) জানে। আল্লাহ্র কিতাব জানার ক্ষেত্রে সবাই যদি সমান হয়, তবে ইমামতি করবে সে ব্যক্তি, যে সুন্নাহ সম্পর্কে সবার চেয়ে বেশি অবগত। সুন্নাহ অবগতির ক্ষেত্রেও যদি সবাই বরাবর হয়, তবে তাদের ইমামতি করবে সে ব্যক্তি, যে হিজরতের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে

অগ্রবর্তী। হিজরতের ক্ষেত্রেও যদি তারা বরাবর হয়ে থাকে, তবে ইমামতি করবে সে, যার বয়স বেশি।

কেউ যেনো অপর কারো কর্তৃত্বের স্থানে ইমামতি না করে। আর কেউ যেনো অপর কারো ঘর বা কার্যলয়ে গিয়ে তার অনুমতি ছাড়া তার নির্দিষ্ট আসনে না বসে। (সহীহ মুসলিম)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের উত্তম লোকেরাই যেনো তোমাদের নামাযের আযান দেয়, আর সর্বাধিক কুরআন জানা লোকেরাই যেনো তোমাদের ইমামতি করে। (আবু দাঊদ)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত একবার (কোনো এক যুদ্ধে যাত্রার সময়) রসূলুল্লাহ সা. (মদিনায়) লোকদের ইমামতি করার জন্যে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান, অথচ তিনি ছিলেন একজন অন্ধ। (আবু দাউদ)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন তিনজনের নামায তাদের মাথার উপর এক বিঘতও উঠানো (অর্থাৎ কবুল করা) হয়না। তারা হলো :

১. সেই ব্যক্তি, যে মানুষের ইমামতি করে, অথচ লোকেরা তাকে পছন্দ করেনা। .... (ইবনে মাজাহ)

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সা. মদীনায় আসার পূর্বে প্রাথমিক মুহাজিররা যখন মদীনায় পৌছলো, তখন তাদের ইমামতি করতো আবু হুযাইফার গোলাম সালিম, অথচ তাদের মধ্যে উমর রা. এবং আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদও বর্তমান ছিলেন। (সহীহ বুখারি)

সালিম রা. কুরআনের বড় জ্ঞানী (আলিম) ছিলেন। রসূল সা. চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআন শিখতে বলেছিলেন। সালিম রা. ছিলেন এই চার ব্যক্তিরই অন্যতম। মৃত্যুকালে খলিফা উমর রা. বলেছিলেন আজ যদি সালিম বেঁচে থাকতো, তবে আমি তাকেই পরবর্তী খলিফা বানানোর প্রস্তাব করতাম। কুরআনের বড় আলিম হবার কারণেই সালিম সাহাবিগণের ইমাম হবার যোগ্যতা অর্জন করেন।

ইমামের কর্তব্য ও সচেতনতা

আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কখনো কখনো

এমন হয় যে, আমি নামায শুরু করি, আর আমার ইচ্ছা থাকে নামায দীর্ঘ করার; কিন্তু তখন আমি কোনো শিশুর কান্না শুনতে পাই আর দ্রুত নামায শেষ করে দিই। কারণ আমি জানি বাচ্চার কান্না শুনলে তার মায়ের মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। (সহীহ্ বুখারি)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ লোকদের নামায পড়াবে (অর্থাৎ ইমামতি করবে), তখন সে যেনো নামায হালকা (সংক্ষেপ) করে; কারণ, মুক্তাদিদের মধ্যে তো রোগী, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকেরাও থাকে। আর তোমাদের কেউ যখন একাকী নামায পড়বে, তখন সে যতোটা ইচ্ছা নামায দীর্ঘ করতে পারে। (বুখারি ও মুসলিম)

কায়েস ইবনে আবি হাযেম বলেন, রসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবি আবু মাসউদ আনসারী বলেছেন একদিন এক ব্যক্তি এসে আরয করলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র কসম, আমি ফজরের নামাযে বিলম্বে হাযির হই অমুক (ইমাম) এর কারণ। তিনি আমাদেরকে দীর্ঘ নামায পড়ান।' আবু মাসউদ বলেন অতপর দেখলাম, সেদিন রসূলুল্লাহ সা. রাগত ভাষায় উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ কেউ ইমামতি করতে গিয়ে লোকদের বিরক্ত করে তোলে। তোমাদের যে-ই লোকদের ইমামতি করে, সে যেনো অবশ্যি নামায সংক্ষেপ করে। কারণ মুসল্লিদের মধ্যে তো দুর্বল, বৃদ্ধ এবং বিভিন্ন প্রয়োজনের তাকিদে ব্যতিব্যস্ত লোকেরাও থাকে। (বুখারি, মুসলিম)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যারা তোমাদের নামায পড়াবে, তারা সঠিকভাবে পড়ালে তারা এবং তোমরা সকলেই নেকি লাভ করবে। কিন্তু তারা যদি নামায পড়াবার ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি করে, তবে তোমরা নেকি লাভ করবে এবং তারা গুনাহগার হবে। (সহীহ্ বুখারি)

মুক্তাদিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আনাস রা. থেকে বর্ণিত একদিন রসূলুল্লাহ সা. আমাদের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করার পর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন হে লোকেরা! আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা রুকূ, সাজদা, কিয়াম, সালাম ফিরানো- কোনোটাই আমার আগে করোনা। (সহীহ্ মুসলিম)

আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমরা ইমামের আগে যেয়োনা। ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তখন তাকবীর বলবে।..... ইমাম রুকূ করলে তোমরাও রুকূ করবে।... (বুখারি ও মুসলিম)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন ইমামকে এ জন্যে ইমাম বানানো হয়, যাতে করে তাকে অনুসরণ করা হয়। তাই ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, তোমরা তার সাথে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইমাম রুকূ করলে তোমরাও তার সাথে রুকূ করো। ইমাম মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাও। ইমাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহু' বললে তোমরা 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলো। (বুখারি)

আবু হুরাইয়া রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের আগেই মাথা উঠায়, সে কি ভয় করেনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দেবেন! (বুখারি, মুসলিম)

আলী ও মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন তোমাদের কেউ যখন নামাযে (জামাতে) উপস্থিত হবে, তখন সে যেনো তা তা করে, ইমাম যখন যে অবস্থায় যা যা করে। (তিরমিযি)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা নামায় এবং উঠায়, শয়তান তার টিকি ধরে আছে। (মু'আত্তা ইমাম মালেক)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন তোমরা যদি মসজিদে এসে দেখো আমরা সাজদারত আছি, তবে তোমরাও (সরাসরি) সাজদা করো। কিন্তু সেই সাজদাওয়ালা রাকাতকে তোমাদের জন্যে এক রাকাত গণ্য করোনা। তবে যে পূর্ণ এক রাকাত পেয়েছে, সে পুরো নামাযই পেয়েছে। (আবু দাউদ)

ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেছেন, আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি (একাধারে) চল্লিশ দিন প্রথম তকবীরে (তকবীর তাহরীমায়) শামিল হয়ে জামাতে নামায পড়েছে, সে দুটি জিনিসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বলে লেখা হবে :

১. সে দোযখের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

২. সে মুনাফিকীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

এক নামায দুই বার পড়া

জাবির রা. থেকে বর্ণিত : মুয়ায বিন জাবাল রা. রসূলুল্লাহ সা. -এর সাথে নামায পড়তেন, অতপর নিজ পাড়ায় ফিরে এসে পাড়ার লোকদের (একই) নামায পড়াতেন। (বুখারি, মুসলিম)

জাবির রা. বর্ণনা করেছেন : মুয়ায রা. রসূলুল্লাহ সা.-এর পিছে ইশার নামায পড়তেন, তারপর নিজ পাড়ার লোকদের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে ইশার নামায পড়াতেন। অথচ এই নামাযটি ছিলো তার জন্যে অতিরিক্ত। (বায়হাকি)

ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন বিদায় হজ্জের সময় আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে মসজিদে খায়েফে ফজরের নামায পড়েছি। তিনি নামায শেষ করে যখন ঘুরে বসলেন, দেখলেন, শেষ প্রান্তে দুই ব্যক্তি তাঁর সাথে নামায না পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাদেরকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। তাদের যখন আনা হলো, তখন তাদের শরীর কাঁপছিল। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন কোন্ জিনিস তোমাদেরকে আমাদের সাথে নামায পড়তে বাধা দিয়েছে? তারা বললো 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের আবাসে নামায পড়ে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন এমনটি কখনো করোনা। যখন তোমরা আবাসে নামায পড়ে এসে মসজিদে জামাত দেখতে পাবে, তখন তাদের সাথে নামাযে অংশ নিয়ো। এই নামায হবে তোমাদের জন্যে নফল (অতিরিক্ত)। (তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী)

মেহজান রা. বলেন, একবার আমি ঘরে নামায পড়ে আসার কারণে মসজিদে নামায শুরু হলে নামায না পড়ে বসে থাকি। নামায শেষে রসূল সা. আমাকে আলাদা বসে থাকতে দেখে বললেন তোমাকে জামাতে নামায পড়তে কিসে বাধা দিয়েছে, তুমি কি মুসলিম নও? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যি আমি মুসলিম। তবে আমি ঘরে নামায পড়ে এসেছি। তিনি বললেন : তুমি ঘরে নামায পড়ে এলেও যখন মসজিদে জামাত দাঁড়াতে দেখবে, তখন জামাতে শরীক হয়ো। (নাসায়ী, মু'আত্তা)

● ● ●

৪

রসূল সা. ফরযের আগে-পরে যেসব নামায পড়তেন[২৭]

ফরযের আগে পরে তিনি কয় রাকাত পড়তেন?

রসূলুল্লাহ্ সা. আবাসে (অর্থাৎ মুকীম অবস্থায়) ফরযের আগে পরে নিয়মিত দশ রাকাত নামায পড়তেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. এই দশ রাকাতের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন "আমি রসূলুল্লাহ্ সা.-এর (ফরযের আগে পরের) দশ রাকাত নামায স্মৃতিতে ধরে (হিফয করে) রেখেছি। তিনি :

- যুহরের আগে দুই রাকাত পড়তেন।
- যুহরের পরে দুই রাকাত পড়তেন।
- মাগরিবের পরে ঘরে দুই রাকাত পড়তেন।
- ইশার পরে ঘরে দুই রাকাত পড়তেন।
- ফজরের আগে দুই রাকাত পড়তেন।" (বুখারি ও মুসলিম)

সফর ছাড়া তিনি এই দুই দুই রাকাত নিয়মিত পড়তেন। যুহরে একবার দুই রাকাত বাদ পড়েছিল, তখন তিনি সেই দুই রাকাত আসরের পরে পড়েন। এই দুই দুই রাকাতের ব্যাপারে তাঁর নিয়ম স্থায়ী ছিলো। তিনি একবার কোনো নিয়ম চালু করলে সেটা চালিয়ে যেতেন। তবে দশের স্থলে কোনো কোনো বর্ণনায় বার রাকাতের উল্লেখও রয়েছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমে উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবার সূত্রে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। উম্মে হাবীবা রা. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি দিন রাতে ফরযের অতিরিক্ত বার রাকাত নামায পড়বে, সেগুলোর বিনিময়ে তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি হবে।"

ইমাম তিরমিযি এই বর্ণনায় এই কথাগুলোও যোগ করেছেন :

- যুহরের আগে চার রাকাত।
- যুহরের পরে দুই রাকাত।
- মাগরিবের পরে দুই রাকাত।

---

২৭. এ অধ্যায়ে সেসব নামাযের কথা আলোচিত হয়েছে, যেগুলো রসূলুল্লাহ সা. নফল হিসেবে ফরযের সাথে (অর্থাৎ ফরযের আগে পরে) পড়তেন। যেহেতু রসূল সা. নিজে এসব নামায পড়েছেন এবং উম্মতকে পড়তে বলেছেন, উৎসাহিত করেছেন, সেজন্যে এই নামাযগুলো উম্মতের জন্যে সুন্নত।

- ইশার পরে দুই রাকাত।

- ফজরের আগে দুই রাকাত।"

ইবনে মাজাহ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে মারফূ হাদিস উল্লেখ করেছেন, তাতে উম্মে হাবীবা রা.-এর অনুরূপ বার রাকাতের কথা উল্লেখ হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমেও আয়েশা রা.-এর একটি বর্ণনা এরকম উল্লেখ হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকীক বলেন, আমি মা আয়েশাকে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেন : রসূলুল্লাহ্ সা. যুহরের আগে আমার ঘরে চার রাকাত নামায পড়তেন। তারপর মসজিদে গিয়ে লোকদের নামায পড়িয়ে আবার আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়তেন। তিনি লোকদের মাগরিবের নামায পড়িয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়তেন। লোকদের ইশার নামায পড়িয়েও আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়তেন। ...... আর ফজরের সূচনাতে দুই রাকাত নামায পড়তেন।"

সব নফলের (সুন্নতের) মধ্যে রসূল সা. ফজরের আগের দুই রাকাত এবং বিতর নামাযের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন।

যুহরের আগে চার রাকাত, না দুই রাকাত?

যুহরের আগের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে দুই প্রকার বর্ণনা পাওয়া গেলো। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রসূল সা. যুহরের আগে দুই রাকাত পড়তেন। অপরদিকে আয়েশা এবং উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনা থেকে জানা যায়, চার রাকাত পড়তেন।

হয়তো তিনি কখনো দুই রাকাত এবং কখনো চার রাকাত পড়তেন। দুইটি বর্ণনাই সহীহ। বর্ণনাকারী ইবনে উমর রা. এবং আয়েশা ও উম্মে হাবীবা রা. যে যা দেখেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন।

ব্যাপারটা এমনো হতে পারে যে, এই চার রাকাত যুহরের আগের নামায ঘরে পড়লে চার রাকাত পড়তেন, আর মসজিদে পড়লে দুই রাকাত পড়তেন।

- হাদিস থেকে একথা স্পষ্টই মনে হয়।

আবার এমনটিও হতে পারে যে, এই চার রাকাত যুহরের সুন্নত নয়, বরং স্বতন্ত্র নামায এবং সূর্য হেলার পর এই চার রাকাত তিনি পড়তেন।- বিভিন্ন হাদিস থেকে এ মতের পক্ষে ইংগিত পাওয়া যায়। যেমন, মুসনাদে আহমদে আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সা. সূর্য হেলার পর চার রাকাত নামায পড়তেন।" তিনি বলেছেন সূর্য হেলার পরের সময়টা এ রকম যে, তখন আসমানের দরজা সমূহ

খুলে দেয়া হয়, তাই আমার বড়ই পছন্দ যে, ঐ সময় আমার কিছু আমল উপরে উঠুক।"

সুনান গ্রন্থ সমূহে আয়েশা রা. থেকে একথাও উল্লেখ হয়েছে যে, রসূল সা. যদি কখনো কোনো কারণে যুহরের আগে চার রাকাত নামায আদায় করতে না পারতেন, তখন তিনি তা যুহরের পরে পড়ে নিতেন।' ইবনে মাজাহ-তে উল্লেখ হয়েছে, যুহরের আগে চার রাকাত নামায কখনো পড়তে না পারলে আসরের পরে পড়ে নিতেন।

তিরমিযিতে আলী রা. থেকেও যুহরেরর আগে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাতের উল্লেখ হয়েছে।

ইবনে মাজায় আয়েশা রা. থেকে এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, রসূল সা. যুহরের আগে চার রাকাত নামায পড়তেন। তাতে লম্বা কিয়াম করতেন আর রুকূ-সাজদা উত্তমভাবে (দীর্ঘভাবে) করতেন।"

- এসব বর্ণনা থেকে ইংগিত পাওয়া যায়, যুহরের আগের চার রাকাত আসলে স্বতন্ত্র চার রাকাত, যা রসূলুল্লাহ সা. সূর্য হেলার পরে পড়তেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

যুহরের পূর্বের সুন্নত মূলত দুই রাকাত, যা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন। এটা অন্যান্য নামাযের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, সব নামাযেরই সুন্নত দুই রাকাত দুই রাকাত। এমন কি ফজরের পূর্বে প্রচুর সময় থাকা সত্ত্বেও রসূল সা. ফজরের সাথে শুধু দুই রাকাত পড়তেন।

তাই যুহরের পূর্বের চার রাকাত নামায মূলত স্বতন্ত্র নামায, সূর্য হেলার নামায।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূর্য হেলার পর আট রাকাত নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, এ নামায দুপুর রাতের পর আমরা যে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ি, তার সমমর্যাদা সম্পন্ন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

আসরের আগে কি তিনি কোনো নামায পড়তেন?

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসূল সা. আসরের আগে চার রাকাত নামায পড়তেন। যেমন-

১. আহমদ, তিরমিযি ও আবু দাউদ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে আসরের আগে চার রাকাত (সুন্নত) নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন।

২. তিরমিযি আলী রা.-এর সূত্রে আসরের আগে চার রাকাত নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন।

৩. তিরমিযি আলী রা.-এর সূত্রে আসরের আগে দুই রাকাত নামায পড়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ আছে। শুধু ইবনে হিব্বান ওটিকে সহীহ বলেছেন। বাকি সব মুহাদ্দিস এটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। আসলেই এই বর্ণনাটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে সহীহ সূত্রে যেসব বর্ণনা পাওয়া গেছে, তাতে তিনি বলেছেন, "আমি রসূল সা. থেকে দিনে রাতে দশ রাকাত নামাযের কথা মনে রেখেছি।" তাঁর দশ রাকাতের মধ্যে আসরের আগে চার রাকাত নামাযের কোনো উল্লেখ নেই।- ফলে এখানে চার রাকাতের যে বর্ণনা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বর্ণানাটির ব্যাপারে আমি শুনেছি, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এটিকে হাদিস বলতে অস্বীকার করতেন। তিনি এটির প্রতিবাদ করতেন। তিনি এটিকে মওজু (মনগড়া) বলতেন। আবু ইসহাক জুযেজানীও এটিকে অস্বীকার করতেন।

- ফলে আসরের আগে রসূল সা. কোনো নফল নামায পড়েছেন বলে সহীহ শুদ্ধভাবে জানা যায়না।

মাগরিবের আগে কি কোনো নামায আছে?

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মদীনায় যখন মুয়াযিযন মাগরিবের আযান দিতো, লোকেরা তাড়াতাড়ি করে মসজিদের খুঁটি সমূহের দিকে যেতো এবং দুই রাকাত নামায পড়তো। এতো বেশি লোক তখন দুই রাকাত নামায পড়তে থাকতো যে, হঠাৎ কোনো লোক এলে মনে করতো, জামাত বুঝি শেষ হয়ে গেছে।' (সহীহ মুসলিম)

মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার উকবা ইবনে আমের আল জুহ্হানী রা.-এর কাছে এলাম। আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে আবু তামীম সম্পর্কে একটি আজব কথা শুনাবো কি? - সেটা হলো : তিনি মাগরিবের আগে দু'রাকাত নামায পড়েন।' আমার কথা শুনে উকবা বললেন আমরা রসূলুল্লাহ সা.-এর সময় এই দুই রাকাত পড়তাম। আমি বললাম : এখন পড়েন না কেন? তিনি বললেন : ব্যস্ততার কারণে।' (সহীহ বুখারি)

মুখতার ইবনে ফুলফুল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার আসরের পরে দুই রাকাত নফল নামায পড়া সম্পর্কে আনাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন : আসরের পরে যারা নামায পড়ার জন্যে হাত বাঁধতো, উমর রা. তাদের হাতে আঘাত করতেন। অবশ্য রসূলুল্লাহ সা.-এর সময় সূর্যাস্তের পর এবং মাগরিবের নামাযের পূর্বে আমরা দুই রাকাত নফল নামায পড়তাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ

আলাইহি ওয়াসল্লামও কি এই দুই রাকাত পড়তেন? জবাবে তিনি বলেন : তিনি আমাদের পড়তে দেখতেন। তবে পড়তে নির্দেশও দেন নাই, নিষেধও করেন নাই।" (সহীহ মুসলিম)

- এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, মাগরিবের আগে দুই রাকাত নামায রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক অনুমোদিত।

সুন্নত নামায ঘরে পড়া সুন্নত

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হে লোকেরা, তোমরা ঘরে নামায পড়ো। জেনে রাখো, ফরয ছাড়া অন্যান্য নামায ঘরে পড়া উত্তম।"

রসূলুল্লাহ সা.-এর রীতি ছিলো যে, কোনো অসুবিধা না থাকলে তিনি সুন্নত ও নফল নামায ঘরেই পড়তেন। ঠিক তেমনি সফর, অসুস্থতা ইত্যাদি কোনো কারণ না ঘটলে তিনি ফরয নামায মসজিদেই পড়তেন।

আমরা ইতোপূর্বে সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত আয়েশার বর্ণনা উল্লেখ করেছি। তাতে তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. যুহর নামাযের আগে আমার ঘরে চার রাকাত পড়তেন। তারপর মসজিদে গিয়ে লোকদের নামায পড়াতেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে দুই রাকাত নামায পড়তেন। তিনি লোকদের মাগরিবের নামায পড়িয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়তেন। লোকদের ইশার নামায পড়িয়ে তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়তেন। (সহীহ মুসলিম)

তিরমিযি, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে কা'আব ইবনে উজরা রা. থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন একদিন রসূলুল্লাহ সা. বনি আবদুল আশহালের মসজিদে আসেন এবং সেখানে মাগরিবের নামায পড়েন। (ফরয) নামায শেষ হবার পর তিনি দেখতে পেলেন, লোকেরা নফল (সুন্নত) পড়ায় ব্যাপৃত হয়েছে। তখন তিনি বললেন :

"এই নামায তো ঘরের নামায।"

তিরমিযি ও নাসায়ীতে বর্ণিত হাদিসটির ভাষা হলো : ফরয শেষে লোকেরা নফল পড়তে শুরু করে। তখন নবী করীম সা. তাদের বললেন : তোমাদের উচিত এই নামায ঘরে পড়া।"

বিভিন্ন বর্ণনায় ফজরের সুন্নত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, রসূল সা. এ নামায ঘরেই পড়তেন।

ইসলামি বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, কেউ যদি সুন্নত ও নফল নামায মসজিদে পড়ে, তবে তা জায়েয, যেমন কারণবশত ফরয নামায ঘরে পড়া জায়েয। তবে সুন্নত পন্থা হলো তাই, যা উপরে আলোচিত হয়েছে।

৫

সফরের নামায

সফরে রসূল (ফরয) নামায দুই রাকাত পড়তেন

রসূলুল্লাহ সা. তাঁর রিসালাতকালে মোটামুটি চার প্রকার সফর করেছেন। সেগুলো হলো :

১. হিজরতের সফর।
২. আল্লাহ্র পথে জিহাদের সফর। এ সফরই সবচেয়ে বেশি করেছেন।
৩. উমরার সফর।
৪. হজ্জের সফর।

রসূলুল্লাহ সা. যখন সফরে রওয়ানা করতেন, তখন সফর শেষে মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত চার রাকাতের নামায সমূহ কসর (হ্রাস) করে দুই রাকাত পড়তেন।

সফরে তিনি চার রাকাত পুরো পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই। তবে এ সম্পর্কে আয়েশা রা. থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, রসূল সা. সফরে কখনো কসর করতেন, আবার কখনো পুরো পড়তেন। কিন্তু এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, এটি লোকদের মনগড়া হাদিস। আয়েশা রা. কী করে রসূল সা. এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের কার্যধারার বিপরীত কোনো কথা বর্ণনা করতে পারেন?[২৮]

প্রমাণিত হাদিস থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমত, প্রতি ওয়াক্ত নামাযই দুই রাকাত করে ফরয করেছেন। অতপর রসূলুল্লাহ সা. যখন

---

২৮. রসূল সা. ও তাঁর সাহাবিগণ সফরে কিভাবে নামায পড়তেন , সে সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা হলো :

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীর মাধ্যমে আবাসে চার রাকাত এবং প্রবাসে (সফরে) দুই রাকাত নামায ফরয় করেছেন। তাছাড়া আল্লাহ্ পাক সন্ত্রাসকালে এক রাকাত নামায ফরয করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. উভয় থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সা. সফরে দুই রাকাত নামায পড়ার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। এই দুই রাকাত মূলত পূর্ণ নামায, হ্রাসকৃত নয় (বরং আবাসের নামায দুই রাকাত বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া নবী করীম সা. সফরে বিতির নামাযও পড়তেন। (ইবনে মাজাহ)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে মক্কা রওয়ানা করি। আমরা মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি (চার রাকাতের) নামায দুই রাকাত পড়েছেন। (বুখারি ও মুসলিম)।

হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন আবাসে নামাযের রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। আর প্রবাসের (সফরের) নামায পূর্ববৎ বহাল রাখা হয়।

রসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর সকল সফরেই সব নামায দুই রাকাত করে পড়েছেন, তিনি কোনো ওয়াক্তে চার রাকাত পড়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর ব্যাপারে কী করে এ সন্দেহ করা যেতে পারে যে, তিনি রীতি বহির্ভূত কাজ করেছেন? মুসলমানরা তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা কেউই তাঁকে সফরে চার রাকাত নামায পড়তে দেখেননি। আয়েশার বক্তব্যের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন "আয়েশার নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা ছিলো, যেমন নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা ছিলো হযরত উসমানের।"[২৯]

বলা হয়ে থাকে, হযরত আয়েশার ধারণা ছিলো, নামায কসর করার জন্যে সফর শর্ত এবং সফরের সাথে ভয় ও আক্রমণের আশংকা থাকাও শর্ত। তাই তাঁর মতে যে সফরে ভয়ের কারণ থাকেনা এবং আক্রমণের আশংকা থাকেনা, সেই সফরে নামায কসর করারও কারণ থাকেনা।

এই ব্যাখ্যা একেবারেই ভুল। তাছাড়া এ ব্যাখ্যা রসূল সা.-এর রীতির খেলাফ। কারণ সাহাবায়ে কিরাম থেকে একথা সুপ্রমাণিত যে, রসূল সা. নিরাপদ সফরেও সর্বদা নামায কসর করতেন।

এ সম্পর্কে হযরত উমরের বর্ণনা খুবই চমৎকার। তিনি বলেন নিরাপদ সফরে রসূল সা.-কে নামায কসর করতে দেখে আমি বিস্ময়বোধ করি এবং

ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সাথে অনেক যুদ্ধে শরীক হয়েছি। মক্কা বিজয়কালেও আমি তাঁর সাথে ছিলাম। এসময় তিনি মক্কায় আঠার রাত অবস্থান করেন, এ সময় তিনি নামায দুই রাকাত করে পড়েছেন। (আবু দাউদ)

২৯. এ সংক্রান্ত হাদিস নিম্নরূপ :

উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার খালা) আয়েশা রা. বলেছেন : নামায দুই রাকাত দুই রাকাত করেই ফরয হয়। অতপর রসূলুল্লাহ্ সা.-এর হিজরত করার পর চার রাকাত ফরয করা হয়, তবে সফরের নামায আগের মতোই দুই রাকাত ফরয থাকে।" ইমাম যুহরী বলেন, আমি উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম : তবে আপনার খালা আয়েশা রা. কেন সফরে চার রাকাত পড়তেন? জবাবে উরওয়া বলেন : এ ব্যাপারে তাঁর একটি ব্যাখ্যা ছিলো, যেমন হযরত উসমানের একটি ব্যাখ্যা ছিলো। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হযরত আয়েশার ব্যাখ্যা ছিলো এই যে, তিনি মনে করতেন, সফরে ভয় ও সন্ত্রাসের সম্মুখীন হলেই নামায কসর করতে হবে, নতুবা নয়।

হযরত উসমান একবার হজ্জের সময় মিনায় চার রাকাত নামায পড়েন। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : আমি এখানে এসে বিয়ে করেছি। আর রসূল সা. বলেছেন, কেউ সফরে গিয়ে কোথাও বিয়ে করলে, সে সেখানে মুকীম হয়ে যাবে এবং পূর্ণ নামায পড়বে।

তাঁকে কসরের আয়াতটি উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করি : আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেছেন তোমরা যদি আশংকা করো, কাফিররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে, তবে তোমরা নামায কসর করতে পারো।" আমরা তো এখন নিরাপদ সফর করছি, তবু আপনি নামায কসর করলেন, এর কারণ কি? জবাবে রসূল সা. বলেন : এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি একটি দান (অবকাশ, অনুগ্রহ), সুতরাং তোমরা তাঁর দেয়া এই দান (অবকাশ ও অনুগ্রহ) গ্রহণ করো।[৩০] (সহীহ মুসলিম)

এ থেকে বুঝা গেলো, কোনো আয়াতের নিজস্বভাবে তাৎপর্য বুঝা উম্মতের দায়িত্ব নয়, বরং রসূল (শরীয়ত প্রণেতা) সা. কোনো আয়াত দ্বারা যে বিধান নির্ণয় করেন, তা মান্য করাই উম্মতের কর্তব্য।

একবার উমাইয়া ইবনে খালিদ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বললেন : কুরআনে তো আমরা কেবল মুকীম অবস্থার এবং ভয়কালীন নামাযের কথা দেখতে পাই, সফরের নামাযের কোনো কথা তো কুরআনে নেই। তাহলে সফরের নামায এলো কোত্থেকে? জবাবে হযরত আবদুল্লহ ইবনে উমর বলেন হে আমার ভাই! আমরা তো কিছুই জানতাম না। আল্লাহ্ পাক মুহাম্মদ সা.-কে আমাদের জন্যে নবী বানিয়ে পাঠালেন। অতএব আমরা তাই করি, যা তাঁকে করতে দেখেছি।

হযরত আয়েশার বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, ঐ হাদিসটি মনগড়া। কেউ সেটি রচনা করে হযরত আয়েশার নামে চালিয়ে দিয়ে থাকবে। কারণ সাহাবাগণের যাবতীয় বর্ণনা থেকে এটা সুপ্রমাণিত যে, সফরে রসূল সা. দুই রাকাতই পড়তেন, চার রাকাত পড়েতেন না। হযরত উসমান মিনায় চার রাকাত পড়েছেন বিয়ের কথা বলে।

রসূল সা. সফরে সুন্নত পড়তেন না

রসূল সা. সফরে চার রাকাতের ফরয নামায হ্রাস করে দুই রাকাত পড়তেন। সফরে তিনি বিতির এবং ফজরের সুন্নত ছাড়া ফরয নামাযের আগে পরের আর কোনো সুন্নত নামায পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই। হ্যাঁ, বিতির এবং ফজরের সুন্নত তিনি আবাসে প্রবাসে সব সময়ই পড়তেন।

সফরে সুন্নত পড়া সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : আমি সব সময় রসূলুল্লাহ সা.-এর সফর সঙ্গী থেকেছি।

---

৩০. এ সংক্রান্ত আরেকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা হলো : হারেছা বিন ওহাব খুযায়ী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. আমাদের নিয়ে মিনায় (চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত নামায পড়েছেন, অথচ এ সময় আমরা ছিলাম সকল ভয়ভীতি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। (বুখারি, মুসলিম)

কিন্তু কখনো তাঁকে তাসবীহ (সুন্নত নামায) পড়তে দেখিনি। তিনিই আমাদের আদর্শ এবং অনুসরণীয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - (الاحزاب ٢١)

অর্থ : অবশ্যি আল্লাহ্র রসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ।"

বুখারি ও মুসলিমে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূল সা. সফরে বিতির এবং রাত্রের নফল নামায সোয়ারীর পিঠে ইশারা করে পড়তেন। তবে ফরয নামায সোয়ারীর পিঠে পড়তেন না।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা.-এর আমল থেকে একথা প্রমাণিত যে, তিনি সফরে ফরয নামায কসর করতেন, রাত্রে নফল নামাযও পড়তেন।

বুখারি ও মুসলিমে আমের ইবনে রবীয়া রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সা.-কে সফরকালে রাত্রিবেলায় সোয়ারীর পিঠে বসে নফল নামায পড়তে দেখেছি। আসলে এটা ছিলো কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ নামায।

ইমাম আহমদকে সফরে নফল পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : আমি আশা করি সফরে নফল পড়লে কোনো দোষ হবেনা।

হাসান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহর সাহাবিগণ সফরে ফরয নামাযের আগে পরে নফল নামায পড়তেন । উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, জাবির, আনাস, ইবনে আব্বাস, আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুম অনুরূপ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

তবে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. সফরে ফরয নামাযের আগে পরে কোনো সুন্নত নামায পড়তেন না। কেবল শেষ রাত্রে বিতির ও তাহাজ্জুদ পড়তেন।

রসূলুল্লাহ্ সা.-এর রীতি এই ছিলো যে, তিনি সফরে ফরয নামায কসর করতেন এবং ফরযের আগে পরে আর কোনো নামায পড়তেন না। তবে ফরযের আগে পরে নফল পড়তে নিষেধও করতেন না। অবশ্য এগুলো ছিলো সাধারণ নফল, ফরয নামাযের সাথে সম্পর্কিত নয়। কারণ মুসাফিরের সুবিধার জন্যে যে ফরয নামাযই হ্রাস করে দুই রাকাত করা হয়েছে, সেখানে ফরযের আগে পরে সুন্নত নামাযের রীতি চালু রাখার তো কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এমনটি হলে তো ফরয নামায পূর্ণ করাই উত্তম ছিলো। এজন্যেই আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বলেছেন : সফরে ফরযের আগে পরে সুন্নত নামায পড়ার দরকার হলে তার চাইতে ফরয নামাযই (কসর না করে) পূর্ণ করতাম।

রসূলুল্লাহ সা. যুহরের আগে চার রাকাত আর যুহরের পরে দুই রাকাত নামায কখনো ছাড়তেন না বলে হযরত আয়েশার যে বর্ণনাটি রয়েছে, তা আবাসের নামাযের জন্যে প্রযোজ্য, প্রবাসের নামাযের জন্যে নয়।

তিনি যানবাহনে নামায পড়েছেন

রসূলুল্লাহ সা. এর রীতি ছিলো যে, তিনি যখন সোয়ারী বা যানবাহনে ভ্রমণরত থাকতেন, তখন বাহনের উপরই নফল নামায পড়তেন।[৩১] বাহন যেদিকেই চলতো, ঘুরতো, স্বাভাবিকভাবে তিনি সেদিকে ফিরেই নামায পড়তেন। এসময় তিনি ইশারায় মাথা নুইয়ে রুকূ সাজদা করতেন। তবে রুকূর চাইতে সাজদায় মাথা বেশি নোয়াতেন।

মুসনাদে আহমদ এবং আবু দাউদে আনাস রা. থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, তাকবীরে তাহরীমার সময় তিনি বাহনকে কিবলামুখী করে নিতেন। তারপর বাকি নামায বাহন যেদিকে যেতো সেদিকে ফিরেই পড়তেন।

- এ হাদিসটি বিতর্কিত। কারণ, অনেকগুলো সহীহ হাদীসের বক্তব্যের সাথে এ হাদীসের বক্তব্য মিলেনা।

রসূলুল্লাহ সা.-এর বাহনে নামায পড়ার বিষয়ে অন্য যারা বর্ণনা করেছেন, তাদের সকলের বর্ণনার মধ্যে মিল আছে। তাঁরা সকলেই বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বাহনে নামায পড়েছেন এবং বাহন যে মুখী হতো, তিনিও সে মুখীই নামায পড়তেন।" এসব বর্ণনায় তারা এমন কোনো কথা উল্লেখ করেননি যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় রসূল সা. বাহনকে কিবলামুখী করে নিতেন। এসব হাদিস বর্ণনা করেছেন আমের ইবনে রবীয়া, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এই হাদিসগুলো আনাস রা. বর্ণিত উক্ত হাদিস থেকে অধিকতর সহীহ-শুদ্ধ। (আল্লাহ্ই অধিক জানেন)

বৃষ্টির সময় এবং কাদামাটির স্থানে রসূলুল্লাহ সা. সাহাবিগণকে সাথে নিয়ে ফরয নামাযও যানবাহনে পড়েছেন। অবশ্য এ বিষয়ে একাধিক সূত্রের বর্ণনা নেই। কেবল একজন সাহাবিই এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসটি মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি হলো : একবার রসূলুল্লাহ সা. সাহাবিগণকে নিয়ে একটি অপ্রশস্ত জায়গায় উপনীত হন। সেখানে তাঁদের উপর থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল আর নিচে ছিলো কাদামাটি। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হয়। রসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশে মুয়াযিযন আযান এবং ইকামত দিলো। রসূল সা. নিজের বাহনে করে সবার সামনে চলে গেলেন এবং ইমাম হিসেবে সাহাবিগণকে সাথে নিয়ে নামায পড়েন।

---

৩১. এ সম্পর্কে বুখারি ও মুসলিম সহ অন্যান্য গ্রন্থে ইবনে উমর, জাবির, আমের প্রমুখ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ফরয নামাযের জন্যে যেহেতু রসূল সা. জামাত কায়েম করতেন আর তখনকার বাহন পশুর পিঠে জামাত কায়েম করা সম্ভব ছিলনা, তাই ফরয নামাযের সময় বাহন থেকে নেমে জামাত কায়েম করতেন।

তাঁরা সবাই নিজ নিজ বাহন থেকে নামায পড়েন। রসূল সা. ইশারায় রুকূ-সাজদা করেন। তবে রুকূর চাইতে সাজদায় মাথা অধিকতর নিচু করেন।"

- ইমাম তিরমিযি বলেছেন হাদিসটি গরীব। অর্থাৎ এক পর্যায়ে হাদিসটির বর্ণনাকারী মাত্র এক জন ছিলেন। এক পর্যায়ে উমর ইবনে রিমাহ্ একাই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য হযরত আনাস বাহনে ফরয নামায পড়েছেন বলে প্রমাণ আছে।[৩২]

তিনি দুই ওয়াক্ত একত্রে পড়েছেন

রসূলুল্লাহ সা.-এর রীতি ছিলো, তিনি যদি সূর্য হেলার আগে সফরে বেরোতেন, তাহলে যুহর নামাযকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। অতপর আসরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য হেলার পর সফরে রওয়ানা করতেন, তাহলে যুহরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়ে রওয়ানা করতেন।

যদি মাগরিবের সময় তাড়াহুড়া করে যাত্রা শুরু করতেন, তাহলে মাগরিবের নামাযকে বিলম্বিত করে ইশার সময় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তেন।

রসূলুল্লাহ সা.-এর তবুক সফর সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে : তবুক সফরে কোনো মনযিল থেকে রওয়ানা করার প্রাক্কালে রসূল সা. যদি সূর্য হেলার পরে রওয়ানা করতেন, তবে যুহরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়ে রওয়ানা করতেন। যদি সূর্য হেলার পূর্বে যাত্রা করতেন, তবে যুহরকে বিলম্বিত করে আসরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়তেন। মাগরিব এবং ইশার ক্ষেত্রেও অনুরূপ করতেন। এই হাদিসটির ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে :

- কেউ কেউ বলেছেন হাদিসটি সহীহ (বিশুদ্ধ)।
- কেউ কেউ বলেছেন হাদিসটি হাসান (উত্তম)।
- কেউ কেউ বলেছেন হাদিসটি ত্রুটিপূর্ণ।

কিন্তু আমরা সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছি, এই বক্তব্য সংক্রান্ত হাদিসে কোনো ত্রুটি নেই। যেমন, একই বক্তব্য সংক্রান্ত যে হাদিস হাকিম তাঁর মুসতাদরক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সেটির সূত্র (সনদ) সহীহ হবার সকল শর্ত পূর্ণ করেছে।

হাকিম বলেছেন, আমার কাছে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ বালুবিয়া বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন মূসা ইবনে হারূণ,

---

৩২. হাদিসটি একক সূত্রে বর্ণিত হলেও যুক্তিসংগত। কারণ, বাহন থেকে নেমে যমীনে জামাত কায়েম করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে বাহনে নামায পড়াটাই যুক্তিসংগত। আধুনিককালের যানবাহনের ক্ষেত্রে হাদিসটি খুবই প্রযোজ্য, যেমন লঞ্চ।

তার কাছে বর্ণনা করেছেন কুতাইবা ইবনে সায়ীদ, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন লাইছ ইবনে সা'আদ, তিনি শুনেছেন ইয়াযীদ ইবনে আবি হাবিব থেকে, তিন শুনেছেন আবু তুফাইল থেকে, তিনি মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে। মুয়ায রা. তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন : তবুক যুদ্ধের সফরে রসূলুল্লাহ সা. যখনই (কোনো মনযিল থেকে) সূর্য হেলার পূর্বে রওয়ানা করতেন, তখন যুহর নামাযকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং আসরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য হেলার পরে রওয়ানা করতেন, তবে (যুহরের সময়) যুহর ও আসর একত্রে পড়ে রওয়ানা করতেন। যদি সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা করতেন, তবে মাগরিব নামাযকে ইশা পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং ইশার সময় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তেন। যদি সূর্যাস্তের পরে রওয়ানা করতেন তবে ইশাকে এগিয়ে এনে মাগরিবের সময় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়ে রওয়ানা করতেন।"

- হাকিম বলেছেন, এই হাদিসটি একদল বিশস্ত (হাদিসের) ইমাম বর্ণনা করেছেন। হাদিসটিতে কোনো প্রকার ত্রুটি কিংবা দুর্বলতা নেই।[৩৩] যারা হাদিসটিতে ত্রুটি আছে বলে উল্লেখ করেছেন, তারা মূলত এই হাদিসের একজন রাবির ব্যাপারে কথা তুলেছেন। সেই রাবি সম্পর্কে তাঁরা ভুলবশতই সমালোচনা করেছেন। ইমাম মুসলিমসহ হাদিসের ইমামগণ তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া হাদিসটির বক্তব্য যে সঠিক তার প্রমাণ আরো অনেকগুলো হাদিস থেকে পাওয়া যায়।[৩৪] ইবনে আব্বাস রা. থেকেও অনুরূপ বক্তব্য সম্বলিত হাদিস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া দুই নামায একত্রে পড়ার হাদিস সমূহ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, সফরে কোনো স্থানে অবস্থানের সময়, যখন কষ্ট থাকেনা, তখনো দুই নামায একত্রে পড়া বৈধ। কেননা রসূলুল্লাহ সা. আরাফায়

---

৩৩. হাদিসটি আবু দাউদ এবং তিরমিযিতেও বর্ণিত হয়েছে।

৩৪. সহীহ বুখারিতে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. সফরে থাকাকালে যুহর ও আসর নামায একত্রে পড়তেন এবং মাগরিব আর ইশা একত্রে পড়তেন।"

বুখারিতে আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূল সা. সফরে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তেন।

বুখারিতে আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূল সা. সূর্য হেলার পূর্বে যাত্রা করলে যুহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং আসরের সময় যুহর ও আসর একত্রে পড়তেন। বুখারিতে সালিম থেকে বর্ণিত, সফরের কষ্টের কারণে রসূল সা. মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়তেন।

অবস্থানকালে যুহর ও আসর একত্রে পড়েছেন। তাছাড়া সফরে যদি কষ্ট এবং প্রয়োজন দেখা দেয়, সে অবস্থায় দুই নামায একত্র পড়া তো উত্তম কাজ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ, ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালিক রহ. বলেছেন, দুই নামায একত্রে করার বিষয়টি সাধারণভাবে সফরের সাথে জড়িত। কোনো বিশেষ ধরণের সফরের সাথে দুই নামায একত্র করার বিষয়টি খাস (নির্দিষ্ট) নয়।

ইমাম আবু হানীফা রহ. একত্র করার বিষয়টি শুধু আরাফার জন্যে খাস বলে মনে করেন।

উম্মতের অধিকাংশ পূর্বসূরীগণ (সলফে সালেহীন) সব ধরনের ছোট বড় সফরেই নামায কসর ও একত্র করতেন।

নামায কসর ও একত্র করার জন্যে সফরের দূরত্ব

রসূলুল্লাহ সা. সফরের দূরত্বের কোনো সীমা রেখা নির্ধারণ করে দেননি। সাহাবিগণও কোনো সীমা রেখার কথা বলেননি। কতোটা দূরের সফর হলে নামায কসর করা যাবে, একত্র করা যাবে, (ফরয) রোযা স্থগিত করা যাবে-এসবের কিছুই রসূল সা. উল্লেখ করেননি। রসূল সা. এবং তাঁর সাহাবিগণ সাধারণভাবে সফর শব্দ ব্যবহার করেছেন।

কেউ কেউ মক্কা ও জিদ্দার ব্যবধান এবং মক্কা ও তায়েফের ব্যবধানকে (অর্থাৎ ৪৮ মাইলকে) সফরের ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড ধরেছেন। কিন্তু রসূল সা. এবং সাহাবিগণ এমন কিছু নির্ধারণ করে দেননি। তাঁরা সফর কথাটি বলেছেন। সুতরাং যে দূরত্বকে সাধারণভাবে সফর বলা হয়, সেটাই সফর। মাইল নির্ধারণ করা আমাদের দায়িত্ব নয়।

তাই 'সফর' বলা হয় এমন ছোট বড় সব সফরেই কসর, একত্র, রোযা স্থগিত করণ, তাইয়াম্মুম ইত্যাদি বৈধ।

শত্রু ভীতিকালীন নামায

একই সংগে সফর ও শত্রু আক্রমণ-ভীতি যোগ হলে সেই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা নামাযের আরকান এবং রাকাত সংখ্যা উভয়টাই সংক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন।

নির্বিঘ্নে (শত্রু আক্রমণের ভয়হীন) সফরকালে শুধু রাকাত সংখ্যা সংক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন।

আর সফরবিহীন ভীতিকর পরিস্থিতিতে শুধু নামাযের আরকান সংক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন।

- এটাই ছিলো রসূল সা. কর্তৃক প্রবর্তিত নামায কসর (সংক্ষেপ) করার নিয়ম। কুরআনের কসর সংক্রান্ত আয়াতের ভিত্তিতেই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করেন।[৫৩]

---

৫৩. কুরআন মজীদে দুটি সূরায় এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। একটি হলো সূরা আল বাকারা : ২৩৮ ও ২৩৯ আয়াত এবং আরেকটি হলো সূরা আন নিসা : ১০১ ও ১০২ আয়াত। এখানে উভয় সূরার আয়াতগুলো উল্লেখ করা হলো :

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ○ فَاِنْ خِفْتُمْ
فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ج فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ○

অর্থ : সমস্ত নামাযকে হিফাযত করো, বিশেষ করে মধ্যম নামাযকে। আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনয় সহকারে দাঁড়াও। তবে অশান্তি ও গোলযোগের আশংকা থাকলে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই সম্ভব নামায পড়ো। আর নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলে আল্লাহ্‌কে সেই পদ্ধতিতে স্মরণ করো (নামায পড়ো), যা তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন- ইতোপূর্বে -যা তোমাদের অজ্ঞাত ছিলো। (সূরা আল বাকারা : ২৩৮-২৩৯)

সূরা নিসায় বলা হয়েছে :

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ
خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا
○ وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا
اَسْلِحَتَهُمْ قف فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ص وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ
يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ج وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ
تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ط وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ج
وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ○

অর্থ : আর যখন তোমরা সফরে বের হও, তখন নামায সংক্ষেপ করে নিলে কোনো ক্ষতি নেই। (বিশেষ করে) যখন তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের কষ্ট দেবে। কারণ তারা প্রকাশ্যে তোমাদের শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আর হে নবী! যখন তুমি মুসলমানদের মধ্যে থাকো এবং (যুদ্ধাবস্থায়) তাদেরকে নামায পড়াবার জন্যে দাঁড়াও, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দলের তোমার সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত এবং তারা অস্ত্রশস্ত্র সংগে নেবে। তারপর তারা সাজদা করে নিলে পেছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি, যারা এখনো নামায পড়েনি, তারা এসে তোমার সাথে নামায পড়বে। আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করবে। কারণ কাফিররা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিস পত্রের দিক থেকে সামান্য গাফিল হলেই তারা তোমাদের উপর অকস্মাৎ

শত্রুভীতি কালীন পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর নামাযের পদ্ধতি ছিলো এই যে, শত্রু যদি তাঁর ও কিবলার মাঝে অবস্থান করতো, তাহলে তাঁর সংগি সাথি সকল মুসলমানকে তাঁর পিছে নামাযে দাঁড় করাতেন। তিনি তকবীর বলতেন, তাঁরাও সবাই তকবীর বলতো। তিনি রুকূতে যেতেন, তারাও সবাই রুকূতে যেতো। তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়াতেন, তারাও সবাই মাথা তুলে দাঁড়াতো। তারপর তিনি যখন সাজদায় যেতেন, তখন তাঁর নিকটবর্তী (অর্থাৎ- সামনের) সফ তাঁর সাথে সাজদায় যেতো আর পেছনের সফ শত্রুমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। এভাবে যখন তিনি পয়লা রাকাত শেষ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাতের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, তখন পিছের কাতারের লোকেরা সামনে চলে যেতো আর সামনের লোকেরা পিছের কাতারে চলে আসতো। পিছের কাতারের লোকেরা যাতে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাতে দুটি সাজদা করতে পারে, সেজন্যেই তারা সামনে আসতো, যেমনটি পয়লা রাকাতে সামনের কাতারের লোকেরা করেছিল। এভাবে ইমামের সাথে উভয়ের নামায সমান হতো।

অতপর রসূলুল্লাহ্ সা. যখন দ্বিতীয় রাকাতের রুকূতে যেতেন, তখন পয়লা রাকাতের মতো সামনে-পিছের সকলেই তাঁর সাথে রুকূতে যেতো। কিন্তু তিনি যখন দ্বিতীয় রাকাতের সাজদায় যেতেন, তখন সামনের কাতারের লোকেরা তাঁর সাথে সাজদায় যেতো, আর পিছের কাতারের লোকেরা শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকতো। অতপর তিনি যখন তাশাহ্হুদের জন্যে বসতেন, তখন পিছের কাতারের লোকেরা দুটি সাজদা সেরে নিতো এবং তাঁর সাথে তাশাহ্হুদে শরীক হতো। অতপর সবাই একত্রে তাঁর সাথে সালাম ফিরাতো।

শত্রু যদি কিবলার দিকে না হয়ে অন্য কোনো দিকে হতো, তাহলে তিনি সাথিদের দুই গ্রুপে ভাগ করে নিতেন। একটি গ্রুপ শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত (stand by) থাকতো। অপর গ্রুপটি তাঁর সাথে এক রাকাত নামায পড়ে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকা গ্রুপের স্থলে গিয়ে দাঁড়াতো এবং দাঁড়িয়ে থাকা গ্রুপটি এসে তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাকাতে শামিল হয়ে এক রাকাত নামায পড়তো। অতপর তিনি সালাম ফিরাতেন আর তারা উভয় গ্রুপ পালাক্রমে নিজস্বভাবে এক রাকাত করে পড়ে নিতো।

শত্রু কিবলার দিকে না হয়ে অন্য দিকে হলে আবার কখনো তিনি সাথিদের দুই গ্রুপ করে নিয়ে প্রথম গ্রুপকে নিয়ে পয়লা রাকাত পড়ে দ্বিতীয় রাকাতে

ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট অনুভব করো, অথবা অসুস্থ থাকো, তাহলে অস্ত্র রেখে দিলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তবুও সতর্ক থাকো। (সূরা আন নিসা : ১০১-১০২)

দাঁড়াতেন। তাঁর এই দাঁড়ানো থাকা অবস্থাতেই এই প্রথম গ্রুপ নিজেরা আরেক রাকাত পড়ে নিতো এবং সালাম ফিরিয়ে চলে যেতো। এ সময় দ্বিতীয় গ্রুপ এসে তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাকাতে শরীক হতো। এদের নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত পড়ে যখন তিনি তাশাহ্হুদের জন্যে বসতেন তখন তারা উঠে দাঁড়াতো এবং রয়ে যাওয়া এক রাকাত নিজেরা পূরা করে নিতো। এসময় তিনি তাদের এক রাকাত শেষ করার জন্যে তাশাহ্হুদের বৈঠকে অপেক্ষা করতে থাকতেন। অতপর তাদেরও তাশাহ্হুদ শেষ হলে তিনি তাদের নিয়ে একত্রে সালাম ফিরাতেন।

আবার কখনো এমনটি করতেন যে, একটি গ্রুপকে নিয়ে দুই রাকাত পড়ে তাশাহ্হুদের জন্যে বসতেন। এসময় সে গ্রুপটি নিজেরা সালাম ফিরিয়ে চলে যেতো এবং তাদের স্থলে অপর গ্রুপটি আসতো। তখন তিনি তাশাহ্হুদের বৈঠক থেকে দাঁড়িয়ে এদেরকে সাথে নিয়েও দুই রাকাত পড়াতেন অতপর সালাম ফিরাতেন।

- এ পদ্ধতিতে তাঁর হতো চার রাকাত আর সাহাবাগণের হতো দুই রাকাত করে।

আবার কখনো তিনি একটি গ্রুপকে সাথে নিয়ে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলতেন। পূণরায় আরেকটি গ্রুপকে সাথে নিয়ে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতেন।

- এ পদ্ধতিতে তাঁর নামায হতো দু'বার।

কখনো তিনি একটি গ্রুপকে নিয়ে এক রাকাত পড়তেন। এ গ্রুপটি এক রাকাত পড়েই চলে যেতো। দ্বিতীয় রাকাত এরা পড়তোনা। অতপর আরেকটি গ্রুপ এসে তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাকাত পড়তো।

- এ পদ্ধতিতে তাঁর হতো দুই রাকাত এবং সাহাবাগণ মাত্র এক রাকাত এক রাকাত পড়তেন।

শত্রু কর্তৃক আক্রমণের আশংকা কালে এসবগুলো পদ্ধতিতেই নামায পড়া বৈধ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, এইসবগুলো পদ্ধতিই রসূল সা. থেকে প্রমাণিত, তাই অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে এই সব পদ্ধতিতেই নামায পড়া জায়েয।

এছাড়াও আরো কিছু পদ্ধতির কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোই সঠিক।

ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, তাউস, মুজাহিদ, হাসান বসরি, কাতাদা, হাকাম ও ইসহাক ইবনে রাহুইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মযহাব হলো, প্রত্যেক গ্রুপ এক রাকাত এক রাকাত করে পড়বে।

জুমার নামায

জুমার নামায কিভাবে শুরু হলো?

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক সূত্র উল্লেখ করে আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান বলেন, আমার আব্বা কা'ব ইবনে মালিক বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছুলে যখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেলো, তখন আমি তাঁকে হাতে ধরে পথ দেখিয়ে এদিক সেদিক নিতাম। আমি যখন তাঁকে জুমার নামায পড়তে নিয়ে চললাম, তখন পথিমধ্যে তিনি জুমার আযান শুনতে পেলেন। আযান শুনেই তিনি আবু উমামা আস'আদ ইবনে যিরারার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে আমার কৌতূহল হলো। কিন্তু তাঁর প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবোধের কারণে সেদিন আর আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না।

এরপর থেকে প্রত্যেক জুমাবারেই আমি তাঁকে জুমার নামাযে নিয়ে যেতাম। জুমার আযান শুনলেই তিনি আবু উমামা আস'আদ ইবনে যিরারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। কৌতূহলের আধিক্যে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেই বসলাম : আব্বা! আপনি জুমার আযান শুনলেই আস'আদ ইবনে যিরারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন কেন?

জবাবে আব্বা বললেন : বৎস! রসূলুল্লাহ্ সা. হিজরত করে মদীনায় আসার পূর্বে তিনিই আমাদের নিয়ে বাকিয়ীর বিরাণ ভূ-খণ্ডে জুমার নামায পড়ার সূচনা করেছিলেন। এ জায়গাকে বলা হতো 'বাকিউল খাদুরাত'।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তখন আপনারা কতজন জুমার নামায পড়তেন?

তিনি বললেন : চল্লিশ জন।

এ হাদিসটি একটি উত্তম ও বিশুদ্ধ সূত্রের হাদিস। এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।

- আমার মতে এটাই জুমার নামাযের সূচনা।

অতপর রসূলুল্লাহ্ সা. হিজরত করে মদীনায় এলেন। প্রথমে তিনি মদীনার উপকণ্ঠে বনি আমর ইবনে আউফের কুবা নামক স্থানে অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাকের মতে, তিনি এখানে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবারে কুবার মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতপর শুক্রবারে এখান থেকে সম্মুখে যাত্রা শুরু করেন। তিনি যখন সালিম ইবনে আউফ গোত্রে পৌঁছেন,

তখন জুমার নামাযের সময় হয়। তিনি সেই প্রান্তরে অবস্থিত মসজিদে জুমার নামায পড়েন।

মদীনায় হিজরত করে আসার পর এটাই রসূলুল্লাহ্ সা.-এর প্রথম জুমার নামায। এখানেই তিনি জুমার প্রথম খুতবা প্রদান করেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, আমি আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে তাঁর প্রথম খুতবাটি শুনতে পেয়েছি। রসূলুল্লাহ্র নামে কোনো ভুল কথা বলা থেকে আমরা আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই।

তিনি তাঁর এই প্রথম খুতবায় প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার যথোপযুক্ত হাম্দ ও সানা পাঠ করেন। অতপর বলেন :

أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ تَعْلَمُنَّ وَاللّٰهِ لَيَصْعَقَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ رَبُّهُ لَيْسَ لَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَاحَاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُوْنَهُ أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُوْلِىْ فَبَلَّغَكَ وَأَتَيْتُكَ مَالًا وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَلَا يَرٰى شَيْئًا ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قُدَامَهُ فَلَا يَرٰى غَيْرِ جَهَنَّمَ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَّتَّقِىَ بِوَجْهِهٖ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقٍّ مِّنْ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَاِنَّهَا تَجْزِىْ الْحَسَنَةَ بِعَشَرِ أَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ –

অর্থ হে মানুষ! নিজের জন্যে পূণ্য আগেই পাঠাও। মনে রাখবে, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, হঠাৎ যখন তোমাদের মৃত্যু হবে, তখন তোমাদের বকরীগুলো রাখাল শূন্য হয়ে পড়বে। মৃত ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার কাছে কি আমার রসূল যায়নি? তোমাকে কি সে আমার বাণী পৌঁছায়নি? আমি তোমাকে কি ধন সম্পদ দিইনি? তোমাকে কি বিভিন্ন মর্যাদায় ভূষিত করিনি? তা হলে তুমি তোমার জন্য আগাম কি পাঠিয়েছো? তখন সে ডানে ও বামে তাকাতে থাকবে? কিন্তু সে কিছুই দেখতে পাবেনা। তারপর সম্মুখে তাকাবে এবং সে নিজের সামনে জাহান্নাম দেখবে। সুতরাং একটা খেজুর দান করে হলেও যতটুকু পারো, সেই ভীষণ আগুন থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো। তাও যে পারবেনা, সে যেনো সুন্দর কথা বলে বিদায় দেয়, কারণ তা পূণ্য কাজের

স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। তার পূণ্য দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত হবে। তোমাদের প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত নেমে আসুক।"

ইবনে ইসহাক বলেন : অতপর তিনি এখানে আরেকটি নিম্নরূপ খুতবা দিয়েছিলেন :

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ○ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللّٰهُ فِي قَلْبِهِ وَأَدْخَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ فَاخْتَارَهُ مَا سِوَاهُ مِنْ أَحَادِيثِ النَّاسِ إِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغُهُ، أَحِبُّوا مَا أَحَبَّ اللّٰهُ، أَحِبُّوا اللّٰهَ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ وَلَا تَمَلُّوا كَلَامَ اللّٰهِ وَذِكْرِهِ وَلَا تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ سَمَّاهُ خِيَرَتَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالصَّالِحِ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلِّ مَا أُوتِيَ النَّاسُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ فَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَاصْدُقُوا لِلّٰهِ صَالِحَ مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَحَابُّوا بِرَوْحِ اللّٰهِ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ يَغْضَبُ أَنْ يُنْكَثَ عَهْدُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ -

অর্থ : সব প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে। তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁরই সাহায্য কামনা করছি। আমরা নিজের আত্মার ক্ষতি সাধন ও পাপ কার্য থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান কেউ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারেনা এবং তিনি যাকে বিভ্রান্ত করে দেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো প্রভু নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন। নি:সন্দেহে সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহ্র কালাম। আল্লাহ্ যার অন্তরকে তা দিয়ে অলংকৃত করেছেন এবং কুফরি থেকে যাকে ইসলামে এনেছেন, সে অবশ্যি সফল হয়েছে। অন্যান্য কথা থেকে এ কালামকে বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। কারণ এ হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আলংকরিক বাক্য। আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাসবে। নিজ অন্তরের সব ভালবাসা আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করো। আল্লাহ্র কালাম পাঠ ও তাঁর স্মরণ থেকে বিরত হয়ো না। তোমাদের অন্তর যেনো পাক কালামের বাপারে কঠিন হয়ে না যায়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা সেটাকে

উত্তম কাজ ও সর্বোত্তম বাণী আখ্যা দিয়েছেন। তাতে মানুষের জন্য যা কিছু হালাল বা হারাম করা হয়েছে, তা মওজুদ আছে। তাই আল্লাহ্র দাসত্ব করো। তাঁর সাথে কিছুমাত্র শরীক করোনা। তাঁকে ভয় করার মতো ভয় করো। আল্লাহ্র দয়ায় পরস্পরকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা ভংগকারীর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র তরফ থেকে শান্তি, বরকত ও রহমত নাযিল হোক।"

খুতবার অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত আরো তথ্য আলোচিত হবে।

জুমার দিনের মর্যাদা

বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : দুনিয়াতে আমরা শেষ উম্মত, কিন্তু আখিরাতে আমরাই সবার আগে থাকবো। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, এই পৃথিবীতে তারা আমাদের আগে কিতাব লাভ করেছে, আর আমরা লাভ করেছি তাদের পরে। জুমার দিনটি তাদেরই দিন ছিলো। কিন্তু তারা এ দিনটি নিয়ে মতভেদ করলো। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এই দিনটির সন্ধান দিলেন। অন্যরা এ বিষয়ে আমাদের পিছে পড়লো। ইহুদীরা শনিবারকে বেছে নিলো আর খৃষ্টানরা বেছে নিলো রোববারকে।'

সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সা. বলেছেন : সূর্যোদয়ের মাধ্যমে যেসব দিনের সূচনা হয়, তন্মধ্যে (অর্থাৎ সকল দিনের মধ্যে) জুমার দিন সর্বোত্তম। কারণ এই দিনই-

- আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
- এ দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে।
- এ দিনই তাঁকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে।
- আর জুমার দিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।"

ইবনে মাজাহ্র একটি বর্ণনায় এসেছে-

- 'এই দিনই আদমের মৃত্যু হয়েছে।'

দু'আ কবুলের এক পরম মুহূর্ত

বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : জুমার দিনে এমন একটি বিশেষ সময় রয়েছে, কোনো মুসলিম বান্দা যদি সে সময়টি পায় এবং আল্লাহ্র কাছে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যি তাকে তা দান করেন।"

- এই বিশেষ সময়টির ব্যাপারে বিশুদ্ধ সূত্রে আরো অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু সেই বিশেষ সময়টি কোন্ সময়? তা সুস্পভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কারণ বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন সময়ের কথা উল্লেখ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এই বিশেষ সময়টি নির্দিষ্ট নয়, বরং আবির্তত হয়। একেক সপ্তাহে একেক সময়ে সেই বিশেষ মুহূর্তটি আসে। যারা নির্দিষ্ট সময়ের কথা বর্ণনা করেছেন, তাদের বর্ণনা নিম্নরূপ :

১. ইবনে মানজার আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : সেই বিশেষ সময়টি হলো ফজেরর ওয়াক্ত শুরু হওয়া থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

২. ইবনে মানজার হাসান বসরি এবং আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন : সে সময়টি সূর্য হেলার সময়।

৩. ইবনে মানজার আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : সে সময়টি হলো, মুয়াযযিন কর্তৃক জুমার আযান দেয়ার সময়।

৪. ইবনে মানজার হাসান বসরি থেকে বর্ণনা করছেন, সে সময়টি হলো, ইমাম যখন খুতবা প্রদানের জন্যে মিম্বরে বসে, তখন থেকে খুতবা শেষ করা পর্যন্ত।

৫. আবু বুরদা বলেছেন সে সময়টি হলো জুমার নামাযের সময়।

৬. আবুস সাওয়ার আদভি বলেছেন, পূর্ববর্তী লোকেরা মনে করতেন, সে সময়টি হলো সূর্য হেলার পর থেকে নামাযের সময় পর্যন্ত।

৭. আবু যর বলেছেন, সময়টি হলো সূর্যোদয় থেকে সূর্য গজ খানেক উপরে উঠা পর্যন্ত।

৮. আবু হুরাইরা, আতা, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাউস্ বলেছেন, সে সময়টি হলো, আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৯. অধিকাংশ সাহাবি, তাবেয়ী এবং আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে, সে সময়টি হলো, আসরের পরে দিনের শেষ সময়টি ।

১০. ইমাম নববী প্রমুখ বলেছেন, সে সময়টি হলো, ইমাম মসজিদের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়া থেকে নিয়ে নামায শেষ করা পর্যন্ত।

১১. আল মুগণী প্রণেতা বলেছেন, সময়টি হলো, দিনের তৃতীয় ভাগ।

এই এগারটি মতের মধ্যে কেবল দুটি মতই প্রাধান্য পেতে পারে। ঐ দুটি মতের পক্ষেই আমরা সহীহ ও প্রমাণিত হাদিস পাই। সে দুটি মত হলো :

এক. ইমামের মিম্বরে বসার পর থেকে নামায শেষ করা পর্যন্ত। এই মতের দলিল হলো সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আবু বুরদার হাদিস। হযরত আবু মূসার পুত্র আবু বুরদা রা. বলেন, আমি আমার পিতার নিকট থেকে

শুনেছি, তিনি জুমার দিনের দু'আ কবুলের সেই বিশেষ সময়টি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সা.-কে বলতে শুনেছেন   সেই সময়টি হলো ইমাম মিম্বরে বসা থেকে নিয়ে নামায শেষ করা পর্যন্ত।

এ প্রসংগে আরেকটি সহীহ্ হাদিস হলো ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযি বর্ণিত আমর ইবনে আউফ আল মুযনির হাদিস। তিনি রসূলুল্লাহ্ সা.-কে বলতে শুনেছেন   জুমার দিনে এমন একটি সময় আছে, যখন বান্দা আল্লাহ্র কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ্ অবশ্যি তাকে তা দান করেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মুহূর্তটি কখন? তিনি বললেন : নামায (জুমার নামায) কায়েম হবার সূচনা থেকে নিয়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত।

দুই. দ্বিতীয় বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সে সময়টি হলো, আসরের নামায পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এই মতের পক্ষেও বিশুদ্ধ হাদিস রয়েছে। মুসনাদে আহমদে আবু সায়ীদ খুদরি রা. ও আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণির্ত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : দু'আ কবুলের সেই বিশেষ সময়টি হলো, আসরের পরে।

আবু দাউদ এবং নাসায়ীতে জাবির রা. থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন :

"আসরের পরে দিনের শেষ প্রান্তে সে সময়টিকে তালাশ করো।"

ইবনে মাজাহ্তে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

জুমার দিনের উত্তম বৈশিষ্টসমূহ

জুমার দিনের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সুস্পষ্ট। শুধুমাত্র আলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, আরাফা ও জুমার দিনের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? আমরা এখানে জুমার দিনের উত্তম বৈশিষ্টসমূহ তুলে ধরছি, যাতে করে জুমার দিনের মর্যাদা সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

এক. রসূলুল্লাহ্ সা. জুমার দিন ফজরের নামাযে সূরা আস্ সাজদা এবং সূরা আদদাহার (সূরা নং ৩২ ও ৭৬) পাঠ করতেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, রসূল সা. জুমার দিন ফজরের নামাযে এ সূরা দুটি পড়ার কারণ হলো এ দুটো সূরাতে সেইসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যা জুমার দিন সংঘটিত হয়েছে, বা হবে। যেমন আদম সৃষ্টি, পুণরুত্থান, হাশর, কিয়ামত ইত্যাদি। জুমাবারে এসব বিষয় লোকদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই রসূল সা. সেদিন সকালে এ সূরা দুটি পড়তেন।

দুই. এদিন রসূল সা.-এর উপর অধিক অধিক সালাত (দরূদ) পাঠ করা

মুস্তাহাব। তিনি বলেছেন তোমরা জুমার দিন আমার প্রতি বেশি বেশি সালাত পাঠ করো।

তিন. ইসলামের যৌথভাবে পালনীয় ফরয সমূহের মধ্যে জুমার নামায সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফরয। ইসলামের ফরয সমাবেশ সমূহের মধ্যে আরাফার সমাবেশ ছাড়া সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ জুমার নামাযের সমাবেশ।

চার. জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব। শুধুমাত্র হাম্বলী মযহাবের অভ্যন্তরে এদিন গোসল ওয়াজিব হবার ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ আছে।

পাঁচ. এই দিন সুগন্ধি ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং তা সপ্তাহের অন্যান্য দিনের সুগন্ধির তুলনায় উত্তম হওয়া চাই।

ছয়. এদিন মিসওয়াক করতে হবে এবং তা অন্যান্য দিনের তুলনায় অধিকতর উত্তমভাবে করতে হবে।

সাত. খুতবার আযানের পর নামাযের জন্যে আরেকটি আযান দেয়া এই দিনের বৈশিষ্ট্য।

আট. ইমামের মসজিদে আসা পর্যন্ত নামায, যিকর আযকার এবং কুরআন পাঠে মশগুল থাকা এদিনের বৈশিষ্ট্য।

নয়. নিরবে চুপ থেকে ইমামের খুতবা (ভাষণ) শুনা ওয়াজিব। কেউ চুপ না থাকলে তার জুমা ব্যর্থ হতে পারে।

দশ. সায়ীদ ইবনে মনসুর আবু সায়ীদ খুদরি রা. থেকে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. জুমার দিন সূরা কাহাফ পড়তে বলেছেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার পা থেকে আকাশ পর্যন্ত নূর বিছিয়ে দেয়া হবে। কিয়ামতের দিন তা থেকে সে আলো পাবে এবং এর বদৌলতে তার এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্তকার গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

এগার. ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে জুমার দিন সূর্য মাথার উপর এসে হেলার সময় নামায পড়া মাকরূহ নয়। তাঁরা হাদিসের ভিত্তিতে এমত গ্রহণ করেছেন।

বার. রসূলুল্লাহ্ সা. জুমার নামায সূরা জুমা ও সূরা মুনাফিকূন দিয়ে পড়তেন। কিংবা সাব্বাহা দিয়ে শুরু করা সূরা এবং সূরা গাশিয়া দিয়ে পড়তেন। অথবা সূরা জুমা ও সূরা গাশিয়া দিয়ে পড়তেন। তিনি পূর্ণ সূরা পাঠ করতেন, আংশিক নয়।

তের. জুমার দিন হলো সাপ্তাহিক ঈদ। সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন জুমার দিন সকল দিনের সর্দার এবং

আল্লাহ্র কাছে সর্বোত্তম দিন। এ দিনটি আল্লাহ্র কাছে ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর থেকেও উত্তম।

চৌদ্দ. রসূলুল্লাহ্ সা. জুমার দিন সাধ্যানুযায়ী উত্তম কাপড় চোপড় পরিধান করতে বলেছেন। মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহতে একথা বর্ণিত হয়েছে।

পনের. জুমার দিন মসজিদে ধূপ-দুনা জ্বালানো মুস্তাহাব। সায়ীদ ইবনে মনসুর নয়ীম ইবনে আবদুল্লাহ আর মেজমার থেকে বর্ণনা করেছেন : খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. প্রত্যেক জুমার দিন দুপুর হলে মসজিদে ধূপ-ধুনা জ্বালাবার নির্দেশ দিতেন।

ষোল. যে ব্যক্তির উপর জুমার নামায ফরয, তার জন্যে জুমার ওয়াক্ত আরম্ভ হলে সফরে রওয়ানা করা জায়েয নয়।

তবে কেউ কেউ বলেছেন, জিহাদ বা অন্য কোনো ইবাদতের কাজে হলে জায়েয।

সতের. যে ব্যক্তি জুমার নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের নফল রোযা এবং এক বছরের নফল নামাযের সওয়াব লাভ করে। ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে এ সম্পর্কে রসূল সা.-এর হাদিস উল্লেখ করেছেন।

আঠার. জুমার দিন হলো পাপ মোচনের দিন। মুসনাদে আহমদে সালমান ফারেসি রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : জুমার দিন যে ব্যক্তি ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে, তারপর মসজিদে এসে নিরবতা অবলম্বন করবে এবং ইমামের খুতবা ও নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সে নিরবে তা অনুসরণ করবে, তার একাজ পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার গুনাহের কাফফারা বলে গণ্য হবে।

উনিশ. জুমার দিন ছাড়া বাকি সব দিনই জাহান্নামের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। রসূল সা. বলেছেন, যেহেতু জুমার দিন সর্বোত্তম, সেজন্যে এদিন জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয়না।

বিশ. জুমার দিন দু'আ কবুল হবার একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, সে সময়টিতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্র দু'আ কবুল করে থাকেন। এ সময়টি সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

একুশ. এই দিন জুমার নামায পড়া হয়। মুসলিমদের বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ নামাযে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা হয়।

বাইশ. এই দিন জুমার নামাযের পূর্বে ইমাম (নেতা) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ (খুতবা) প্রদান করেন। এই ভাষণে আল্লাহ্র একত্ব ও

মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের স্বীকৃতি ঘোষণা প্রদান করা হয়। মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় এবং তাদেরকে উপদেশ প্রদান করা হয়।

তেইশ. জুমার দিন ইবাদতের জন্যে অবসর (ছুটি) গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্যে মুস্তাহাব।

চব্বিশ. বার্ষিক দুই ঈদের মতোই জুমার দিন মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন।

পঁচিশ. জুমার দিন দান খয়রাত করা অন্যান্য দিনের চাইতে অধিক সওয়াবের কাজ। অন্যান্য মাসের তুলনায় রমযানের দানে যেমন অধিক সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি অন্যান্য দিনের তুলনায় জুমার দিনের দানে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়।

ছাব্বিশ. জুমার দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর নূরের দ্যুতি দেখাবেন। যারা ইমামের কাছাকাছি বসবে এবং জুমার নামাযের জন্যে তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিয়ে বের হবে, তারা আল্লাহ্র অধিক নৈকট্য লাভ করবে এবং সবার আগে আল্লাহ্কে দেখতে পাবে। একথাগুলো বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

সাতাশ. বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, কিয়ামতের দিন হলো- 'ইয়ওমুল মাওউদ'। আরাফার দিন হলো- 'ইয়াওমুল মাশহুদ'। আর জুমার দিন হলো- 'ইয়াওমুশ শাহিদ'।

আটাশ. জুমার দিন হলো, মুসলিম উম্মাহ্র সাপ্তাহিক সভার দিন। এটা আল্লাহ্ তা'আলাই উম্মতের জন্যে ফরয করে দিয়েছেন।

উনত্রিশ. কা'ব রা. বর্ণনা করেছেন, জুমার দিন মানুষ আর শয়তান ছাড়া আসমান, যমীন, পাহাড়, সাগর এমনকি আল্লাহ্র সকল সৃষ্টিই ভয়ে কাঁপে।

ত্রিশ. জুমার দিনটি আল্লাহ্র মনোনীত দিন।

একত্রিশ. জুমার দিন মানুষের আত্মাগুলো কবরের কাছে আসে বলে বর্ণিত হয়েছে।

বত্রিশ. ইমাম আহমদ বলেছেন, শুধুমাত্র জুমার দিন রোযা রাখা মাকরূহ। অর্থাৎ বেছে বেছে শুধুমাত্র জুমার দিন রোযা রাখাটা মাকরূহ। অবশ্য অন্যান্য ইমাম জুমার দিন রোযা রাখাকে মুবাহ বলেছেন।

রসূলুল্লাহ্র জুমার নামায

রসূলুল্লাহ্ সা. জুমার নামায দুই রাকাত পড়েছেন এবং তাতে সশব্দে কিরাত পড়েছেন। জুমার নামায ফরয সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ফরয। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন :

এই কয় ধরণের লোক ছাড়া বাকি সকল মুসলমানের জন্যে জুমার নামায ফরয। সেই কয় ধরণের লোক হলো : ১. কৃতদাস, ২. নারী, ৩. শিশু, ৪. রোগী, ৫. মুসাফির (ভ্রমণরত ব্যক্তি) ও ৬. পাগল।"

- হাদিসটি দারু কুতনি বর্ণনা করেছেন জাবির রা.-এর সূত্রে এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন তারিক ইবনে শিহাব-এর সূত্রে।

- রসূলুল্লাহ্ সা. জুমার নামাযে প্রায়ই সূরা আস সাজদা, সূরা দাহার, সূরা জুমা, সূরা গাশিয়া ও সূরা মুনাফিকূন পড়তেন।

- তিনি সূর্য হেলার পরে জুমার নামায পড়তেন। (বুখারি)

- তিনি প্রচণ্ড শীতের সময় জুমার নামায আগেভাগে পড়তেন আর প্রচণ্ড গরমের সময় বিলম্বে পড়তেন। (বুখারি)

- তিনি আগে খুতবা প্রদান করতেন, তারপর নামায পড়তেন। (বুখারি)

- তিনি নামায দীর্ঘ এবং খুতবা সংক্ষেপ করতে বলেছেন। (মুসলিম)

তাঁর খুতবা এবং নামায দুটোই মধ্যম রকম ছিলো- না দীর্ঘ ছিলো, না হ্রস্ব। (সহীহ মুসলিম)

- তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাত পেলো, সে পুরো নামায পেলো। (বুখারি মুসলিম)

রসূলুল্লাহ্র জুমা খুতবার (ভাষণের) অনুষ্ঠান

- রসূলুল্লাহ্ সা. নামাযের আগেই খুতবা প্রদান করতেন।

- তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

- তিনি দুটি খুতবা প্রদান করতেন এবং প্রথম খুতবার পর কিছুক্ষণ নিরবে বসতেন, তারপর উঠে দ্বিতীয় খুতবা দিতেন।

তিনি মিম্বরে উঠে বসার পর মুয়াযযিন আযান দিতো। মুয়াযযিনের আযান শেষ হবার পর তিনি দাঁড়াতেন এবং খুতবা দিতে শুরু করতেন।

- মিম্বর তৈরি হবার আগে তিনি খেজুরের ডালে ভর করে দাঁড়াতেন। তীর এবং তীরের ধনুকে ঠেস দিয়েও কখনো কখনো দাঁড়াতেন।

- তারপর মিম্বর তৈরি হলো। তখন থেকে তিনি মিম্বরে দাঁড়াতেন। মিম্বরটি মসজিদের মাঝখানে নয়, বরং দেয়াল ঘেঁষে বসানো ছিলো। মিম্বর ও দেয়ালের মাঝখানে একটি বকরী যাতায়াতের ফাঁক ছিলো।

- মিম্বর তৈরি হবার পর তিনি কখনো তীর, তলোয়ার বা খেজুর ডালে ভর দিয়ে দাঁড়াননি। তলোয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন বলেও প্রমাণ নেই।

- তিনি যখন মিম্বরে উঠতেন, তখন সাহাবায়ে কিরামের দিকে মুখ করে

বসতেন। তাদের মুখোমুখি বসতেন এবং দাঁড়াতেন।

- কোনো কাজের নির্দেশ দেবার বা কোনো কাজ নিষেধ করবার প্রয়োজন হলে তিনি খুতবার ভিতরেই তা করতেন। একবার খুতবা প্রদানরত অবস্থাতেই একজন সাহাবিকে বললেন : দু'রাকাত নামায পড়ে নাও।

- একবার এক সাহাবি গর্দান উঁচু করলে তিনি খুতবার মধ্যেই তাকে বসে পড়তে বলেন।

- কখনো কখনো খুতবার মাঝখানে সাহাবিদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। তারপর খুতবার বাকি অংশ শেষ করতেন।

- কখনো খুতবা প্রদান কালে তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসতেন। তারপর প্রয়োজন সেরে আবার মিম্বরে গিয়ে অসমাপ্ত খুতবা সম্পন্ন করতেন। একবার খুতবা চলাকালে হাসান হুসাইন মসজিদে আসে। তিনি মিম্বর থেকে নেমে গিয়ে তাদের কোলে নেন। তারপর মিম্বরে এসে তাদের কোলে রেখেই খুতবার বাকি অংশ শেষ করেন।

- কখনো খুতবা চলাকালে কাউকেও বলতেন   হে অমুক! বসে পড়ো। কাউকেও রোদের থেকে ছায়ায় আসতে বলতেন।

- সবলোক এলে তিনি খুতবা প্রদান করতেন।

খুতবার পূর্বক্ষণে তিনি একাই অনাড়ম্বরভাবে নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেন। তাঁর আগে পিছে কোনো ঘোষক থাকতোনা।

- মসজিদে ঢুকে নিজেই আগে সাহাবিদের সালাম দিতেন।

- মিম্বরে বসার সময় সবার দিকে দৃষ্টি ফিরাতেন, সালাম দিতেন।

- তিনি বসা মাত্র বিলাল আযান দিতেন। আযান শেষ হওয়া মাত্র তিনি খুতবা শুরু করতেন।

- তিনি জুমার দিন মসজিদে এসে লোকদের নিরব থাকতে বলতেন। তিনি বলেছেন : জুমায় তিন ধরণের লোক উপস্থিত হয় :

এক. বাজে কথার লোক। সে বাজে ও বেহুদা কথা বলে।

দুই. আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করার লোক। তার প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করতেও পারেন, নাও করতে পারেন।

তিন : এমন ব্যক্তি, যে নিরব থাকে, কাউকেও ডিংগায় না, কাউকেও বিরক্ত করেনা, কষ্ট দেয়না এবং কায়মনবাক্যে ইবাদতে মশগুল থাকে। তার এসব আমল পরবর্তী জুমা পর্যন্ত পাপের কাফফারা হয়ে যায়। তাছাড়া সে অতিরিক্ত তিন দিনের সওয়াবও পায়।'

- কখনো খুতবা দেয়ার সময় তাঁর দুচোখ লাল হয়ে যেতো। আওয়ায উঁচু হয়ে পড়তো। মনে হতো তিনি যেনো কোনো আক্রমণকারী শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজ বাহিনীকে সতর্ক করছেন।

- তাঁর খুতবা ছিলো সংক্ষিপ্ত, নামায ছিলো লম্বা।

তিনি খুতবায় কি বলতেন?

রসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর জুমার ভাষণে (খুতবায়) ঈমানের মূলনীতি বর্ণনা করতেন। তাওহীদ, রিসালাতের তাৎপর্য বর্ণনা করতেন। জান্নাত-জাহান্নামসহ পরকালের বিস্তারিত অবস্থা তুলে ধরতেন। আল্লাহ্র কিতাব অনুসরণের কথা বলতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধু ও অনুগতদের জন্যে যেসব নি'আমত তৈরি করে রেখেছেন, সেগুলোর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিতেন। আল্লাহ্র দুশমন ও নাফরমানদের জন্যে তিনি যেসব শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সেগুলোর ভয়ানক চিত্র তুলে ধরতেন।

ফলে তাঁর বক্তব্য শুনে শ্রোতাদের হৃদয় প্রভাবিত ও বিগলিত হতো। তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেতো। আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও পুরস্কার লাভের জন্যে সকলের মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো। এতে তারা আল্লাহ্র আনুগত্যের জীবন যাপন করতো। আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতকে সর্বোর্ধ্বে স্থান দিতো।

তিনি তাঁর খুতবায় বেশি বেশি কুরআনের আয়াত পাঠ করতেন। আখিরাতের চিত্র সম্বলিত সূরা কাফ' খুব বেশি পাঠ করতেন। উম্মে হিশাম বিনতে হারিস বিন নুমান বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা.-এর খুতবা শুনে শুনে আমি 'সূরা কাফ' মুখস্ত করেছি।

খুতবার শুরুতে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার যথোপযুক্ত হামদ-ছানা পাঠ করতেন। কখনো তাওহীদ রিসালাতের ঘোষণাও দিতেন। তারপর বলতেন : 'আম্মা বা'দ (অতপর শুনো)'।

তারপর কখনো বলতেন :

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - (مسلم)

অর্থ সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব। সর্বোত্তম রীতিনীতি হচ্ছে মুহাম্মদের রীতিনীতি। সব কাজের মধ্যে নিকৃষ্ট কাজ হলো বিদআত (দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত জিনিস)।

- এই ধারায় তিনি আরো কিছু কথা বলতেন।

অপর বর্ণনায় আছে, হামদ ও সানার পর তিনি বলতেন :

مَن يَّهْدِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ. (صحيح مسلم) وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ. (نسائي)

অর্থ আল্লাহ্ যাকে সঠিক পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারেনা। আর আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ সঠিক পথে আনতে পারেনা। সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব (সহীহ্ মুসলিম)। প্রত্যেকটি বিদআতই বিপথগামিতা। আর প্রত্যেক বিপথগামীতাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (নাসায়ী)

আবু দাউদে তাঁর একটি খুতবা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَعِيْنُهُ وَاَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُبِا للّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَن يَّهْدِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَن يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমি তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা থেকে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে সঠিক পথ দেখান, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারেনা। আর আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন, কেউ তাকে হিদায়াত করতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ্ ছাড়া। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি- মুহাম্মদ তাঁর দাস ও রসূল। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাকে মহাসত্য দিয়ে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলো, সে সঠিক পথ পেলো। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের

অবাধ্য হলো, সে নিজের ছাড়া আর কারো ক্ষতি করেনা। আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি সে করতে পারেনা।" (আবু দাউদ)

তাঁর আরেকটি খুতবা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে :

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَصِلُوْا الَّذِىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهٗ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُؤْجَرُوْا وَتُحْمَدُوْا وَتُرْزَقُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِيْضَةً مَّكْتُوْبَةً فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا وَفِىْ شَهْرِىْ هٰذَا فِىْ عَامِىْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ وَجَدَ اِلَيْهَا سَبِيْلًا، فَمَنْ تَرَكَهَا فِىْ حَيَاتِىْ اَوْ بَعْدَ مَمَاتِىْ جُحُوْدًا بِهَا اَوْ اِسْتِخْفَافًا بِهَا وَلَهٗ اِمَامٌ جَائِرٌ اَوْ عَادِلٌ فَلَا جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهٗ وَلَا بَارَكَ لَهٗ فِىْ اَمْرِهٖ، اَلَا وَلَا صَلٰوةَ لَهٗ، اَلَا وَلَا وُضُوْءَ لَهٗ، اَلَا وَلَا صَوْمَ لَهٗ، اَلَا وَلَا زَكَاةَ لَهٗ، اَلَا وَلَا حَجَّ لَهٗ، اَلَا وَلَا بَرَكَةَ لَهٗ حَتّٰى يَتُوْبَ، فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ.

অর্থ : মৃত্যুর পূর্বেই তোমরা মহান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসো। ভালো ও পূণ্যের কাজে দৌড়ে চলো। বেশি বেশি আল্লাহ্‌র যিকর এবং গোপন ও প্রকাশ্য দানের মাধ্যমে তোমাদের ও তোমাদের প্রভুর মধ্যে সম্পর্ক জুড়ে নাও। এমনটি করলে তোমরা পুরস্কৃত হবে, প্রশংসিত হবে এবং জীবিকাপ্রাপ্ত হবে। জেনে রাখো, মহান আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে জুমা ফরয করে দিয়েছেন। এ স্থানে, এ শহরে এবং এ বছর জুমা ফরয হলেও তা কিয়ামত পর্যন্ত ফরয থাকবে এমন সব ব্যক্তির জন্যে যারা মসজিদে পৌঁছতে পারবে। কোনো ব্যক্তি যদি তার ন্যায়পরায়ণ কিংবা যালিম নেতা থাকা সত্ত্বেও আমার জীবদ্দশায়, কিংবা আমার মৃত্যুর পর হালকা ভেবে জুমা ত্যাগ করে, কিংবা অস্বীকার করে, তার জীবন আল্লাহ্ তা'আলা ব্যর্থ করে দেবেন। তার কাজে বরকত হবেনা। তার নামায হবেনা, তার অযু হবেনা, তার রোযা হবেনা, তার যাকাত হবেনা, তার হজ্জ হবেনা, তার কোনো কিছুতে বরকত হবেনা- যতোক্ষণ না সে তওবা করে। সে যদি তওবা করে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করবেন।"

এটি বর্ণনা করেছেন আলী বিন যায়েদ বিন জুদআন। বর্ণনাটিতে দুর্বলতা আছে।

রসূলুল্লাহ্ সা.-এর খুতবা ছিলো প্রাণবন্ত। তাঁর খুতবায় লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসায় উদ্বেলিত হতো। তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষণ মানুষকে আল্লাহ্‌র

সান্নিধ্য লাভের প্রেরণায় ব্যাকুল করে তুলতো। তাতে তাদের তরবিয়ত লাভ হতো, তাদের আখলাক উন্নত হতো এবং দীন ও শরীয়তের জ্ঞান অর্জিত হতো।

আজকাল লোকেরা যেসব খুতবা প্রদান করে, তাতে খুতবার সেই প্রাণ নেই। আজকালকার লোকদের খুতবা প্রাণহীন বাহ্যিক চাকচিক্যে ভরা।

জুমার সুন্নত নামায

রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সময় জুমার নামাযে একটি আযান ও একটি ইকামত হতো। অবশ্য এ দুটিকে প্রথম আযান ও দ্বিতীয় আযান বলা হতো।

রসূলুল্লাহ্ সা. নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি মিম্বরে বসতেন। তাঁর মিম্বরে বসার সাথে সাথে বিলাল জুমার আযান দিতেন। বিলালের আযান শেষ হবার সাথে সাথে রসূলুল্লাহ্ সা. খুতবা শুরু করতেন। সুতরাং জুমার নামাযের পূর্বে কোনো সুন্নত নামায থাকার প্রমাণ হয়না।

জুমার নামাযের পূর্বে সুন্নত নামায থাকা না থাকার ব্যাপারে আলিমগণের দুটি মত পাওয়া যায়। এ দুটি মতের মধ্যে উপরোক্ত মতটিই হলো বিশুদ্ধ এবং সুন্নতে রসূল থেকে প্রমাণিত। অর্থাৎ জুমার নামাযের পূর্বে কোনো সুন্নত নামায নেই।

একদল লোক মনে করেন, বিলালের আযান শেষ হলে সবাই উঠে দুই রাকাত নামায পড়তো। আসলে এ ধারণাটি সুন্নতে রসূল সম্পর্ক অজ্ঞতারই বহিপ্রকাশ।

একথা সুস্পষ্ট যে, জুমার নামাযের আগে কোনো সুন্নত নামায নেই। ইমাম মালিকের এটাই মত। ইমাম আহমদেরও মশহুর কওল এটাই। ইমাম শাফেয়ীর শাগরেদগণেরও একদলের মত এটাই।

যারা মনে করেন জুমার নামাযের পূর্বে সুন্নত নামায আছে, তারা জুমার নামাযকে যুহর নামাযের সংক্ষিপ্ত রূপ মনে করেন। তাই তারা জুমার জন্যে যুহরের নিয়ম প্রযোজ্য বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁদের এই যুক্তি একান্তই দুর্বল। এর কোনো ভিত্তি নেই।

মুলত জুমার নামায সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি নামায। যুহর নামায থেকে এর স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কার। এ নামায সশব্দে পড়া হয়, এ নামায দুই রাকাত, এ নামাযে খুতবা আছে এবং কতিপয় শর্ত আছে। এসবই যুহর নামাযে অনুপস্থিত। সুতরাং এ নামাযকে যুহর নামাযের সংক্ষিপ্তরূপ ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই।

তাই যারা যুহর নামাযের উপর কিয়াস করে জুমার পূর্বেও সুন্নত আছে বলে ধরে নেন, তাদের কিয়াস বাতিল। কারণ সুন্নত তো প্রমাণিত হতে হবে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর কথা, কাজ ও সমর্থন থেকে, কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে। কিন্তু এখানে সেরকম কোনো প্রমাণ নেই।

বরং জুমার নামাযের পূর্বে সুন্নত নামায না পড়ার সুন্নতই রসূল সা. থেকে প্রমাণিত। যেমন, ঈদের নামাযের আগে পরে আর কোনো নামায না পড়াই তাঁর থেকে প্রমাণিত। সুতরাং জুমার নামাযের পূর্বে সুন্নত নামায না পড়াটাই সুন্নত।

যারা জুমার পূর্বে সুন্নত নামায আছে বলে ধারণা করেন, তাঁরা বুখারির 'জুমার আগে-পরে নামায' অনুচ্ছেদের একটি হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। এই অনুচ্ছেদে ইমাম বুখারি সনদসহ ইবনে উমর রা. থেকে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্ সা.-

যুহরের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়তেন,
যুহরের পরে দুই রাকাত নামায পড়তেন,
মাগরিবের পরে তাঁর ঘরে দুই রাকাত নামায পড়তেন,
ইশার পরে দুই রাকাত নামায পড়তেন এবং
জুমার পরে ঘরে বসে দুই রাকাত নামায পড়তেন।"

-এই হাদিসটি জুমার নামাযের পূর্বে সুন্নত নামায থাকার প্রমাণ করেনা। হাদিসটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, ইমাম বুখারি হাদিসটির শিরোনাম 'জুমার আগে পরের নামায' দেয়ার অর্থই হলো, যারা মনে করে জুমার আগে নামায আছে, তাদের ধারণা সঠিক নয়।

-বুখারির এই হাদিসটি থেকে একথাও সুপ্রমাণিত হয় যে, জুমার নামায যুহরের সংক্ষিপ্ত রূপ নয়, বরং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নামায। হাদিসে জুমার নামাযকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নামায হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

-আবু দাউদে নাফে রা. থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : ইবনে উমর রা. জুমার আগে লম্বা নামায পড়তেন এবং জুমার পরে ঘরে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়তেন।

-এই হাদিস জুমার আগে সুন্নত নামায থাকা প্রমাণ করেনা। ইবনে উমর রা. জুমার আগে যে লম্বা নামায পড়েছেন, তা ছিলো সাধারণ নফল নামায। আযান দেয়া বা ইমাম আসার আগে যে ব্যক্তিই মসজিদে হাযির হবে, তার নফল নামায পড়তে থাকা উত্তম।

-এখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, রসূল সা. এর আমল সম্পর্কে ইবনে

উমরের বর্ণনা এবং ইবনে উমরের আমল সম্পর্কে তাঁর মুক্তদাস নাফের বর্ণনার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ইবনে উমর রসূল সা.-এর সুন্নত বর্ণনা করেছেন, তিনি জুমার পর দুই রাকাত নামায ঘরে গিয়ে পড়তেন। আর নাফে ইবনে উমরের সাধারণ নফলের কথা বর্ণনা করেছেন। যা তিনি আগে ভাগে মসজিদে এসে পড়তেন।

-একথাও বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত, রসূল সা.-এর খুতবা প্রদানকালে একজন সাহাবি মসজিদে এসে বসে পড়লে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, মসজিদে প্রবেশ করে তুমি কি দু'রাকাত নামায পড়েছো? সাহাবি বললেন, জী-না। তখন রসূল সা. বললেন : উঠে দুই রাকাত নামায পড়ো।' তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ খুতবা প্রদানকালেও মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেনো দুই রাকাত নামায পড়ে নেয়।"

-এই দুই রাকাত নামায যে জুমার সুন্নত নয়, বরং এ যে মসজিদে প্রবেশের (তাহিয়্যাতুল মসজিদের) নামায, তা হাদিসের ভাষা ও বক্তব্য থেকে পরিষ্কার।

জুমার দিন আগে ভাগে মসজিদে এসে নফল নামায পড়ার জন্যে রসূল সা. উৎসাহিত করেছেন। এর ফযীলতও তিনি বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই আগে ভাগে মসজিদে এসে নফল নামায পড়তেন। ইবনে মানজার বলেন, আমার কাছে বর্ণনা পৌছেছে, জুমার আগে ইবনে উমর রা. বার রাকাত নামায পড়তেন এবং ইবনে মাসউদ রা. আট রাকাত নামায পড়তেন।

-ইবনে মাজাহ্‌তে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. জুমার আগে এক সালামে চার রাকাত নামায পড়তেন।' এ হাদিসটির সনদ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

-রসূলুল্লাহ্ সা. জুমার নামায পড়ে ঘরে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়তেন। মূলত এ দু'রাকাতই জুমার সুন্নত।

-অবশ্য রসূল সা. জুমার পরে চার রাকাত নামায পড়ার কথা বলেছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। (সহীহ্ মুসলিম)

-ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, জুমার পরে কেউ যদি সুন্নত নামায মসজিদে পড়ে, তবে চার রাকাত পড়বে। আর যে সুন্নত নামায ঘরে গিয়ে পড়ে, সে দুই রাকাত পড়বে। মূলত হাদিস থেকে একথারই প্রমাণ মেলে। আবু দাউদে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : তিনি ঘরে পড়লে দুই রাকাত পড়তেন আর মসজিদে পড়লে চার রাকাত পড়তেন।

●●●

৭

কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ নামায)

তাহাজ্জুদ কি রসূল সা.-এর জন্যে ফরয ছিলো?

রসূলুল্লাহ্ সা.-এর জন্যে তাহাজ্জুদ নামায ফরয ছিলো কিনা?- এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামা ও মুজতাহিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। তাঁদের কারো মতে রসূল সা.-এর জন্যে তাহাজ্জুদ ফরয ছিলো। কারো মতে ছিলো নফল। উভয় পক্ষেই এ আয়াতটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন :

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

অর্থ : রাতের কিছু অংশ জেগে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ো। এটা তোমার জন্যে নফল (অতিরিক্ত)।" (সূরা ১৭ ইস্‌রা : আয়াত ৭৯)

এক পক্ষ মনে করেন, রাত জেগে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়া যে ফরয নয়, বরং নফল- এ আয়াত তার অকাট্য প্রমাণ।

অপর পক্ষ মনে করেন, এ আয়াতে তাঁকে রাত জেগে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তাই এটা তাঁর জন্যে ফরয। সূরা মুয্‌যাম্মিলের প্রথম দুই আয়াতেও তাঁকে একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا -

অর্থ : হে আচ্ছাদিত! কিছু অংশ বাদে বাকি রাত কিয়ামুল লাইল করো।"

এই দুই জায়গায় তাঁকে রাত জেগে নামায পড়তে বলা হয়েছে এবং এই হুকুম তাঁর জন্যে রহিত করা হয়নি। তাই তাঁর জন্যে তাহাজ্জুদ ফরয ছিলো।

প্রথম আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'এটা তোমার জন্যে নফল (অতিরিক্ত)' এখানে নফল মানে 'নফল নামায' নয়, বরং এখানে নফল শব্দটি অতিরিক্ত অর্থে এসেছে। অর্থাৎ রাত জেগে নামায পড়ার এই নির্দেশটা তোমার জন্যে অতিরিক্ত। এই নামায রসূলুল্লাহ্ সা.-এর মর্যাদা ও পুরষ্কারের জন্যে একটি অতিরিক্ত নামায।

অন্যদের জন্যে রাত জেগে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়াটা মুবাহ্ (বৈধ) এবং তাদের গুনাহের কাফ্‌ফারা (ক্ষতিপূরণ) স্বরূপ।

রসূলুল্লাহ্ সা.-এর আগে পরের সব গুনাহ্ই আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। তাই তাঁকে এ নামায পড়তে বলা হয়েছে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্যে। আর তাঁর উম্মতের জন্যে এ নামায গুনাহ্ থেকে মুক্তির উপায়।

আমাদের মতে, এখানে নফল (অতিরিক্ত) শব্দ দ্বারা এমন নামায বুঝানো হয়নি- যা জায়েয, যা পড়লেও চলে, না পড়লেও চলে।

রসূলুল্লাহ্ সা. আবাসে কিংবা প্রবাসে কখনো তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতেন না। যদি কখনো নিদ্রা অথবা অসুস্থতার কারণে রাত্রে বাদ পড়তো, দিনের বেলা পড়ে নিতেন।

তিনি তাহাজ্জুদ কতো রাকাত পড়তেন?

রসূলুল্লাহ্ সা. রাত্রে কতো রাকাত নামায পড়তেন, তা বুঝার জন্যে প্রথমে একথা মনে রাখতে হবে যে, রসূলুল্লাহ্ সা. রাত্রের শেষার্ধে তিন প্রকার নামায পড়তেন। অর্থাৎ-

-তাহাজ্জুদ নাামায।

-বিতির নামায এবং

-ফজরের সুন্নত দুই রাকাত।

এই তিনটি নামায তিনি কখনো একই সময়, আবার কখনো কিছুটা পৃথক সময়ে পড়তেন বলে তাহাজ্জুদ এবং বিতিরের রাকাত সংখ্যা নির্ণয়ে কিছুটা মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যিনি যে কয় রাকাত পড়তে দেখেছেন, তিনি সে কয় রাকাতের কথাই বর্ণনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে আয়েশা রা. এবং ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনাই বিশুদ্ধ।

বুখারি ও মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ্ সা. ইশার নামায থেকে ফারেগ হবার পর ফজর পর্যন্ত এগার রাকাত নামায পড়তেন। দুই রাকাত পর পর সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকাত দ্বারা বিতির করতেন। এই নামাযে তাঁর একেকটি সাজদা হতো তোমাদের পঞ্চাশ আয়াত কুরআন পড়ার সমান দীর্ঘ। অতপর মুয়াজ্জিন ফজরের আযান শেষ করলে দুই রাকাত হালকা নামায পড়ে ডান পাশে কাত হয়ে ফজরের ইকামত পর্যন্ত বিশ্রাম নিতেন।'

সহীহ মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে আরেকটি হাদিস উল্লেখ হয়েছে, তাতে আয়েশা রা. বলেন : রসূলুল্লাহ্ সা. রাত্রে তের রাকাত নামায পড়তেন। এর মধ্যে বিতিরও থাকতো এবং ফজরের দুই রাকাতও থাকতো।'

বুখারি ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক

রাত্রে তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা রা.-এর ঘরে রাত্রি যাপন করেন। রাত্রে রসূলুল্লাহ্ সা.-কে নামায পড়তে দেখে তিনিও উঠে তাঁর সাথে নামায পড়েন। তিনি বলেন, এসময় রসূল সা. মোটমাট তের রাকাত নামায পড়ে বিশ্রাম নেন। অতপর বেলাল ইকামত দিলে উঠে গিয়ে ফজরের নামায পড়ান।

বুখারি ও মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আয়েশা রা. বলেন : রমযান কিংবা গায়রে রমযান, কখনো রসূলুল্লাহ্ সা. রাতের নামায এগার রাকাতের বেশি পড়েননি।'

আয়েশার এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। তবে উপরে তের রাকাতের যে বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে, তা ফজরের দুই রাকাত সহ।

কোনো কোনো বর্ণনায় তের রাকাতের পর দুই রাকাত পড়েছেন বলে উল্লেখ হয়েছে। এ বর্ণনাটি এসেছে বুখারিতে। তবে মুসলিমের বর্ণনায় ফজরের দুই রাকাতসহ তের রাকাত পড়তেন বলে উল্লেখ হয়েছে।

বুখারি ও মুসলিমে কাসিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.-কে বলতে শুনেছি : রসূলুল্লাহ্ সা.-এর রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) ছিলো মূলত দশ রাকাত। সেই সাথে এক সাজদায় বিতির পড়তেন, অতপর ফজরের দুই রাকাত পড়তেন। সর্বমোট পড়তেন তের রাকাত।'

-এই বর্ণনাটি সুস্পষ্ট।

ইমাম শা'বী বলেছেন, আমি আবুদল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা দু'জনই আমাকে বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা.-এর রাতের নামায ছিলো তের রাকাত। এর মধ্যে আট রাকাত তাহাজ্জুদ, তিন রাকাত বিতির আর দুই রাকাত ফজরের সুন্নত।'

বর্ণনাগত কিছু তারতম্য থাকলেও এ সংক্রান্ত সবগুলো হাদিস ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, মূলত রসূলুল্লাহ্ সা. (ফজরের সুন্নত দুই রাকাত বাদে) রাতের নামায (বিতিরসহ) এগার রাকাত পড়তেন।[৩৫]

---

৩৫. এযাবতকার আলোচনা থেকে বিতির নামায এক রাকাত না তিন রাকাত সে বিষয়ে কিছুটা সংশয় দেখা দিতে পারে। তবে বিতির সহ তাহাজ্জুদের রাকাত সংক্রান্ত আরেকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করছি :

মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা.-কে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর রাতের নামায (-এর রাকাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি আমাকে বলেছেন : ফজরের দুই রাকাত ছাড়া রসূলুল্লাহ্ সা. রাতের নামায ছিলো সাত, নয় এবং এগার রাকাত। (সহীহ বুখারি)

রসুল সা. রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) কখন পড়তেন?

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ সা. রাতের নামায পড়ার জন্যে-

-কখনো অর্ধরাত্রে উঠতেন।
-কখনো অর্ধরাতের কিছু আগে উঠতেন।
-কখনো অর্ধরাতের কিছু পরে উঠতেন।
-কখনো মোরগের পয়লা ডাক শুনে উঠতেন। অর্থাৎ রাতের দুই তৃতীয়াংশের মাথায়।

রাতের নামায তিনি কখনো ধারাবাহিকভাবে পড়ে শেষ করতেন। আবার কখনো বিচ্ছিন্নভাবে পড়তেন। বিচ্ছিন্নভাবে মানে-দুই রাকাত পড়ে ঘুমাতেন, আবার উঠে অযু-মিসওয়াক করে দুই রাকাত পড়তেন। আবার ঘুমাতেন, আবার উঠতেন- এভাবে শেষ করতেন।

তিনি রাতের নামাযের জন্যে উঠলে প্রথমে হালকা দুই রাকাত পড়তেন। সাহাবিগণকেও এই হালকা দুই রাকাত পড়তে বলতেন।[৩৬] তারপরের রাকাতগুলো দীর্ঘ করতেন।

আয়েশা এবং ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. ইশার নামায পড়িয়ে ঘরে এসে কিছু (দুই বা চার রাকাত) নামায পড়তেন। কিছু নামায পড়েই তিনি ঘুমাতেন।

তিনি রাতের নামাযের জন্যে ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করতেন, অযু করতেন, আল্লাহ্কে স্মরণ করতেন, কিছু দু'আ কালাম পড়তেন, তারপর নামায পড়তেন।

তাহাজ্জুদের সময় এবং তাহাজ্জুদ নামাযে কী পড়তেন?

বুখারি ও মুসলিমে একাধিক সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) পড়তে উঠে অযু করার আগেই আকাশ পানে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরানের শেষ (রুকূর) আয়াতগুলো পাঠ করতেন। আয়াতগুলো হলো :

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ○ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج

---

৩৬. এই দুই রাকাতের পরিচয় স্পষ্ট নয়। তবে প্রথমে হালকা দুই রাকাতের কথা বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। এই দুই রাকাত তাহাজ্জুদের পয়লা দুই রাকাতও হতে পারে, অথবা তাহিয়্যাতুল অযুও হতে পারে।

سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ط
وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا
بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ○
رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ○ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ
اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا
فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ
الثَّوَابِ ○ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ○ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف ثُمَّ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ
خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ○ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ
اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لا لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط اُولٰٓئِكَ
لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا
وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

অর্থ : পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া আসার মধ্যে সেইসব বুদ্ধি-বিবেকওয়ালা লোকদের জন্যে রয়েছে অনেক অনেক নিদর্শন, যারা উঠতে, বসতে, শয়নে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে। (তারা স্বত:স্ফূর্তই বলে উঠে :) হে আমাদের প্রভু! এসব কিছু তুমি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করোনি। অবশ্যি তুমি নিরর্থক কাজ করার ক্রটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত-পবিত্র। তাই হে প্রভু! জাহান্নামের আযাব (torment) থেকে আমাদের রক্ষা করো। প্রভু, তুমি যাকে জাহান্নামে ফেলবে, তাকে অবশ্যি চরম অপদস্থ করে ছাড়বে, আর এসব যালিমদের তো কোনো সাহায্যকারী হবেনা। আমাদের মনিব! আমরা একজন

আহ্বানকারীকে 'তোমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনো' বলে আহ্বান করতে শুনেছি। আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি। তাই হে প্রভু! আমাদের পাপসমূহ মাফ করে দাও, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে দাও আর আমাদের ওফাত দান করো উত্তম লোকদের সাথে। আমাদের মালিক! তোমার রসূলদের মাধ্যমে তুমি আমাদের সাথে যেসব ওয়াদা করেছো, সেগুলো আমাদের প্রদান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের অপদস্থ করোনা। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ করোনা অংগীকার।' (প্রার্থনা কবুল করে) তাদের প্রভু বলেন : আমি বিনষ্ট করবোনা তোমাদের আমলকারীর আমল, চাই সে নর হোক কিংবা নারী, তোমাদের একজন তো আরেকজন থেকে, তাই যারাই হিজরত করেছে, যাদেরকেই নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে আর আমার পথে কাজ করার কারণে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তারপরও তারা লড়াই করেছে এবং নিহত হয়েছে- আমি অবশ্য অবশ্যি তাদের ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ মুছে দেবো আর তাদের মালিক বানিয়ে দেবো বহমান ঝরণাওয়ালা জান্নাতসমূহের। আল্লাহর পক্ষ থেকে এগুলো তাদের জন্যে পুরস্কার। আর সর্বোত্তম পুরস্কার তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। হে নবী! বিভিন্ন দেশ ও নগরের শান শওকতের চলাফেরা যেনো তোমায় প্রতারিত না করে। এ-তো সামান্য ক'দিনের উপভোগ মাত্র। তারপর এদের আবাস হবে জাহান্নাম, যা নিদারুণ নিকৃষ্ট জায়গা। তবে যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে চলবে, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী উপঢৌকন হিসেবে রয়েছে বহমান ঝরণা আর জান্নাতসমূহ। আর যা কিছু আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া যাবে, ভালো লোকদের জন্যে তাই কল্যাণকর। আহলে কিতাবের মধ্যেও এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তোমাদের কাছে পাঠানো কিতাব আর তাদের কাছে পাঠানো কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখে; আল্লাহর প্রতি বিনীত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতকে অল্পদামে বেচেনা। এদের জন্যে এদের প্রভুর কাছে রয়েছে প্রতিদান, আর আল্লাহ্ তো (পাওনাদারদের) হিসাব জল্‌দি জল্‌দি চুকিয়ে ফেলেন। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সবর অবলম্বন করো, অটল-অবিচল হয়ে থাকো, নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুতভাবে জুড়ে রাখো, আর আল্লাহকে ভয় করো। এভাবেই অর্জন করবে তোমরা সাফল্য।"

ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও আছে যে, রসূলুল্লাহ্ সা. রাতের নামায শেষে এই দু'আ করেছেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِىْ نُوْرًا وَفَوْقِىْ نُوْرًا وَتَحْتِىْ نُوْرًا وَاَمَامِىْ نُوْرًا وَخَلْفِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا○

অর্থ : আমার আল্লাহ্! আমার অন্তরে নূর দাও (জ্যোতির্ময় করে দাও), আমার যবানে নূর দাও, আমার দৃষ্টিতে নূর দাও, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দাও, আমার ডানে নূর দাও, আমার বামে নূর দাও, আমার উপরে নূর দাও, আমার নিচে নূর দাও, আমার সামনে নূর দাও, আমার পিছে নূর দাও। হে আল্লাহ্! আমাকে নূর দান করো আর আমার নূরকে ব্যাপক-বিশাল করে দাও।"

বুখারি ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উঠলে এই কথাগুলো পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ - اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَاَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ○

অর্থ : আমার আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমার। এই মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী এবং এসবের মাঝে যা কিছু আছে, সবকিছুর তুমিই তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক। সমস্ত প্রশংসা তোমারই, এই মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী আর এসবের মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর তুমি নূর (জ্যোতি)। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, এই মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী আর এসবের মাঝে যা কিছু আছে, তুমিই সবকিছুর সার্বভৌম সম্রাট। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি মহাসত্য। তোমার অংগীকার মহাসত্য। তোমার সাক্ষাত সত্য। তোমার বাণী সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবীগণ সত্য। মুহাম্মদ সত্য

(নবী)। কিয়ামত সত্য। আয় আল্লাহ্, তোমার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করেছি। তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। তোমার উপর ভরসা করেছি। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। তোমারই জন্যে সবার সাথে বিবাদ বাধিয়েছি। তোমারই কাছে বিচার দিয়েছি। তাই হে প্রভু, তুমি আমার আগের পরের আর গোপন-প্রকাশ্য সব ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। আর সেইসব ত্রুটিও ক্ষমা করে দাও, যেগুলো সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে অধিক জানো। তুমিই তো সবাইকে এবং সবকিছুকে আগে বাড়িয়ে দাও এবং পিছে ঠেলে দাও। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তুমি ব্যতিরেকে কোনো ত্রাণকর্তা নেই।"

সহীহ্ মুসলিমে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. রাত্রে উঠে যখন নামায শুরু করতেন, তখন বলতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

অর্থ : ওগো আল্লাহ্! জিব্রাইল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! মহাবিশ্ব ও এই পৃথিবীর স্রষ্টা! অদৃশ্য ও দৃশ্যের সর্বজ্ঞানী! তোমার বান্দাদের মতবিরোধসমূহের ফায়সালা তুমিই করবে! আমাকে অনুগ্রহ করে সেই সত্য দেখাও যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। কারণ, তুমি তো যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে থাকো।"

আবু দাউদে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. যখন রাত্রে ঘুম থেকে জাগতেন, তখন বলতেন :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْاَلُكَ رَحْمَتَكَ - اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابِ ○

অর্থ : তুমি ছাড়া কোনো হুকুমকর্তা ও মুক্তিদাতা প্রভু নেই। সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত-পবিত্র তুমি। আমি তোমারই প্রশংসা করি হে আল্লাহ্! আমার অপরাধের জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

আমি তোমার অনুগ্রহ চাই। আয় আল্লাহ্, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। সঠিক পথ দেখাবার পর আমার অন্তরকে আর বিপথগামী করোনা। তোমার অনুগ্রহ আমাকে দান করো। অবশ্য অবশ্যি তুমি অতিশয় মহান দাতা।"

আবু দাউদে (তাবেয়ী) শারীক হাওয়ানি থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা.কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রসূলুল্লাহ্ সা. রাত্রে নামায পড়তে উঠলে প্রথমে কী পড়তেন? জবাবে তিনি বলেন, এমন একটি বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো, যা তোমার পূর্বে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। রসূলুল্লাহ্ সা. যখন রাত্রে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন : দশবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ মহান) উচ্চারণ করতেন, দশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) বলতেন, দশবার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ বলতেন, দশবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ বলতেন, দশবার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) বলতেন, দশবার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলতেন এবং দশবার- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ - (হে আল্লাহ্! দুনিয়া এবং কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই) বলতেন।[৩৭] অতপর নামায আরম্ভ করতেন।"

সহীহ্ বুখারিতে উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম থেকে উঠে এই কথাগুলো পাঠ করে দু'আ করবে, তার দু'আ কবুল করা হবে। অতপর অযু করে নামায পড়লে তার নামায কবুল করা হবে। সেই কথাগুলো হলো :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ- وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ○

আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি দেখেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. রাতের নামায শুরু করার আগে এই কথাগুলো পাঠ করতেন :

---

৩৭. এই কথাগুলোকে 'মুআশ্শরাতে সাব'আ' বলা হয়। এর অর্থ-এমন সাতটি বাক্য যার প্রতিটি দশবার করে উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ○

অর্থ আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ সবার উপরে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, ক্ষমতা ও প্রতাপের অধিকারী তিনি, শ্রেষ্ঠ ও মহান তিনি।"

একই বর্ণনায় হুযাইফা রা. বলেন, রাতের নামাযে রসূল সা. দুই সাজদার মাঝখানে এই দুআ করেছেন দীর্ঘ সময় ধরে :

رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ

অর্থ : আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা করে দাও! আমার মালিক, আমাকে মাফ করে দাও। ....

নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ্ আবু যর রা. থেকে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, তাতে আবু যর রা. বলেন : একবার রসূলুল্লাহ্ সা. রাতের নামায পড়তে দাঁড়ান, ফজরের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত গোটা নামাযে তিনি কেবল একটি আয়াতই বার বার পড়েছেন। আয়াতটি হলো :

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○

অর্থ : প্রভু, তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তবে দিতে পারো, কারণ তারা তোমারই দাস। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, তবে তুমি তা অবশ্যি করতে পারো, কারণ তুমিই তো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা প্রজ্ঞাবান। (সূরা মায়িদা : ১১৮)

রসূলুল্লাহ্ সা. রাতের নামাযে কোনো কোনো দিন সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়েদা কিংবা আন'আম পড়তেন।

কখনো মুফাস্সাল সূরা (হুজুরাত থেকে শেষ পর্যন্ত) সমূহের প্রথম দিকেরগুলো দুটো দুটো করে মিলিয়ে পড়তেন।

তিনি সাহাবিগণকে রাতের নামাযে তাদের সামর্থ অনুযায়ী দশটি, একশটি এবং হাজারটি করে আয়াত পড়তে উৎসাহিত করতেন।

রাতের ইবাদতের মহাকল্যাণ[৩৮]

বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : প্রত্যেক রাত্রের যখন শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, তখন আল্লাহ্ পাক পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন (পৃথিবীর নিকটবর্তী হন) এবং আহবান করতে থাকেন 'শুনো, এখন যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। এখন যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করবো। এখন যে আমার কাছে তার অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।' এভাবে ভোর হওয়া পর্যন্ত তিনি আহবান করতে থাকেন।

তিরমিযিতে আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমাদের উচিত রাত্রে উঠে নামায পড়া। কারণ, এটা :

- তোমাদের পূর্ববর্তী সালেহ লোকদের রীতি,
- তোমাদের প্রভুর সান্নিধ্য লাভের উপায়,
- গুনাহ্সমূহ মুছে ফেলার হাতিয়ার এবং
- পাপের প্রতিবন্ধক।"

মুসনাদে আহ্মদে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি, ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো রাতের নামায।

আবু দাউদ ও নাসায়ীতে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহম করেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম থেকে উঠলো, নামায পড়লো, স্ত্রীকেও উঠালো এবং সেও নামায পড়লো, আর স্ত্রী উঠতে না চাইলে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দিলো। আল্লাহ্ পাক ঐ নারীর প্রতিও রহম করেন, যে রাত্রে জেগে উঠলো, নামায পড়লো, স্বামীকেও উঠালো এবং সেও নামায পড়লো, আর স্বামী উঠতে না চাইলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দিলো।

সহীহ বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ঘুমায়, শয়তান তার মাথার পেছন দিকে

---

৩৮. 'রাতের ইবাদতের মহাকল্যাণ' শিরোনামের এই অনুচ্ছেদটি সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

তিনটি গিরা দেয়। প্রত্যেক গিরায় 'এখনো অনেক রাত আছে ঘুমাও'- একথার মোহর মারে। কিন্তু সে যদি জেগে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন একটি গিরা খুলে যায়। যদি অযুও করে, তখন আরেকটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি নামায পড়ে, তবে শেষ গিরাটিও খুলে যায়। এমতাবস্থায় তার সকাল হয় সুন্দর, পবিত্র ও প্রফুল্ল মনে। অন্যথায় তার সকাল হয় নোংরা অলস মনে।

বুখারি ও মুসলিমে মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন একবার রসূলুল্লাহ্ সা. রাত্রির নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর পায়ের পাতা ফুলে যায়। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি এতো কষ্ট করেন কেন? আপনার তো আগে-পরের সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে!' জবাবে তিনি বলেন তাই বলে কি আমি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দাহ্ হবোনা?

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সা.-কে বলতে শুনেছি গোটা রাত্রের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, কোনো মুসলিম যদি তা লাভ করে এবং সে সময়টিতে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যি আল্লাহ্ তাকে তা দান করেন। আর সেই বিশেষ সময়টি প্রতি রাত্রেই আসে। (সহীহ্ মুসলিম)

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন :

اَشْرَافُ اُمَّتِىْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَاَصْحَابُ اللَّيْلِ

আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম লোক হলো কুরআনের বাহক ও (নামায আদায়ে) রাত জাগরণকারী লোকেরা।" (বায়হাকি : ইবনে আব্বাস রা.)

●●●

বিতির নামায

তিনি বিতির তাহাজ্জুদের সাথে পড়তেন

রসূলুল্লাহ সা.-এর বিতির নামায তাঁর কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ নামাযের সাথে শামিল ছিলো। তিনি তাহাজ্জুদের সাথেই বিতির নামায পড়তেন। ফলে তাঁর বিতির নামাযকে তাঁর তাহাজ্জুদ নামাযের সাথে মিলিয়েই আলোচনা করতে হবে।

তিনি তাহাজ্জুদের সাথে বিতির কিভাবে পড়তেন এবং কতো রাকাত পড়তেন?- হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে তার কয়েকটি ধরণ জানা যায়। সেগুলো নিম্নরূপ :

এক. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত ধরণ : ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একবার আমি আমার খালার বাসায় রাত্রি যাপন করলাম। দেখলাম, রসূলুল্লাহ সা. রাতের শেষ তৃতীয়াংশে উঠলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে 'ইন্না ফী খালফিস্ সামাওয়াতি .....' পড়লেন। তারপর অযু করলেন। এবং নামাযে দাঁড়ালেন। আমিও অযু করে তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার কান ধরে ঘুরিয়ে আমাকে তাঁর ডানপাশে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম, দেখলাম, তিনি (বিতিরসহ) মোট তের রাকাত নামায পড়লেন।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি রসূল সা.-কে দেখেছেন, তিনি দুই রাকাত দুই রাকাত করে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়েছেন, তিন রাকাত বিতির পড়েছেন আর দুই রাকাত ফজরের সুন্নত পড়েছেন। এসব বর্ণনা বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে।

দুই. আয়েশা রা. বর্ণিত ধরণ : আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. রাতের নামাযের জন্যে উঠে প্রথমে হালকা (সংক্ষিপ্ত) দুই রাকাত দিয়ে শুরু করতেন এবং এগার রাকাত পড়ে শেষ করতেন। প্রত্যেক দুই রাকাতে সালাম ফিরাতেন এবং শেষবারে এক রাকাত যোগ করে বিতির (বিজোড়) করতেন।

তিন. দ্বিতীয় প্রকারের মতো তের রাকাত পড়তেন।

চার. দুই রাকাত দুই রাকাত করে আট রাকাত পড়তেন। অতপর

মাঝখানে না বসে এক সালামে পাঁচ রাকাত পড়তেন। (বুখারি ও মুসলিম : আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত)

পাঁচ. একত্রে নয় রাকাত পড়তেন। ক্রমাগত আট রাকাত পড়ে অষ্টম রাকাতে বসতেন এবং সেই বসায় আল্লাহর যিকর ও হামদ করতেন এবং দু'আ করতেন। তারপর দাঁড়িয়ে নবম রাকাত (বিতির) পড়ে সালাম ফিরাতেন। তারপর বসে বসে দুই রাকাত পড়তেন। (সহীহ মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত)

ছয়. উপরে উল্লেখিত নয় রাকাতের অনুরূপ সাত রাকাত পড়তেন। তারপর বসে বসে দুই রাকাত পড়তেন।

সাত. দুই রাকাত দুই রাকাত করে তাহাজ্জুদ পড়ে শেষ করতেন। তারপর মাঝখানে না বসে একাধারে তিন রাকাত বিতির পড়তেন। ইমাম আহমদ আয়েশা রা. থেকে একথা বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রা. বলেন : তিনি তিন রাকাত বিতির অবিচ্ছিন্নভাবে পড়েছেন।'

ইমাম নাসায়ীও আয়েশা রা. থেকে এ ধরণের একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়েশা রা. বলেন : দ্বিতীয় রাকাতে সালাম না ফিরিয়ে রসূল সা. অবিচ্ছিন্নভাবে তিন রাকাত বিতির পড়েছেন।"- অবশ্য বিতির নামাযের এই প্রকারটি সম্পর্কে ভেবে দেখার দরকার আছে। কারণ এই প্রকারটি অধিকাংশ বর্ণনার সাথে মিলেনা।

আবু হাতিম ও ইবনে হিব্বান তাদের সহীহ হাদিস সংকলনে আবু হুরাইরা রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা বিতির নামাযকে মাগরিবের অনুরূপ করোনা, তিন রাকাত পড়োনা। বরং পাঁচ অথবা সাত রাকাত পড়ো।'

ইমাম দারু কুতনি বলেছেন, বিতির নামায পাঁচ এবং সাত রাকাত পড়া সংক্রান্ত যে বর্ণনা এসেছে, এ বর্ণনার সকল রাবিই নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি বিতির নামাযে দ্বিতীর রাকাতে সালাম ফিরান কিনা? জবাবে তিনি বলেন : হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরান? জবাবে তিনি বলেন : দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরানো সংক্রান্ত হাদিসের সংখ্যা অনেক এবং হাদিসগুলো মজবুত। কারণ এ সংক্রান্ত হাদিস ইমাম যুহরি উরওয়া ইবনে যুবায়ের রা. থেকে এবং তিনি আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার এই সূত্রটি অত্যন্ত মজবুত ও সোনালি সূত্র।

হারিস রহ. বলেছেন, ইমাম আহমদকে বিতির নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন : দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতে হবে। অবশ্য সালাম না ফিরালেও আমি আশা করি নামাযের কোনো ক্ষতি হবেনা। তবে সালাম ফিরানোর ব্যাপারটি নবী করীম সা. থেকে প্রমাণিত।

আবু তালিব বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিতিরের ব্যাপারে আপনি কোন্ হাদিসকে অগ্রাধিকার দেন? জবাবে তিনি বলেন, মাঝখানে না বসে একাধারে পাঁচ রাকাত পড়ে শেষ রাকাতে সালাম ফিরানোর হাদিসও ঠিক, একাধারে সাত রাকাত পড়ে শেষ রাকাতে সালাম ফিরানোর হাদিসও ঠিক। আবার যিরারা আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. নয় রাকাত পড়তেন এবং একাধারে আট রাকাত পড়ে বসতেন- এ হাদিসও সঠিক। তবে এক রাকাত দিয়ে বিতির পড়ার হাদিসগুলোই বেশি শক্তিশালী, তাই আমি সেটাই করি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইবনে মাসউদ রা. যে তিন রাকাতের কথা বলেছেন? জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ ইবনে মাসউদ রা. যে তিন রাকাতের কথা বলেছেন এবং সা'আদও জবাবে তাঁকে কিছু কথা বলেছেন এবং তাঁর তিন রাকাতের বিষয়টি খন্ডণ করেছেন।

আট. নাসায়ী ও আবু দাউদে বর্ণিত হযরত হুযাইফার বক্তব্য এতে হুযাইফা রা. দীর্ঘ তাসবীহ ও দু'আ সম্বলিত মাত্র চার রাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৯]

এই হলো বিতির নামাযের বিভিন্ন প্রকার, যা রসূলুল্লাহ সা. পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪০]

কখন কিভাবে পড়তেন?

বিভিন্ন হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, রসূলুল্লাহ সা. বিতির নামায-
- রাতের প্রথম ভাগেও পড়েছেন এবং সাহাবীগণকেও পড়তে বলেছেন।
- রাতের মধ্য ভাগেও পড়েছেন।
- রাতের শেষ ভাগেও পড়েছেন।

---

৩৯. আসলে হুযাইফা রা.-এর এই বর্ণনায় বিতির নামাযের কথা উল্লেখ হয়নি।

৪০. বিতির নামায রসূল সা. রাতের নামাযের সাথে একত্রে পড়েছেন বিধায়, এই নামাযের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে সাহাবীগণ যে যা দেখেছেন, তিনি তাই বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তাঁরা আমলও করেছেন নিজস্ব দেখা অনুযায়ী। তাই সহীহ হাদিস সমূহে বর্ণিত যে কোনো প্রকারের উপর আমল করলেই চলবে। কারণ রসূল সা. বিভিন্ন রকম করেছেন।

রসূলুল্লাহ সা. রাতের নামায সাধারণত তিনভাবে পড়েছেন :

এক. আধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

দুই. কখনো কখনো (বিশেষ করে শেষ বয়েসে) বসে বসে পড়েছেন এবং রুকূও বসে বসে করেছেন।

তিন : কখনো কখনো বসেই সূরা কিরাত পড়েছেন। তবে রুকূ করার সময় দাঁড়িয়ে রুকূ করেছেন। তারপর সাজদায় গিয়েছেন।

- এই তিন প্রকারই সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

বিতিরে দু'আ কুনুত

রসূলুল্লাহ সা. বিতির নামাযে কুনূত পড়েছেন বলে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত একটি হাদিস ছাড়া অন্য কোথাও থেকে জানা যায়নি। হাদিসটির সূত্র নিম্নরূপ ইবনে মাজাহ > আলী ইবনে মাইমুন আর রকী > মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ > সুফিয়ান > যায়েদ ইবনে ইয়ামী > সায়ীদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবযী > আবদুর রহমান ইবনে আবযী > উবাই ইবনে কা'আব রা.। উবাই ইবনে কা'আব বর্ণিত এই হাদিসটি হলো : রসূলুল্লাহ সা. বিতির পড়তেন এবং রুকূর পূর্বে কুনূত পড়তেন।"

ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. মূলত রুকূর পরে কুনূত পড়তেন, পূর্বে নয়।

আসলে কুনূতের ব্যাপারে যতো হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তাহলো রসূলুল্লাহ সা. ফজর নামাযে রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কুনূত পড়েছেন। ইবনে মাজাহর এই হাদিস থেকে জানা যায়, বিতিরে রুকূর পূর্বে কুনূত পড়েছেন।

মুসনাদে আহমদ ও সুনান গ্রন্থাবলীতে হাসান ইবনে আলী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বিতিরে পড়ার জন্যে যে কথাগুলো শিক্ষা দিয়েছেন, সেগুলো হলো :

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ
وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ
مَاقَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ
وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ○

অর্থ হে আল্লাহ, তুমি যাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছো, আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো! যাদেরকে তুমি ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছো, আমাকেও ক্ষমা ও সুস্থতা দান করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো! তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছো, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করো! তুমি যা কিছু প্রদান করেছো, আমার জন্যে তাতে বরকত (প্রাচুর্য) দান করো। তোমার মন্দ ফায়সালা থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমিই প্রকৃত ফায়সালাকারী আর তোমার উপর কারো ফায়সালা চলেনা। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। যে তোমার শত্রু হয়েছে, তাকে ইয্যত দান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের প্রভু, বিরাট প্রাচুর্যশীল তুমি, অতিশয় মহান তুমি।"

নাসায়ীর বর্ণনায় একথাও আছে যে, হাসান রা. এই দু'আ পড়ার পর রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি দরূদ পড়তেন।

হাকাম তার মুসতদরক গ্রন্থে হাসান রা. থেকে একথাও উল্লেখ করেছেন যে : রসূলুল্লাহ সা. বিতর নামাযে রুকূ থেকে দাঁড়ানোর পর যখন সাজদা ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবেনা, তখন এই কথাগুলো (উপরোক্ত দু'আটি) পড়ার জন্যে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযি বলেছেন, হাসানের এই হাদিসটি 'হাসান' (উত্তম) হাদিস। বিতরের কুনূত সম্পর্কে এর চাইতে উত্তম আর কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়না।

তবে[৪১] মুহাদ্দিস তাবারানি প্রমুখ বিতির নামাযে আরেকটি কুনূতের কথা বর্ণনা করেছেন। যদিও হাসান রা. বর্ণিত উপরোক্ত কুনূতটিকেই মুহাদ্দিসগণ বিতিরের সর্বোত্তম কুনূত বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক প্রমুখ নিম্নোক্ত কুনূতটিকেও উত্তম কুনূত বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ○

---

৪১. এই অংশটুকু সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

অর্থ : আয় আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমারই প্রতি ঈমান রাখি, তোমার উপরই ভরসা করি এবং সর্বপ্রকার মহোত্তম গুণাবলী তোমারই প্রতি আরোপ করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করি, তোমার অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করিনা। আমরা তোমার অবাধ্য লোকদের ত্যাগ করি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখিনা। ওগো আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব করি, তোমারই জন্যে নামায পড়ি এবং তোমাকেই সাজদা করি। আমরা তোমারই পথে দৌড়াই, তোমারই পথে এগিয়ে চলি। তোমার রহমতের আমরা আকাংখী, তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি, আর তোমার আযাব তো কেবল কাফিরদের প্রতিই বর্তাবে।"

বিতিরের পরে দুই রাকাত

সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে আয়েশা রা. উম্মে সালামা রা. এবং আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. কখনো কখনো বিতিরের পরে বসে বসে দুই রাকাত নামায পড়েছেন।

এই দুই রাকাতের শুদ্ধতা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কারো কারো মতে এই দুই রাকাত 'বিতিরকে রাতের শেষ নামায বানাও' রসূল সা.-এর এই বাণীর খেলাফ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বিতিরের পরে নামায পড়ার বৈধতা দেখাবার জন্যেই রসূল সা. এই দুই রাকাত পড়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই দুই রাকাত বিতিরের পরিপূরক নামায।

●●●

রসূলুল্লাহর অনিয়মিত নফল নামায সমূহ

সালাতুদ্দোহা (চাশ্‌তের নামায)

সকালে সূর্য উঠে আলোকময় হয়ে যাবার পর থেকে সূর্য মাথার উপর আসা পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়টাকে দোহা বা চাশ্‌ত বলা হয়। এ সময় কখনো কখনো রসূলুল্লাহ্ সা. কিছু নফল নামায পড়েছেন এবং সাহাবীগণকে পড়তে উৎসাহিত করেছেন। তিনি এ নামায কখনো দুই রাকাত, কখনো চার রাকাত, কখনো ছ'রাকাত এবং কখনো আট রাকাত পড়েছেন।

তবে রসূলুল্লাহ সা. এ সময় পড়েছেন এবং পড়তে উৎসাহিত করেছেন বলে যেমন হাদিসে আছে, তেমনি এ সময় তিনি নামায পড়েন নাই বলেও হাদিসে আছে।

সহীহ্ বুখারিতে আয়েশা রা. থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ্ সা.-কে চাশতে নামায পড়তে দেখিনি, তবে আমি এ (সময়) নামায পড়ি।

সহীহ্ বুখারিতে মুরিক আল আজলি থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন আমি ইবনে উমর রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি চাশতে নামায পড়েন?-তিনি জবাব দেন : না। অতপর আমি জিজ্ঞাসা করি : নবী করীম সা. কি পড়তেন? তিনি বললেন : না, তিনিও পড়তেন না।"

ইমাম বুখারি ইবনে আবি লায়লা থেকেও একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদিসে ইবনে আবি লায়লা বলেন রসূলুল্লাহ্ সা. চাশতে নামায পড়েছেন বলে কেউ আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তবে কেবলমাত্র উম্মে হানি বলেছেন : মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ সা. আমার ঘরে এসে গোসল করেন, তারপর আট রাকাত নামায পড়েন। আমি তাকে এতো সংক্ষেপ নামায পড়তে আর কখনো দেখিনি। তবে রুকূ সাজদা পূর্ণভাবেই আদায় করেন। এ সময়টা ছিলো দোহা (অর্থাৎ-চাশ্‌ত)-এর সময়।'

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রসূলুল্লাহ্ সা. কি

চাশতে নামায পড়তেন? তিনি জবাব দেন : না। তবে ঐ সময় সফর থেকে এলে কিছু নামায পড়তেন।

একইভাবে রসূলুল্লাহ সা. চাশতে নামায পড়েছেন বলেও বর্ণনা আছে। যেমন-

সহীহ মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. চাশতে নামায পড়তেন এবং চার রাকাত পড়তেন। আবার আল্লাহ চাইলে এর চাইতে বেশিও পড়তেন।

বুখারি-মুসলিমে উম্মে হানি রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে চাশতের সময় আট রাকাত নামায পড়েছেন।

মুসতাদরকে হাকিম-এ আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে সফরে চাশতে আট রাকাত নামায পড়তে দেখেছি।

হাকিম তার 'চাশতের ফযীলত' অধ্যায় আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : একবার রসূলুল্লাহ সা. চাশতে নামায পড়েন। তারপর একশ বার এ দু'আটি পাঠ করেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ○

অর্থ : আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে রহম (অনুগ্রহ) করো আর আমার তওবা কবুল করো। নিশ্চিতই তুমি দয়াময়, ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী।"

মুজাহিদ বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. চাশতের সময় দুই রাকাত, চার রাকাত, ছ'রাকাত এবং আট রাকাত নামায পড়েছেন।

হাকিম আয়েশা এবং উম্মে সালমা রা.-এর সূত্রে বার রাকাতের কথাও উল্লেখ করেছেন।

চাশতের সময় নামায পড়া না পড়া উভয় ব্যাপারেই যেহেতু হাদিস রয়েছে, সে কারণে এ নামায পড়া না পড়া উভয় ব্যাপারেই মুহাদ্দিসগণের মতামত রয়েছে।

এ নামায পড়া এবং না পড়ার ফযীলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস পাওয়া যায়। অতীত বুযুর্গদের অনেকেই হাদিস অনুসারে এ নামায পড়েছেন।

আরেকদল মুহাদ্দিস এ নামায বর্জনের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁরা এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাছাড়া এ বিষয়ে সাহাবাগণের না জানার বিষয়টিও সামনে এনেছেন।

বুখারিতে উদ্ধৃত হাদিসে ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূল সা., আবু বকর রা., উমর রা. এবং তিনি নিজেও এ নামায পড়তেন না।

আমি ওকী'র সূত্রে শুনেছি, আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে মাত্র একদিন চাশতের সময় নামায পড়তে দেখেছি।

আলী ইবনে মাদানি আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের সূত্রে বর্ণনা করেন একদিন আবু বকর রা. একদল লোককে চাশতের সময় নামায পড়তে দেখে বলেন : তোমরা এমন নামায পড়ছো, যা না রসূল পড়েছেন, না তাঁর কোনো সাহাবী পড়ছেন।

অবশ্য তৃতীয় একদল লোক চাশতের সময় নামায পড়াকে মুস্তাহাব বলেন। তাই তাঁরা কোনো কোনোদিন এ নামায পড়তে বলেন।

তবে চাশতের সময় নামায পড়া সংক্রান্ত হাদিসগুলো সুপ্রমাণিত নয়।

রসূল সা. কখনো কখনো এ সময় নামায পড়েছেন একথা প্রমাণিত, কিন্তু তাঁর এ নামাযগুলো ঐ (চাশতের) সময়ের সাথে জড়িত নয়। যেমন, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি উম্মে হানির ঘরে গিয়ে গোসল করে আট রাকাত নামায পড়েছেন।- এ নামায 'ঐ সময়ের' সাথে জড়িত নয়, বরং মক্কা বিজয়ের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি এ নামায পড়েছেন। আবার আয়েশা রা. বলেছেন, এ (চাশতের) সময় সফর থেকে ফিরে এলে তিনি নামায পড়তেন।- এটাও 'ঐ সময়ের' সাথে জড়িত নামায নয়, বরং সফর থেকে ফিরে আসার নামায।

- এভাবে এ সময় তাঁকে যারা কখনো কখনো নামায পড়তে দেখেছেন, সেটা এ সময়ের সাথে জড়িত (অর্থাৎ-চাশতের) নামায নয়, বরং বিভিন্ন কারণে ও উদ্দেশ্যে তিনি কখনো কখনো এ সময় নামায পড়েছেন। এটাই প্রমাণিত।

শোকরানার সাজদা

রসূলুল্লাহ্ সা. এবং তাঁর সাহাবীগণের রীতি ছিলো, যখন তাঁরা আল্লাহর কোনো নিয়ামত লাভ, কিংবা বিপদ দূর হবার কারণে আনন্দিত হতেন, তখন তাঁরা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহকে সাজদা করতেন।

মুসনাদে আহমদে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূল সা.- এর জীবনে যখন আনন্দের কিছু ঘটতো, তখন তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

ইবনে মাজাহ আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন একবার রসূলুল্লাহ সা.- কে একটি বিষয়ে সুসংবাদ প্রদান করা হয়। সংবাদটি শুনে তিনি আল্লাহর সমীপে সাজদায় লুটিয়ে পড়েন।

ইমাম বায়হাকি ইমাম বুখারি কর্তৃক সূত্র সহীহ্ হবার শর্তাবলী অনুযায়ী বিশুদ্ধ হাদিস উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : আলী রা. কর্তৃক প্রেরিত হামাদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণ করার লিখিত সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ্ সা. সাজদায় লুটিয়ে পড়েন। অতপর মাথা উঠিয়ে বলেন আস্‌সালামু আলা হামাদান, আস্‌সালামু আলা হামাদান।

মুসনাদে আহমদে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যখন এই সুসংবাদ এলো যে, কোনো ব্যক্তি যদি তোমার প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ করে, তবে আমিও তার প্রতি সালাত (অনুগ্রহ) করি। আর কোনো ব্যক্তি যদি তোমাকে সালাম করে, তবে আমিও তাকে সালাম (তার প্রতি শান্তি বর্ষণ) করি। এই সুসংবাদটি আসার সাথে রসূলুল্লাহ সা. কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাজদায় লুটিয়ে পড়েন।

সুনানে আবু দাউদে সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : একবার রসূলুল্লাহ সা. উপরে হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন। অতপর সাজদায় লুটিয়ে পড়েন। এভাবে তিনবার সাজদা করেন। শেষে তিনি আমাদের বলেন, আমি আমার প্রভুর কাছে কিছু প্রার্থনা করেছি এবং আমার উম্মতের (অনুসারীদের) জন্যে সুপারিশ করেছি। তিনি এক তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্যে আমার প্রার্থনা কবুল করেন। তাই আমি তাঁর শুকরিয়া আদায়ের জন্য সাজদায় লুটিয়ে পড়ি। আবার মাথা উঠিয়ে আমার প্রভুর কাছে আমার উম্মতের জন্যে প্রার্থনা করি। এবার তিনি আরেক তৃতীয়াংশের জন্যে আমার প্রার্থনা কবুল করেন। সাথে সাথে আমি প্রভুর দরবারে কৃতজ্ঞতার সাজদায় লুটিয়ে পড়ি। অতপর আবার মাথা উঠিয়ে আমি আমার উম্মতের জন্যে প্রার্থনা করি। এবার তিনি আমার উম্মতের[৪২] অবশিষ্ট তৃতীয়াংশের জন্যে আমার প্রার্থনা কবুল করেন। সাথে সাথে আমি আমার প্রভুর জন্যে কৃতজ্ঞতার সাজদায় লুটিয়ে পড়ি।

---

৪২. এই হাদিসে উম্মত শব্দটি এসেছে। 'উম্মত' মানে-একই নীতি ও আদর্শের অনুসারী দল। 'উম্মতে মুহাম্মদী' মানে-মুহাম্মদ সা.-এর নীতি ও আদর্শের অনুসারী দল। এই হাদিসে রসূল সা.-এর বাণী : 'আমার উম্মতের জন্যে সুপারিশ করেছি' মানে-আমার নীতি ও আদর্শের অনুসারী লোকদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে সুপারিশ করেছি।

রসূলুল্লাহ সা.- এর মতো সাহাবায়ে কিরামও কৃতজ্ঞতার সাজদা করেছেন। সহীহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, কা'আব ইবনে মালিক রা. যখন ক্ষমা লাভের সুসংবাদ পেলেন, তখন আল্লাহ্ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আনত হয়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়েন।[৪৩]

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে, আলী রা. যখন যুস্ সাদিয়াকে খারিজিদের নিহত লোকদের মধ্যে দেখতে পেলেন, তখন আল্লাহর দরবারে সাজদায় লুটিয়ে পড়েন।

সায়ীদ ইবনে মানসূর বর্ণনা করেছেন আবু বকর রা. যখন (নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীদার) মুসাইলামা কাযযাবের নিহত হবার সংবাদ জানতে পারেন, তখন সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে সাজদায় লুটিয়ে পড়েন।[৪৪]

তিলাওয়াতের সাজদা

কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে যখন কোনো স্থানে সাজদার হুকুম আসতো, তখন রসূলুল্লাহ সা. সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন। তিলাওয়াতের সাজদায় তিনি প্রায় সময়ই এ কথাগুলো পাঠ করতেন।

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ ○

অর্থ : আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তার সামনে সাজদায় অনবত হলো, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং উত্তম আকৃতি দান করেছেন। তাছাড়া নিজ ক্ষমতা ও কুদরতে তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন।"

কখনো কখনো তিনি তিলাওয়াতের সাজদায় নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ احْطُطْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاكْتُبْ لِيْ بِهَا اَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا

وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ ○

---

৪৩. সাহাবি কা'আব ইবনে মালিক রা. অলসতা বশত তবুক যুদ্ধে যেতে না পারা তিনজন সাহাবির একজন। তবুক থেকে ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ সা. আল্লাহ্র নির্দেশে এই তিন সাহাবিকে বয়কোট করেন। ফলে তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। দুনিয়া তাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাঁরা কান্নাকাটি ও তওবা করতে থাকেন। পঞ্চাশ দিনের চরম তওবার পর আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে ক্ষমা ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন। এসময় কা'আব রা. শোকরানার সাজদা করেন।

৪৪. এ অনুচ্ছেদে শোকরানার সাজদার কথা উল্লেখ হয়েছে, নামাযের কথা উল্লেখ হয়নি। তা ছাড়া হাদিসে এ সাজদার জন্যে অযু করার প্রয়োজন আছে বলেও উল্লেখ নেই।

অর্থ আয় আল্লাহ্! এ সাজদার বিনিময়ে আমার পাপের বোঝা সরিয়ে দাও। এর বিনিময়ে আমার জন্যে সওয়াব ও প্রতিদান লিখে রাখো। এ সাজদাকে আমার পরকালের সঞ্চয় বানিয়ে রাখো। আর আমার এই সাজদা তেমনিভাবে তুমি কবুল করো, যেভাবে তুমি তোমার দাস দাউদের সাজদা কবুক করেছো।"

এই দুটি বর্ণনা সুনান সংকলকগণ বর্ণনা করেছেন। তবে এ দুটি বর্ণনার কোনোটিতেই একথা বলা হয়নি যে, তিনি এই তিলাওয়াতের সাজদা থেকে মাথা উঠাবার সময়ও 'আল্লাহু আকবার' বলেছেন।

এ সাজদায় রসূলুল্লাহ সা. তাশাহ্হুদ পড়েছেন বলেও জানা যায়না এবং সালাম ফিরিয়েছেন বলেও জানা যায়না।

প্রত্যেক অযুর পর বিলালের দুই রাকাত[৪৫]

বিলাল রা. যখনই অযু করতেন, অযুর পর দুই রাকাত নামায পড়তেন। রসূলুল্লাহ সা. তাঁর এই দুই রাকাত সমর্থন করেছেন।

সহীহ্ বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. একদিন ফজরের নামাযের পর বিলাল রা.-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে বিলাল! আমাকে বলো দেখি, ইসলাম গ্রহণ করার পর তুমি এমন কি আমল করেছো, যার বিনিময়ে তুমি আল্লাহর কাছে অধিক প্রতিদানের আশা করো? আমি এজন্যে তোমাকে এ প্রশ্ন করেছি যে, আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। জবাবে বিলাল বলেন : আমি যে আমলের জন্যে আল্লাহ্র কাছে সার্বাধিক প্রতিদান পাবার আশা করি, তা হলো, আমি দিনে রাত্রে যখনই অযু করেছি, তখন সে অযু দ্বারা আমি কিছু না কিছু নামায পড়েছি, যতোটুকু আল্লাহ্ পাক আমাকে তৌফিক দিয়েছেন।

প্রত্যেক আযানের পর বিলালের দুই রাকাত[৪৬]

বিলাল রা. প্রত্যেক আযানের পর দুই রাকাত নামায পড়তেন। রসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর এই দুই রাকাত সমর্থন করেছেন।

ইমাম তিরমিযি সহীহ্ সনদসহ বুরাইদা রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদিন সকালে রসূলুল্লাহ সা. বিলালকে ডাকলেন। তারপর বললেন, হে বিলাল! তুমি এমন কী আমল করেছো, যার ফলে আমার

---

৪৫. এই অনুচ্ছেদটি সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।
৪৬. এই অনুচ্ছেদটি সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

আগেই জান্নাতে চলে গিয়েছো? আমি যখনই জান্নাতেই প্রবেশ করেছি, আমার সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি।

জবাবে বিলাল বললেন হে রসূলুল্লাহ! আমি যখনই আযান দিয়েছি, আযানের পর দুই রাকাত (নফল) নামায পড়েছি। তাছাড়া যখনই আমার অযু গিয়েছে, সাথে সাথে অযু করেছি এবং অযুর পর আল্লাহর জন্যে দুই রাকাত নামায পড়াকে আমার জন্যে কর্তব্য করে নিয়েছি।

তখন রসূল সা. বলে উঠেন : হাঁ, এরি জন্যে।

ক্ষমা প্রার্থনা ও দুশ্চিন্তার নামায[৪৭]

আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আবু বকর রা. আমাকে বলেছেন আর তিনি অবশ্যি সত্য বলেছেন যে, আমি আল্লাহর রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি যে কোনো ব্যক্তি যদি পাপ বা অপরাধ করে ফেলে, তারপর (গোসল বা অযু দ্বারা) পবিত্রতা অর্জন করে এবং কিছু (নফল) নামায পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। অতপর রসূল সা. কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন :

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ قف وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ○ أُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ○

অর্থ যারা কখনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে, কিংবা কোনো গুনাহের কাজ করে নিজেদের প্রতি যুলম করে বসলে সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ করে, অতপর কৃত পাপের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে- কারণ আল্লাহ ছাড়া কে আছে গুনাহ মাফ করবার?- এবং জেনে বুঝে নিজেদের এই কৃতকর্মের উপর জোর দেয়না, এসব লোকদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে ক্ষমা আর জান্নাত, সেই জান্নাত যার পাদদেশ ঝর্ণাধারা সমূহ : প্রবহমান, আর চিরকাল তারা থাকবে সেখানে।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : ১৩৫-৩৬ আয়াত)

- হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযি এবং ইবনে মাজাহ। তবে ইবনে মাজাহ আয়াতটির কথা উল্লেখ করেননি।

৪৭. এই অনুচ্ছেদটি সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

আবু দাউদে হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. যখন কোনো কারণে চিন্তিত হতেন, তখন তিনি (কিছু নফল) নামায পড়তেন।" আসলে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদেই এই নির্দেশ দিয়েছেন: "হে ঈমানদার লোকেরা! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও।" (সূরা ২ আল-বাকারা ১৫৩ আয়াত)

ইস্তেখারার নামায ও দু'আ[৪৮]

জাবির রা. বর্ণনা করেছেন রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে যাবতীয় কাজে ইস্তেখারা করতে শিক্ষা দিয়েছেন, যেমন তিনি আমাদের শিক্ষা দিতেন কুরআনের কোনো সূরা। তিনি বলতেন তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করবার মনস্থ করবে, তখন সে যেনো ফরয ছাড়া (অর্থাৎ নফল) দুই রাকাত নামায পড়ে। তারপর যেনো এভাবে দু'আ করে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ. فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدُرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ. وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاَصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاَصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ○

অর্থ আয় আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে এ বিষয়ে ইস্তেখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) করছি। তোমার ক্ষমতার সাহায্যে তোমার কাছে এ বিষয়ে কল্যাণ লাভের সামর্থ প্রার্থনা করছি। আমি তোমার কাছে তোমার মহান অনুগ্রহ ও কল্যাণের ভাণ্ডার থেকে প্রার্থনা করছি। তুমি তো সবকিছুর ক্ষমতা রাখো, আর আমার তো কোনো ক্ষমতা নেই। তুমি তো সবকিছু জানো, আর আমি তো জানিনা। আর সকল অদৃশ্যের তুমিই তো একমাত্র জ্ঞানী। আয় আল্লাহ! তুমি যদি (আমার মনস্থ করা) এই বিষয়টি আমার জন্যে, আমার দীন, জীবন-জীবিকা এবং আমার পরকাল ও পরিণতির জন্যে কল্যাণকর হবে বলে জানো (মনে করো), তবে তা আমার জন্যে নির্ধারণ করো, তা আমার জন্যে সহজ করে দাও এবং তাতে আমার জন্যে বরকত দান করো।

---

৪৮. এই অনুচ্ছেদটি সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

পক্ষান্তরে তুমি যদি এই বিষয়টি আমার জন্যে, আমার দীন, জীবন-জীবিকা ও পরকাল-পরণতির জন্যে ক্ষতিকর হবে বলে জানো (মনে করো), তবে তুমি তা আমার থেকে (অন্যদিকে) ফিরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখো। আর আমার জন্যে কল্যাণ নির্ধারণ করো তা যেখানেই থাকনা কেন এবং তার উপর আমাকে সন্তুষ্ট রাখো।" (সহীহ্ বুখারি)

সালাতুত তাসবীহ্[৪৯]

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকি ইবনে আব্বাস রা. থেকে এবং তিরমিযি আবু রাফে থেকে রসূলুল্লাহ্ সা. কর্তৃক তাঁর চাচা আব্বাস রা.-কে শিখানো চার রাকাত অদ্ভুত ধরনের নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। এই নামায 'সালাতুত তাসবীহ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই নামায সংক্রান্ত হাদিসটি নিম্নরূপ :

ইবনে আব্বাস বলেন, একদিন নবী করীম সা. (আমার পিতা) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে বললেন : হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে প্রদান করবোনা? আমি কি আপনাকে দেবোনা? আমি কি আপনাকে সংবাদ জানাবোনা? আমি কি আপনাকে শিখিয়ে দেবোনা দশটি কাজ? আপনি যদি তা করেন, তবে আল্লাহ্ আপনার অপরাধ মাফ করে দেবেন। আগের পরের, পুরাতন নতুন, ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত, ছোট বড় এবং গোপন ও প্রকাশ্য সব অপরাধ আল্লাহ মাফ করে দেবেন। সেই কাজ হলো, আপনি চার রাকাত নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং আরেকটি সূরা পড়বেন। এভাবে প্রথম রাকাতের বিরাত শেষ করার পর দাঁড়ানো অবস্থাতেই পনের বার এই বাক্যটি পড়বেন :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ○

অতপর রুকূতে যাবেন। রুকূতে গিয়ে সেই বাক্যটি দশবার পাঠ করবেন। তারপর রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়াবেন এবং এই দাঁড়ানো অবস্থায় উক্ত বাক্য দশবার পাঠ করবেন। তারপর সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসবেন এবং বসা অবস্থায় উক্ত বাক্য দশবার পাঠ করবেন। তারপর দ্বিতীয় সাজদায় যাবেন এবং এই সাজদাতেও বাক্যটি দশবার পাঠ করবেন। অতপর সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়াবেন এবং বাক্যটি দশবার পাঠ করবেন। এভাবে বাক্যটি এক রাকাতে মোট পঁচাত্তর বার পাঠ করা হলো। এই প্রথম রাকাতের মতো একই নিয়মে চার রাকাত পড়বেন। আপনার

---

৪৯. এই অনুচ্ছেদটি সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

পক্ষে সম্ভব হলে প্রতি সপ্তাহে একবার পড়বেন। তাও সম্ভব না হলে প্রতিমাসে একবার পড়বেন। সেটাও সম্ভব না হলে বৎসরে একবার পড়বেন। তাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার হলেও পড়বেন।"

হাকিম ইবনে খুযাইমা ও দারু কুতনি এটিকে সহীহ হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল জাওযী এটাকে 'মওদু' (মনগড়া) হাদিস বলেছেন।

তারাবীর নামায[৫০]

তারাবীর নামায রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত কিনা- তা নিয়ে মতভেদ আছে। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ আবু যর গিফারি রা.-এর সূত্রে রমযানে রসূলুল্লাহ সা.-এর নফল নামায সম্পর্কে হাদিস উল্লেখ করেছেন। তাতে আবু যর রা. বলেন, আমরা রমযান মাসে রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে রোযা রেখেছি। কিন্তু আমাদের সাথে নিয়ে তিনি এমাসে নফল নামায পড়ার রীতি চালু করেননি। তবে মাসের সাতদিন বাকি থাকতে তিনি এসে আমাদের সাথে নফল নামায পড়তে শুরু করলেন। তাও চারদিন পড়িয়ে তিনি আর এ নামায পড়াননি।

বুখারি ও মুসলিমে যায়েদ বিন সাবিত রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। একবার রসূলুল্লাহ সা. মসজিদে মাদুরের হুজরায় থাকতে শুরু করলেন।[৫১] সেখানে তিনি কয়েক রাত্রি (নফল) নামায পড়লেন। এমনকি লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়তে শুরু করলো। অতপর একদিন লোকেরা তাঁর কোনো সাড়া শব্দ পেলনা। তারা ভাবলো, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই কেউ কেউ গলা খাকরাতে শুরু করলো, যাতে করে তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। তাদের অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি বলে উঠলেন : এই নামাযের ব্যাপারে আমি তোমাদের তৎপরতা লক্ষ্য করেছি। আমার আশংকা হয়, এই নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে না পড়ে। যদি ফরয হয়ে যায়, তবে তোমরা তা পালন করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা এ নামায ঘরে পড়ো। কারণ, ফরয নামায ছাড়া অন্য নামায ঘরে পড়াই উত্তম।"

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. রমযানের রাতে নামায পড়ার জন্যে আমাদের উৎসাহ দিতেন। তবে এ ব্যাপারে আমাদের খুব তাকিদ করতেন না। তিনি বলতেন যে ব্যাক্তি

---

৫০. এই অনুচ্ছেদটি সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।
৫১. অর্থাৎ : রমযানের শেষ দশদিন ই'তেকাফের উদ্দেশ্যে।

ঈমান ও আশা নিয়ে রমযান মাসে (রাত্রে) নামাযে দাঁড়াবে তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” অতপর রসূলুল্লাহ সা. ওফাত লাভ করেন এবং এ ব্যাপারে অবস্থা একই রকম থাকে। আবু বকর রা.-এর খিলাফতকালে একই অবস্থা থাকে।[৫২] উমর রা.-এর খিলাফতের প্রথম দিকেও একই অবস্থা থাকে।

সহীহ বুখারিতে আবদুল রহমান বিন আবদুল কারী থেকে বর্ণিত হয়েছে : এক রাত্রে আমি (খলিফা) উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে বেরিয়ে মসজিদের দিকে এলাম। আমরা এসে দেখি, লোকেরা মসজিদে ভাগে ভাগে নামায পড়ছে। কেউ নিজের নামায নিজে পড়ছে, আবার কারো কারো সাথে কয়েকজন একত্র হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা দেখে উমর রা. বললেন : আমি যদি এই সবাইকে একজন ইমামের পিছে একত্র করে দিই, তবে তো উত্তম হয়। অতপর এ বিষয়ে তিনি মনস্থির করেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা'আবের পিছনে একত্র করে দেন।

আবদুর রহমান বলেন এরপর আরেক রাত্রে আমি উমরের সাথে বেরুলাম। আমরা দেখলাম, লোকেরা তাদের কারীর (পড়িয়ের) পেছনে নামায পড়ছে। এ (সুশৃংখল) অবস্থা দেখে উমর রা. বলে উঠলেন এটা একটা উত্তম বিদ'আত (নতুন নিয়ম)। তিনি লোকদের বললেন : তোমরা যে সময়টিতে ঘুমিয়ে থাকো তা তোমাদের এই নামায পড়ার সময়ের চাইতে উত্তম (অর্থাৎ-শেষ রাত)।”

মু'আত্তায়ে মালিক-এ সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন খলিফা উমর রা. উবাই ইবনে কা'আব এবং তামীম দারীকে রমযান মাসে লোকদেরকে এগার রাকাত (বিতিরসহ) নামায পড়াতে নির্দেশ প্রদান করেন। অতএব ইমাম শত আয়াতের কিরাত দিয়ে আমাদের নামায পড়াতেন। এতো লম্বা কিয়ামের কারণে আমরা শেষ পর্যন্ত লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হই। ফজরের কাছাকাছি সময় আমরা এ নামায থেকে ফারেগ হতাম।

●●●

৫২. আর্থাৎ : তারাবীর জামাত কায়েম হতোনা। কেউ পড়লে ব্যাক্তিগতভাবে পড়তো।

ইস্তিস্কা ও সূর্য গ্রহণের নামায

সালাতুল ইস্তিস্কা[৫৩]

রসূলুল্লাহ সা. কয়েক পদ্ধতিতে পানির জন্য প্রার্থনা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। সেই পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

এক : জুমার দিন খুতবা প্রদানকালে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে তিনি পানি প্রার্থনা করেছেন :

اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا ○

অর্থ : আয় আল্লাহ, আমাদের পানি দাও! আয় আল্লাহ আমাদের বৃষ্টি দাও! আয় আল্লাহ, আমাদের পানি পান করাও! আয় আল্লাহ, আমাদের পানি পান করাও।"

দুই : একবার লোকেরা পানির অভাব ও অনাবৃষ্টির কথা জানালে তিনি তাদের কথা দিলেন, ইস্তিস্কার নামায পড়ার জন্যে তিনি বেরুবেন। কথামতো সূর্যোদয় হলে তিনি বেরুলেন। অত্যন্ত নত, বিনীত ও জড়সড় প্রার্থীর ন্যায় তিনি লোকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মিম্বরে উঠলেন (মিম্বরে উঠার কথাটি সহীহ কিনা সন্দেহ আছে) এবং এভাবে দু'আ করলেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَهُ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ ○

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের মালিক, যিনি দয়ার সাগর পরম করুণাময়, যিনি প্রতিফল দিবসের একচ্ছত্র অধিপতি। কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া, তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন। আয় আল্লাহ, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি যা ইচ্ছা তাই করো। আয় আল্লাহ, কোনো ইলাহ নাই তুমি ছাড়া। তুমি মহাধনী, মহাপ্রাচুর্যের

---

৫৩. ইস্তিস্কা' আরবি শব্দ। এর অর্থ পানি চাওয়া বা পানি প্রার্থনা করা। অনাবৃষ্টি হলে অথবা পানির প্রয়োজন দেখা দিলে রসূলুল্লাহ সা. মহান প্রতিপালকের নিকট পানি প্রার্থনা করতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কখনো দু'রাকাত নামাযও পড়তেন।

অধিকারী আর আমরা তো ফকির, নি:স্ব, তোমার মুখাপেক্ষী। তুমি দয়া করে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করো। আর যতোটুকুই আমাদের প্রতি বর্ষণ করবে, সেটাকে আমাদের জন্যে শক্তি লাভের উৎস বানাও এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আমাদের জীবিকার উপকরণ বানাও।'

এরপর তিনি হাত তুললেন এবং বিনয়, কান্নাকাটি ও রোনাজারির মাধ্যমে দু'আ করতে শুরু করলেন। হাত এতোটা উপরের দিকে উঠালেন যে, তার বগলের সুফায়দী দৃষ্টিগোচর হলো। অতপর জনমণ্ডলীকে পিছে রেখে কিবলামুখী হলেন। এসময় তিনি তাঁর চাদরেরও দিক পরিবর্তন করে নিলেন। ডানদিকের অংশ বাম দিকে এবং বাম দিকের অংশ ডান দিকে নিলেন। তেমনি পিঠের অংশ বুকের দিকে এবং বুকের অংশ পিঠে নিলেন। এসময় তাঁর গায়ে ছিলো কালো চাদর। এভাবে কিবলামুখী হয়ে তিনি দু'আ করতে লাগলেন। তাঁর সাথে সাথে জনমণ্ডলীও রোনাজারির মাধ্যমে দু'আ করতে থাকলো।

অতপর তিনি মিম্বর থেকে নামলেন এবং উপস্থিত জানতাকে নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়লেন। এই দুই রাকাত ছিলো ঈদের নামাযের মতো আযান ও ইকামত বিহীন। এ নামাযে তিনি উচ্চস্বরে কিরাত পড়েন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আলা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে আল গাশিয়া পড়েন।

তিন : তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিলো এরকম যে, তিনি জুমার দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন মসজিদে নববীর মিম্বরে উঠে একাকী পানি প্রার্থনা করেছেন। এ সময় তিনি নামায পড়েছেন বলে বর্ণিত হয়নি।

চার : চতুর্থ পদ্ধতিটা এই ছিলো যে, তিনি মসজিদে বসে হাত তুলে পানি প্রার্থনা করেছেন এবং এই ভাষায় দু'আ করেছেন :

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مُرِيْعًا طَبَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ ○

অর্থ : আয় আল্লাহ! মিষ্টি পানির বৃষ্টি দিয়ে আমাদের পানি পান করাও। পর্যাপ্ত বৃষ্টি দাও, মন্থর নয়, ক্ষিপ্র বৃষ্টি দাও। ক্ষতিকর নয়, কল্যাণকর বৃষ্টি দাও।"

পাঁচ : তিনি মসজিদের বাইরে যাওয়ারাব-এর কাছে গিয়ে পানি প্রার্থনা করেছেন। বর্তমানে সেই জায়গাটাকেই 'বাবুস সালাম' বলা হয়। একটি পাথর ছুঁড়লে যতোদূর যায়, এই জায়গা মসজিদ থেকে ততোটা দূরে ছিলো।

ছয় : কখনো কখনো তিনি যুদ্ধের সময় পানি প্রার্থনা করেছেন। প্রতিপক্ষ মুশরিকরা পানির কূয়া, চৌবাচ্চা ও ঝর্ণা দখল করে নিলে মুসলিমরা পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। তাঁরা অস্থির হয়ে তাঁর কাছে পানির অভাবের কথা জানায়। তখন তিনি পানি চেয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন।

মুনাফিকরা মুসলমানদের বলছিল, ইনি যদি নবী হতেন, তবে তিনি অবশ্যি পানি প্রার্থনা করলে পানি পাওয়া যেতো, যেভাবে মূসা আ. পানি প্রার্থনা করে পানি পেয়েছিলেন। একথা নবী করীম সা.-এর কানে এলে বললেন, তারা কি সত্যি এমনটি বলেছে? তবে অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের পিপাসা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। একথা বলে তিনি হাত উঠালেন। প্রভুর কাছে পানি প্রার্থনা করলেন। দু'আ থেকে তাঁর হাত নামাবার আগেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেলো। প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো। খাল বিল ও নালায় পানির স্রোত বয়ে চললো। সবাই পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলো। এসময় তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় পানি প্রার্থনা করেছিলেন :

اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ - اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَّرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ ○

অর্থ : আয় আল্লাহ! তোমার বান্দাদেরকে আর তোমার পশু-পাখিগুলোকে পানি পান করাও। তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও। তোমার মৃত শহরকে জীবিত করে দাও। আমাদেরকে মিষ্টি পানির বৃষ্টি বর্ষিয়ে পান করাও এবং পরিতৃপ্ত করে দাও। এ বৃষ্টিকে আমাদের জন্যে কল্যাণকর করো, ক্ষতিকর করোনা। তা শীঘ্রি বর্ষণ করো, বিলম্ব করোনা।"

- রসূলুল্লাহ সা. যখনই বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন, বৃষ্টি হয়েছে।

- কখনো প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো এবং তা ক্ষতির কারণ হতো, তখন রসূলুল্লাহ সা. বৃষ্টি বন্ধ হবার জন্যে প্রার্থনা করতেন।

- মেঘ দেখলে রসূলুল্লাহ সা.-এর মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হতো। কারণ তিনি মেঘ থেকে আল্লাহর আযাবের আশংকা করতেন। যখন বর্ষণ হতো, তখন তাঁর চেহারায় খুশি ও আনন্দের আভা ফুটে উঠতো।

সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে মরফূ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা.-এর বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ ছিলো নিম্নরূপ :

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْعًا غَدَقًا مُجَلِّلاً عَامًّا طَبَقًا سَحًّا دَائِمًا - اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ - اَللّٰهُمَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ

مِنَ الْاَوَّاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَانَشْكُوْهُ اِلاَّ اِلَيْكَ - اَللّٰهُمَّ اَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ

وَأَدِرْ لَنَا الضَّرْعَ وَأَسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ -

اَللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعُرٰى وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ

غَيْرُكَ - اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا - فَاَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا -

অর্থ আয় আল্লাহ! আমাদের এমন বৃষ্টিপাত দ্বারা পান করাও, যাতে পরিতৃপ্ত হই। এমন বৃষ্টিপাত- যা প্রচুর, পরিপূর্ণ, ঘন ও স্থায়ী। আয় আল্লাহ, বৃষ্টিপাত করে আমাদের পান করাও। আমাদেরকে নিরাশ ও বঞ্চিত লোকদের অন্তরভুক্ত করোনা। আয় আল্লাহ! তোমার বান্দারা, তোমার শহরগুলো, তোমার পশুপাখি এবং সৃষ্টিকূল ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও দু:খ কষ্টের মধ্যে আপতিত হয়েছে। এর ফরিয়াদ আমরা তোমার ছাড়া আর কারো কাছে করছিনা। আয় আল্লাহ! আমাদের জন্যে ফসল উৎপন্ন করে দাও! আমাদের পশুগুলোর উলান দুধে ভরে দাও! আমাদেরকে আসমান ও যমীনের বরকত (প্রাচুর্য) থেকে পান করাও! আমাদের জন্যে যমীনের বরকত (প্রাচুর্য) উৎপন্ন করে দাও! আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দু:খ কষ্ট ও বস্ত্রহীনতা দূর করে দাও! আমাদের সমূহ বিপদ মুসীবত দূর করে দাও-যা তুমি ছাড়া কেউই দূর করতে পারেনা। আয় আল্লাহ! আমরা তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অবশ্য অবশ্যি তুমি পরম ক্ষমাশীল দয়াময়। আমাদের জন্যে আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাও।"

- ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ইমামগণ ইস্তিস্কা করার সময় এই দু'আটি করুক-তা আমার খুবই পছন্দ।

- ইমাম শাফেয়ী আরো বলেছেন : আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেয়েছি, - রসূলুল্লাহ সা. দুই হাত তুলে পানি প্রার্থনা (ইস্তিস্কা) করতেন।

- রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বৃষ্টির সময় দু'আ করলে তা ব্যর্থ হয়না।

কসূফ বা সূর্য গ্রহণের নামায[৫৪]

একবার সূর্য উদিত হয়ে কিছুটা উপরে উঠলে সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। রসূলুল্লাহ সা. পেরেশান ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে চাদর টানতে টানতে দ্রুত ঘর থেকে মসজিদের দিকে বেরিয়ে আসেন। এসময় তিনি সামনে গিয়ে

৫৪. সাধারণত 'কসূফ' বলা হয় সূর্যগ্রহণকে আর 'খসূফ' বলা হয় চন্দ্রগ্রহণকে। কিন্তু হাদিসে সূর্যগ্রহণকেই কসূফ এবং খসূফ বলা হয়েছে। রসূল সা. চন্দ্রগ্রহণের সময় নামায পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই। কসূফের নামায এবং খসূফের নামায বলতে সূর্য গ্রহণের নামাযকেই বুঝায়।

জনতাকে নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়েন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা সূরা পড়েন। উচ্চস্বরে কিরাত পড়েন। তারপর লম্বা রুকূ করলেন। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এটা সূরা কিরাতের কিয়াম নয়, রুকূর পরের কিয়াম। রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় বলেন সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহু রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ।' তারপর আবার কিরাত শুরু করলেন। আবার দীর্ঘ রুকূ করেন। তবে এবার পয়লা বারের তুলনায়, কিছুটা কম সময় থাকলেন। অতপর সাজদায় চলে গেলেন এবং লম্বা সাজদা করলেন।

- দ্বিতীয় রাকাত একই ভাবে পড়লেন।

- এভাবে প্রতি রাকাতে তিনি দুটি রুকূ ও দুটি সাজদা করলেন।

- এভাবে আসলে নামায মোট চার রাকাত হলো এবং চার রাকাতে চারটি রুকূ এবং চারটি সাজদা হলো।

এ নামায পড়ার সময় তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছিলেন।

নামায শেষ করে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী খুতবা (ভাষণ) প্রদান করেন। তাঁর সে ভাষণের যতোটুকু লোকেরা মুখস্ত রেখেছে, তা বিভিন্ন রাবি বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সে ভাষণে বলেছেন সূর্য-চাঁদ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো জীবন বা মৃত্যুর সাথে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের কোনো সম্পর্ক নাই। যখন চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন তোমরা আল্লাহকে ডাকবে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করবে, নামায পড়বে এবং দান-সাদকা করবে। হে মুহাম্মদের অনুসারী দল! আল্লাহর কস্‌ম, আল্লাহর কোনো বান্দা বা বান্দী ব্যভিচার করবে- এর চাইতে অধিক ক্ষোভের বিষয় আল্লাহর কাছে আর কিছু নাই। হে মুহাম্মদের অনুসারীগণ! আল্লাহর কস্‌ম, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে অবশ্যি কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।"

"আমি তোমাদেরকে যেসব জিনিসের ওয়াদা দিয়েছি, তা সবই এসময় এখান থেকে দেখতে পেয়েছি। এমনকি আমি জান্নাত দেখার পর সেখান থেকে একগুচ্ছ আংগুর ছিঁড়ে আনবার ইচ্ছা করি, তখন তোমরা আমাকে একটু সামনে এগুতে দেখেছো। কিন্তু একটু সামনে এগুতেই আমি জাহান্নাম দেখতে পেলাম। তার একটি অংশ আরেক অংশ থেকে ভয়ংকর-বীভৎস! তার একটি অংশ আরেক অংশকে চিবিয়ে গ্রাস করছে! এ সময় তোমরা আমাকে পিছিয়ে আসতে দেখেছো। আমি জাহান্নাম থেকে ভয়াবহ কোনো দৃশ্য দেখিনি। আমি দেখতে পেলাম জাহান্নামে যারা শাস্তি ভোগ করছে তাদের বেশিরভাগই নারী।"

- লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : হে আল্লাহর রসূল! এর কারণ কি?
- তিনি বললেন : এর কারণ হলো, তাদের অকৃতজ্ঞতা।
- জিজ্ঞাসা করা হলো : তারা কি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ?
- তিনি বললেন : তারা স্বামী ও প্রতিবেশীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেউ যতোই তাদের উপকার করুক, তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। তুমি যদি সারাজীবনও একজন নারীর উপকার ও কল্যাণ করতে থাকো, অতপর তোমার দ্বারা যদি সামান্য কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তবে সে বলে উঠবে : 'আমি কখনো তোমার থেকে ভালো কিছু পাইনি।'

'আমার কাছে অহী করা হয়েছে, তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সে পরীক্ষা (ফিতনা) হবে দাজ্জালের পরীক্ষার মতো বা সে পরীক্ষার কাছাকাছি। সেখানে তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কেউ এসে প্রশ্ন করবে: এই ব্যক্তি (মুহাম্মদ) সম্পর্কে তুমি কী জানো?

মুমিন জবাব দিবে : ইনি মুহাম্মদ। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি।

তখন তাকে বলা হবে : নিরাপদে ঘুমাও। তুমি পুণ্যবান। আমরা জানতাম, তুমি অবশ্যি মুমিন।

কিন্তু, জবাবে মুনাফিক বলবে : আমি তো তার সম্পর্কে কিছুই জানিনা। লোকজনকে তার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে অপর একটি সূত্রে রসূলুল্লাহ সা.-এর ইস্তিস্কা নামাযের পরের ভাষণ উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. নামাযের সালাম ফিরালেন এবং হামদ, ছানা ও কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ভাষণ (খুতবা) প্রদান করলেন। ভাষণে তিনি বলেন : হে জনতা! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আমি কি আমার প্রভুর বার্তা পৌছে দিতে কোনো প্রকার ত্রুটি করেছি?

তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। আপনি আপনার প্রভুর বার্তা পৌছে দিয়েছেন, আপনার অনুসারীদের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং আপনার দায়িত্ব পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন। আপনি কোনো কিছুতেই ত্রুটি করেননি।'

অতপর তিনি বললেন : একদল লোক মনে করে, সূর্য গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ এবং নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি পৃথিবীর কোনো বড় ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর কারণে ঘটে

থাকে। এসবই মিথ্যা। বরং এগুলো সবই আল্লাহর নিদর্শন। তিনি চান, এগুলো থেকে তাঁর বান্দারা শিক্ষা গ্রহণ করুক এবং তওবা করে নিজেদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুক।

আল্লাহর কসম, আমি যখন নামাযে দাঁড়িয়েছি, তখন তোমাদের দুনিয়াও আখিরাতের সমস্ত অবস্থা অবলোকন করেছি। আল্লাহই অধিক জানেন। ত্রিশজন বড় মিথ্যাবাদীর আগমন ছাড়া কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবেনা। শেষজন কানা দাজ্জাল। তার বাম চোখ বিলুপ্ত থাকবে। যখন সে বের হবে, সে নিজেকে ইলাহ্ বলে দাবি করবে। যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সত্য বলে স্বীকার করবে, তার অনুসরণ করবে, তার অতীতের কোনো নেক আমলই তার কোনো কাজে আসবেনা। আর যে ব্যক্তি তাকে অমান্য ও অস্বীকার করবে, তার অতীতের কোনো পাপের জন্যেই তাকে শাস্তি দেয়া হবেনা। সে কা'বা ও বায়তুল মাকদাস ছাড়া গোটা পৃথিবী দখল করে নেবে। সে মুমিনদের বায়তুল মাকদাসে অবরুদ্ধ করে ফেলবে। তখন মুমিনদের এক সাংঘাতিক অভ্যুত্থান ঘটবে। এর ফলে সে এবং তার বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন দেয়ালের ভিত আর গাছের শিকড় পর্যন্ত ডেকে বলবে হে মুসলিম, হে মুমিন! এই যে এখানে একটা ইহুদি বা কাফির। এসো তাকে হত্যা করো ....।"

সূর্য গ্রহণের নামায ও খুতবা সংক্রান্ত এ বর্ণনাগুলো নবী করীম সা. থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সূর্য গ্রহণের নামায সম্পর্কে অন্যরকম পদ্ধতির বর্ণনাও আছে। সেসব বর্ণনা অনুযায়ী তিনি কখনো প্রতি রাকাতে তিন রুকূ, কখনো চার রুকূ এবং কখনো সাধারণ নামাযের মতো এক রুকূ দিয়ে নামায পড়েছেন।

তবে শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এসব বর্ণনাকে সঠিক মনে করেননা যেমন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারি এবং ইমাম শাফেয়ী। তাঁরা এসব বর্ণনাকে ভ্রান্ত মনে করেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযি ইমাম বুখারির বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি বলেন আমার দৃষ্টিতে সূর্যগ্রহণের নামায সংক্রান্ত হাদিস সমূহের মধ্যে সবচাইতে সহীহ বর্ণনা হলো : রসূল সা. চার রুকূ এবং চার সাজদা দিয়ে এই নামায পড়েছেন। প্রতি রাকাতে দুই রুকূ এবং দুই সাজদা করেছেন।

●●●

১১

দুই ঈদের নামায

ঈদের নামায মাঠে পড়তেন

রসূলুল্লাহ সা. দুই ঈদের নামাযই মাঠে পড়তেন। মদীনার পূর্ব প্রবেশ পথে একটি মাঠ ছিলো। সে মাঠেই তিনি ঈদের নামায পড়তেন। আজকাল সেখানে হাজীদের যানবাহন রাখা হয়।

তিনি একবার ছাড়া আর কখনো ঈদের নামায মসজিদে পড়েননি। সেই একবারও মসজিদে পড়েছিলেন বৃষ্টির কারণে। একথা বর্ণিত হয়েছে সুনানে আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্‌তে।

ঈদের দিন কি করতেন ?

সব সময় ঈদগাহে নামায পড়াই ছিলো তাঁর রীতি।

ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বেরুবার সময় তিনি সাধ্যানুযায়ী সুন্দরতম পোশাক পরিধান করতেন। দুই ঈদ ও জুমার সময় পরার জন্যে তাঁর একটি হোল্লা (ঢিলা লম্বা গাউন বা আলখেল্লা) ছিলো।

একবার তিনি দুটি সবুজ চাদর পরে ঈদগাহে গিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, একবার তিনি লাল চাদর পরে ঈদগাহে গিয়েছেন। আসলে ওটা লাল চাদর ছিলোনা। পাড়ে লালচে কাজ করা ছিলো। এটা হতে পারেনা যে, তিনি লাল চাদর পরেছেন। কারণ, তিনি লাল ও গৈরিক (গেরুয়া) পোষাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। একবার তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের পরণে দুটি লাল বসন দেখে তাকে সেগুলো জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। এমন অপছন্দ করা সত্ত্বেও তিনি নিজে তা পরেছেন, তা কী করে হতে পারে?- তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বুঝা যায়, লাল পোশাক (পুরুষের জন্যে) হয় হারাম, নয়তো কমপক্ষে মাকরূহ তাহরিমী।

ঈদুল ফিতরের দিন তিনি ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বেরুবার আগে কয়েকটি খেজুর খেয়ে নিতেন। সেগুলোর সংখ্যা হতো বিজোড়।

ঈদুল আযহার দিন নামায থেকে ফিরে আসার পূর্বে কিছু খেতেন না। নামায থেকে ফিরে এসে কুরবানীর গোশত খেতেন।

তিনি দুই ঈদের দিন (ঈদগাহে যাবার আগে) গোসল করতেন। এটাই সহীহ হাদিস। কিন্তু এ প্রসংগে ভিন্ন রকম দুটি জয়ীফ হাদিস আছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কড়াকড়ি ভাবে সুন্নতের অনুসরণ করতেন। তাই দুই ঈদেই তিনি গোসল করে বের হতেন।

রসূলুল্লাহ সা. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন।

ঈদগাহে যাবার কালে তাঁর সামনে সামনে নেযা বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। ঈদগাহে পৌঁছার পর নেযা খাড়া করে গেড়ে রাখা হতো, যাতে করে তিনি সেটাকে সামনে রেখে নামাযে দাঁড়াতে পারেন। কারণ, ঈদগাহ ছিলো খালি মাঠ। সম্মুখে কোনো প্রাচীর বা খুঁটি ছিলোনা। তাই এ অস্ত্রটিকে সুতরা হিসেবে ব্যবহার করতেন।

তিনি ঈদুল ফিতরের নামায দেরি করে পড়তেন।

তিনি ঈদুল আযহার নামায সকাল সকাল পড়তেন। এই সুন্নতটি কড়াকড়িভাবে পালন করার জন্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ঈদুল আযহার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতেন।

তিনি সা. ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর উচ্চারণ করতে থাকতেন।

ঈদের নামায কিভাবে পড়তেন?

রসূলুল্লাহ সা. ঈদগাহ পৌঁছেই নামায শুরু করে দিতেন। নামাযের আগে আযানও দেয়া হতোনা, ইকামতও দেয়া হতোনা এবং নামায শুরু হচ্ছে বলে ঘোষণাও দেয়া হতোনা। এর কিছুই তিনি করতেন না। এটাই সুন্নত।

তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ ঈদগাহে পৌঁছে এই দুই রাকাত নামাযের আগে বা পরে আর কোনো নামায পড়তেন না।

তিনি খুতবার আগেই নামায পড়তেন।

তিনি দুই রাকাত নামায পড়তেন।

প্রথম রাকাতে সাতবার তাকবীর বলতেন। তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথেই সাতবার তকবীর বলতেন। প্রতি দুই তাকবীরের মাঝে সামান্য থামতেন। দুই তাকবীরের মাঝে কোনো যিকর বা তাসবীহ্ পড়তেন বলে প্রমাণ নেই। তবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, তিনি হামদ্ সানা ও দরূদ পড়তেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. রসূল সা.-কে অনুসরণ করে প্রতি তকবীরে 'রফে ইয়াদাইন' করতেন।

তকবীর শেষ করে তিনি কিরাত শুরু করতেন। সূরা ফাতিহার পর এক রাকাতে 'নূন ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' সূরা পড়তেন এবং অপর রাকাতে 'ইকতারাবাতিস্ সা'আতু ওয়ান শাক্কাল কামার' সূরা পড়তেন। কখনো কখনো 'সাব্বিহ ইসমি রাব্বিকাল আলা' এবং 'হাল আতাকা হাদিসুল গাশীয়া' সূরা পড়তেন। এগুলোই সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বর্ণনা সহীহ নয়।

কিরাত শেষ করার পর তকবীর বলে রুকূ ও সাজদা করতেন।

প্রথম রাকাত শেষে সাজদা থেকে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে পরপর পাঁচবার তকবীর বলতেন। তকবীর শেষ করে কিরাত শুরু করতেন।

এভাবে প্রত্যেক রাকাত তিনি তকবীর সমূহ দ্বারা শুরু করতেন এবং কিরাত শেষ করেই রুকুতে যেতেন।[৫৫] (তকবীর সংক্রান্ত এসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিরমিযি, ইবনে মাজাহ ও দারমিতে।)

কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. প্রথম রাকাতে সূরা কিরাতের পূর্বে তকবীর বলেছেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কিরাতের পরে তকবীর বলেছেন। কিন্তু এসব বর্ণনা প্রমাণিত নয়। এই বর্ণনাটির সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে মুয়াবিয়া নিশাপুরি নামে এক ব্যাক্তি রয়েছে। বায়হাকি বলেছেন, এ ব্যক্তি যে মিথ্যার সাথে জড়িত, তা একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

ইমাম তিরমিযি কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আউফ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতার ও দাদার সূত্রে শুনেছেন : রসূলুল্লাহ সা. দুই ঈদের নামাযেই প্রথম রাকাতে কিরাতের পূর্বে সাতবার তকবীর বলেছেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পূর্বে পাঁচবার তকবীর বলেছেন।

তিরমিযি বলেন, আমি এই হাদিসটি সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল অর্থাৎ ইমাম বুখারিকে জিজ্ঞেস করেছি। ইমাম বুখারি বলেছেন ঈদের নামাযের তকবীর সম্পর্কে এর চেয়ে বিশুদ্ধ কোনো হাদিস নেই।

---

৫৫. আবু দাউদে একজন তাবেয়ী থেকে চার চার তাকবীরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, তিনি সাহাবি আবু মূসা এবং হুযাইফা রা.-কে জিজ্ঞাসা করে এ সংবাদ জানতে পেরেছেন। এ তাবেয়ীর নাম সায়ীদ ইবনুল আস।

ইমাম তিরমিযি বলেন, এই হাদিসটি সম্পর্কে আমার এবং ইমাম বুখারির একই মত।

তিনি নামাযের পরে ভাষণ (খুতবা) দিতেন

রসূলুল্লাহ সা. নামায শেষ করে ঘুরে জনতার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতেন। জনতা তাদের নিজ নিজ সারিতেই বসা থাকতো। দাঁড়িয়ে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ (খুতবা) দিতেন। ভাষণে তিনি তাদেরকে উপদেশ পরামর্শ এবং আদেশ নিষেধ প্রদান করতেন।

কোথাও সৈন্য বাহিনী পাঠানোর থাকলে এখান থেকেই পাঠাতেন।

কোনো নির্দেশ জারি করার থাকলে এখান থেকেই জারি করতেন।

ভাষণ দেবার জন্যে সেখানে (ঈদগাহে) কোনো মিম্বর ছিলনা। তাছাড়া মদিনার মসজিদ থেকেও মিম্বর বের করে আনা হয়নি। তিনি ভূমিতে দাঁড়িয়েই ভাষণ দিতেন।

জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার আগেই আযান ও ইকামত ছাড়া নামায পড়েছেন। নামায শেষ করে বিলালের কাঁধে ভর দিয়ে খুতবা দিয়েছেন। খুতবায় তিনি আল্লাহকে ভয় করার ও আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশ দেন, লোকদের বিভিন্ন উপদেশ দেন ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন। অতপর তিনি মহিলাদের সমাবেশে আসেন, তাদেরকেও উপদেশ দেন এবং নসীহত করেন। (বুখারি ও মুসলিম)

আবু সায়ীদ খুদরি রা. থেকে একটি বর্ণনায় জানা যায়, রসূলুল্লাহ সা. বাহনে চড়ে ভাষণ দিয়েছেন।

জাবির রা. থেকেও একটি বর্ণনা রয়েছে, তাতে তিনি বলেন, নবী করীম সা. ঈদগাহে এসে প্রথমে নামায পড়লেন। নামায শেষে খুতবা দিলেন। খুতবা শেষ করে নেমে গেলেন এবং মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন।

তিনি আল্লাহর প্রশংসা করার মাধ্যমে খুতবা শুরু করতেন। তিনি তকবীর বলে খুতবা শুরু করতেন বলে প্রমাণ নেই।

নবী করীম সা. এর মুয়াযিযন সাআদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সা. খুতবায় বেশি বেশি তকবীর বলতেন এবং দুই ঈদের খুতবায় আরো অধিক তকবীর বলতেন। তবে এ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়না যে, তিনি তকবীর বলে খুতবা শুরু করতেন।

যারা ঈদের নামাযে উপস্থিত হতো রসূল সা. তাদেরকে খুতবা শোনার জন্য বসার এবং চলে যেতে চাইলে চলে যাবার রুখসত দিতেন। একবার জুমার দিন ঈদ হলে তিনি তাদেরকে রুখসত দিয়েছিলেন।

ঈদগাহে যাওয়া আসার পথ পরিবর্তন করতেন।

রসূলুল্লাহ সা. ঈদগাহে যাওয়া আসার পথ পরিবর্তন করতেন। তিনি ঈদগাহে যাওয়ার সময় এক পথে যেতেন এবং ফিরে আসার সময় আরেক পথে ফিরে আসতেন। পথ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছেন।

কেউ বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো, দুই পথে অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দেয়া।

কেউ কেউ বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো, উভয় অঞ্চলের লোককে ঈদের বরকত পৌঁছে দেয়া।

কেউ কেউ বলেছেন এর উদ্দেশ্য হলো, উভয় পথের অভাবী লোকদের সাহায্য করা।

কেউ কেউ বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো, সকল অলি-গলি ও পথে প্রান্তরে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটানো।

কেউ কেউ বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো, মুনাফিকদের ইসলামের শান শওকত ও দাপট প্রদর্শন করা।

কেউ কেউ বলেছেন, বেশি বেশি ভূমিকে মুসল্লিদের জন্যে সাক্ষ্য বানানো।

●●●

১২

জানাযার নামায

মাইয়্যেতের সাথে সর্বোত্তম আচরণ

রসূলুল্লাহ সা. যখন কোনো রোগীর জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হতেন তখন বলতেন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যি আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাবো।”

তিনি এ ধরনের রোগীকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, অসিয়ত করতে বলতেন, তওবা করতে বলতেন এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর একত্বের ঘোষণা সম্বলিত এই সর্বোত্তম বাক্যটি বারবার উচ্চারণ করতে বলতেন, যাতে করে ঈমানের এই ঘোষণাই হয় তার জীবনের সর্বশেষ উচ্চারণ।

কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে তিনি তার ব্যাপারে সর্বোত্তম কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতেন। মৃত ব্যাক্তির ব্যাপারে তাঁর আচরণ ছিলো সর্বাধিক কল্যাণধর্মী। মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাঁর প্রবর্তিত কর্মনীতি ছিলো মৃত ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর, তার আত্মীয় স্বজনদের জন্য সান্ত্বনা দায়ক এবং জীবিত লোকদের জন্যে উপদেশ ও শিক্ষামূলক।

তিনি মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনও মহান আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে সম্পন্ন করতেন।

তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য সালাতে জানাযার[৫৬] পদ্ধতি চালু করেন।

তিনি মৃত ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে দাঁড়াতেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর পিছে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতেন। তারা তাঁর সাথে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তার জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করতেন এবং তার পরকালীন মুক্তির জন্য দু'আ করতেন। কফিনের সাথে কবর পর্যন্ত যেতেন। উত্তম পদ্ধতিতে তাকে কবরস্থ করতেন। তারপর তিনি এবং তাঁর সাথিগণ কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তার জন্য পরবর্তী

---

৫৬. সালাত মানে দু'আ। ‘সালাতে জানাযা ’ মানে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা। সালাতে জানাযাকে আমরা ‘জানাযার নামায’ বলে থাকি। এটা মুলত মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আর অনুষ্ঠান।

অধ্যায়গুলোতে মুক্তির প্রার্থনা করতেন। কারণ মৃত্যুর পর পরবর্তী অধ্যায়গুলোর মুক্তিই তার জন্য বেশি প্রয়োজন।

অতপর তিনি মাঝে মধ্যে গিয়ে তার কবর যিয়ারতের রীতি চালু করেন এবং যিয়ারতকালে তাকে সালাম দেয়া এবং তার জন্য দু'আ করার রীতি চালু করেন। এ যেনো জীবিতকালে প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়া, তাকে সালাম দেয়া, এবং তার কুশল ও মঙ্গল কামনা করা।

- মৃতের জন্যে তিনি চিৎকার করে কান্না, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া, মাথা কামানো এবং উচ্চস্বরে বিলাপ করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন।

- পক্ষান্তরে তিনি মৃতের জন্য শোক সন্তপ্ত হওয়া, নিরবে কান্নাকাটি করা ও হৃদয় ভারাক্রান্ত করার রীতি চালু করেছেন।

- মৃত ব্যক্তির জন্য তিনি এসবই করতেন। তিনি বলতেন মৃত ব্যক্তির জন্য চক্ষু অশ্রুপাত করবে, হৃদয় ভারাক্রান্ত হবে এবং যবানে তাই উচ্চারিত হবে যাতে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন।

মাইয়্যেতের গোসল ও কাফন

রসূল সা. এর সুন্নত ছিলো, যে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তিনি তাকে গোসল করিয়ে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করতেন। তার গায়ে আতর ও সুগন্ধি লাগাতেন। সাদা কাপড় দিয়ে কফিন পরাতেন। তাঁর নির্দেশে সাহাবায়ে কিরাম এভাবেই মৃত ব্যক্তিকে সাজাতেন। তারপর তিনি তার জন্য সালাতে জানাযা পড়তেন।

তিনি সাধারণত জানাযা মসজিদে পড়তেন না। তবে দু'একবার মসজিদে পড়ার প্রমাণও আছে। দু'ভাবে পড়াই বৈধ। তবে মসজিদের বাইরে পড়াই উত্তম।

মৃতকে চুমু খাওয়া

রসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নত হলো, মৃত্যুর সাথে সাথে মাইয়্যেতের লাশকে সোজা করে দেয়া। তার চোখ বন্ধ করে দেয়া এবং তার মুখ ও শরীর ঢেকে দেয়া।

তিনি কখনো কখনো মাইয়্যেতকে চুমু খেতেন। তিনি উসমান ইবনে মাযইন রা. এর মৃত্যুর পর তাকে চুমু দিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্য কেঁদেছিলেন।

রসূলুল্লাহ সা. এর ওফাতের পর আবু বকর সিদ্দিক রা. তার কফিনের উপর উপুড় হয়ে তাকে চুমু খেয়েছিলেন।

শহীদদের গোসল ও জানাযা নেই

যারা আল্লাহর পথে শহীদ হতো তিনি তাদের গোসল দেয়াতেন না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সা. শহীদদের গোসল দেয়াতে নিষেধ করেছেন।

শহীদদের হাতিয়ার ও চামড়ার পরিধেয় খুলে নিয়ে তাদের বাকি সব পোশাক সহই তাদরে দাফন করতেন।

তিনি শহীদদের জানাযাও পড়তেন না। কারণ শাহাদাতের মাধ্যমেই শহীদদের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

যানাযার আগে ঋণ আদায়

তাঁর কাছে যখন জানাযার জন্যে কোনো মাইয়্যেতকে আনা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন এই ব্যক্তির কোনো ঋণ আছে কি? যদি মৃত ব্যক্তি দেনাদার না হতো তবে তিনি তার জানাযা পড়াতেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি দেনাদার হতো তবে তিনি নিজে জানাযা পড়াতেন না । সাহাবায়ে কিরামকে বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড়ে নাও। আসলে রসূলুল্লাহর জানাযা ছিলো মৃত ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ। তার সুপারিশ অবশ্যি কবুল হতো। অথচ ঋণী ব্যাক্তির ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে যাবেনা। তাই আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে স্বচ্ছলতা দান করেন, তখন তিনি নিজেই মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে তার জানাযা পড়াতেন এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার ওয়ারিশদের দিয়ে দিতেন।

তিনি কিভাবে সালাতুল জানাযা পড়াতেন ?

- রসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নত ছিলো, তিনি মাইয়্যেত পুরুষ হলে তার মাথা বরাবর আর মহিলা হলে তার শরীরের মাঝখানে বরাবর দাঁড়াতেন।

তিনি আল্লাহু আকবর বলে জানাযার নামায শুরু করতেন। তারপর আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করতেন।

- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. একবার জানাযা পড়াতে গিয়ে তাকবীরের পর উচ্চস্বরে ফাতিহা পাঠ করেন। তিনি বলেন, আমি এজন্য এরকম করেছি যাতে করে তোমরা জানতে পারো-জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নত।

- একইভাবে আবু উমামা ইবনে সাহল রা. বলেছেন, জানাযার প্রথম তকবীরের পরে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নত। তার সূত্রে নবী করীম সা. থেকে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে এই হাদিসটির সনদ (সূত্র) বিশুদ্ধ নয়।

আমাদের শাইখ ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়, তবে সুন্নত।

- আবু উমামা ইবনে সাহল রা. একদল সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, জানাযার নামাযে রসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ করতে হবে।

- উবাদা ইবনে সামিতকে রসূলুল্লাহ সা. জানাযার নামায কিভাবে পড়তেন, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন :

আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যি বলবো তিনি কিভাবে জানাযার নামায পড়তেন। তুমি 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করবে, অতপর নবী করীম সা.-এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ করবে। অতপর মৃত ব্যক্তির জন্য এভাবে দু'আ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا عَبْدُكَ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ لَهُ فِىْ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ - اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার এই দাস তোমার সাথে শিরক করতোনা। আর তুমিইতো তার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানো। এই ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয়ে থাকে, তবে তুমি তার পুণ্য আরো বাড়িয়ে দাও। আর সে যদি পাপী হয়ে থাকে তবে তার পাপগুলো ক্ষমা করে দাও। আয় আল্লাহ! তার পুরস্কার থেকে আমাদের বঞ্চিত করোনা। তার পরে আমরা যারা বেচে আছি তুমি তাদের বিপথগামী করোনা।"

দু'আর কথা লোকেরা যেভাবে মুখস্থ রেখেছে, সূরা ফাতিহা ও দরূদ এর কথা সেরকম বেশি মুখস্থ রাখেনি।

- তিনি মাইয়্যেতের জন্য নিম্নরূপ দু'আ করতেন বলেও বর্ণিত আছে :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ - وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ - وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهٖ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ○

অর্থ: আয় আল্লাহ! এই মাইয়্যেতকে ক্ষমা করো, তার প্রতি রহম করো এবং তার প্রতি কোমল হও। তার আগমনকে সম্মানজনক করো। তার প্রবেশ পথকে প্রশস্ত করো। তাকে ঠান্ডা ও পানি বরফ দ্বারা ধুয়ে দাও। তার গুনাহখাতা এমনভাবে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। তার ঘরের চাইতে উত্তম ঘর তাকে দাও, তার পরিজন থেকে উত্তম পরিজন তাকে দাও। তার সাথি থেকে উত্তম সাথি তাকে দাও। আর তাকে তুমি জান্নাতে স্থান দাও। তাকে কবর আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।"

- তিনি নিম্নরূপ দু'আ করেছেন বলেও বর্ণিত আছে :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا –
اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ
اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ○

অর্থ : আয় আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করে দাও। আমাদের মধ্যে যাদেরকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে চাও তাদেরকে ইসলামের উপর রাখো। আর যাদেরকে মৃত্যু দিতে চাও তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও। আয় আল্লাহ! তার সওয়াব থেকে আমাদের বঞ্চিত করোনা এবং তার পরে আমাদের জীবিতদেরকে কোনো পরীক্ষায় ফেলোনা।"

রসূলুল্লাহ সা. জানাযার নামাযে মহিলাদের জন্যে নিম্নরূপ দু'আ করেছেন বলেও প্রমাণিত আছে :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ رَزَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا الْاِسْلَامَ وَاَنْتَ
قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَتَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَّتَهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا ○

অর্থ আয় আল্লাহ! তুমি এই মহিলাটির প্রভু। তুমিই তাকে সৃষ্টি করেছো। তুমিই তাকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছো। আর এখন তুমিই তার রূহ কবয করেছো। আমরা তার জন্য তোমার দরবারে সুপারিশ করতে এসেছি। তুমি দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দাও।"

রসূলুল্লাহ সা. মৃতদের জন্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দু'আ করতে আদেশ করেছেন।

জানাযায় তকবীর কয়টি?

রসূলুল্লাহ্ সা. চার তকবীরে জানাযা পড়তেন। তিনি পাঁচবার তকবীর বলেছেন বলেও সহীহ্ সূত্রে জানা যায়।

তাঁর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কিরাম কেউ চার, পাঁচ এবং কেউ ছয় তকবীরে জানাযা পড়েছেন।

যায়েদ ইবনে আরকাম পাঁচ তকবীরে জানাযা পড়েছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সা. পাঁচ তকবীরে জানাযা পড়তেন। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সহীহ্ মুসলিমে।

আলী রা. সহল ইবনে হানিফের নামাযে জানাযা ছয় তকবীরে পড়েছেন। তিনি বদরী সাহাবীদের জানাযা ছয় তকবীরে পড়াতেন। অন্যান্য সাহাবীদের জানাযা পাঁচ তকবীরে পড়াতেন। এছাড়া অন্যান্য লোকদের জানাযা চার তকবীরে পড়তেন। এ কথা বর্ণনা করেছেন ইমাম দারু কুতনি।

সায়ীদ ইবনে মনসুর হাকাম থেকে এবং তিনি ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন যে সাহাবায়ে কিরাম বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণের নামাযে জানাযা পাঁচ, ছয় ও সাত তকবীরে পড়তেন।

এসবই সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত বিশুদ্ধ আসার। এর মধ্যে যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করাই বৈধ। এর কোনোটিকেই অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কারণ রসূলুল্লাহ্ সা. নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ চারের অধিক তকবীর বলেছেন।

যারা চার তকবীরের অধিক তকবীর বলতে নিষেধ করেন, তারা ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। তাতে ইবনে আব্বাস রা. বলেন রসূলুল্লাহ্ সা. জীবনের শেষ জানাযা চার তকবীরে পড়েছেন। তাদের মতে কোনো বিষয়ে রসুলুল্লাহ্ সা. এর জীবনের শেষ কাজই সে বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়াসালা।

যে সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. থেকে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে তা খুবই দুর্বল এবং একেবারে ত্রুটিপূর্ণ। ইমাম আহমদ বলেছেন, এই বক্তব্য মিথ্যা এবং এর কোনো ভিত্তি নেই। এ হাদিসের সূত্রে (সনদে) মিথ্যা হাদিস রচনাকারী ব্যক্তি রয়েছে।

জানাযার নামাযে কয়টি সালাম?

রসূলুল্লাহ্ সা. জানাযার নামাযে একটি সালাম বলতেন বলে বর্ণিত আছে। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর দু'টি সালামের কথাও আছে।

- ইমাম বায়হাকি প্রমুখ মাকবারীর সূত্রে আবু হুরাইরা রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. একবার চার তকবীর ও এক সালামে জানাযা পড়েছেন।"

- ইমাম আহমদ বলেছেন, এই হাদিসটি মওদূ।

তবে ইমাম আহমদ সহীহ সূত্রে এক সালামের কথাও বর্ণনা করেছেন এবং দুই সালামের কথাও বর্ণনা করেছেন।

- সাহাবায়ে কিরাম এক সালামেও জানাযা শেষ করেছেন, দুই সালামেও জানাযা শেষ করেছেন।

জানাযায় রফে ইয়াদাইন

রসূলুল্লাহ সা. কি জানাযায় রফে ইয়াদাইন করতেন? এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : ঐতিহ্য এবং নামাযে রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নতের উপর কিয়াস করে ধরে নিতে হবে, জানাযায় রফে ইয়াদাইন করতে হবে। কারণ রসূলুল্লাহ সা. নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রত্যেক তকবীরের সাথে রফে ইয়াদাইন করতেন।

ইবনে উমর ও আনাস রা. জানাযায় প্রত্যেক তকবীরের সাথে রফে ইয়াদাইন করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

বায়হাকি বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. প্রথম তকবীরে রফে ইয়াদাইন করতেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখতেন।

তিনি কবরে জানাযা পড়েছেন

রসূলুল্লাহ সা. এর রীতি ছিলো, তিনি যদি কারো কবর দেয়ার আগে জানাযার নামায পড়তে না পারতেন, তবে কবর দেয়ার পর কবরে গিয়ে তার জানাযার নামায পড়তেন।

একবার এক ব্যক্তিকে কবর দেয়ার এক রাত্রি পরে তিনি তার কবরে গিয়ে জানাযার নামায পড়েছেন। একবার একটি কবরে দাফন করার তিনদিন পর জানাযার নামায পড়েছেন। আরেকটি কবরে একমাস পর পড়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করেননি।

ইমাম আহমদ বলেছেন, কবরে জানাযার নামায পড়ার ব্যাপারে কার সন্দেহ আছে? যেখানে নবী করীম সা. কারো জানাযার নামায বাদ পড়লে তার কবরে গিয়ে জানাযার নামায পড়তেন বলে বর্ণিত আছে, সেক্ষেত্রে সন্দেহ থাকার কোনো অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে ছয়টি সূত্রে হাদিস বর্ণিত রয়েছে। সবগুলো সূত্রই হাসান (উত্তম)।

- ইমাম আহমদ কবরে জানাযা পড়ার সময়সীমা এক মাস নির্ধারণ করেছেন।

- ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, লাশ পঁচে গলে বিকৃত হবার আগ পর্যন্ত কবরে জানাযার নামায পড়া যাবে।

- ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক মৃত ব্যক্তির অভিভাবক ছাড়া আর কারো জন্যে কবরে জানাযার নামায পড়া সঠিক মনে করেননি। তাঁরা বলেছেন, কবরস্থ করার পূর্বে অলি (অভিভাবক) অনুপস্থিত থাকলে তিনি ফিরে এসে কবরে জানাযা পড়তে পারবেন।

শিশুর জানাযা

বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা শিশুর জানাযা নামায পড়বে।

সুনানে ইবনে মাজাহ্‌তে মরফূ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমরা শিশুদের জানাযার নামায পড়বে। কারণ তারা তোমাদের আগে পাঠানো নেক আমল। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায়, গর্ভচ্যুত শিশুর বয়েস চার মাস হলে তার জানাযা পড়তে হবে।

আত্মহত্যাকারী, প্রতারক ও মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির জানাযা

- রসূলুল্লাহ্ সা. আত্মহত্যাকারীর জানাযা নামায পড়তেন না।

- তিনি গণীমতের মাল আত্মসাৎকারীর জানাযার নামাযও পড়তেননা।

- তিনি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়েছেন কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ আছে।[৫৭]

কফিনের সহগামী হওয়া

রসূলুল্লাহ্ সা.-এর রীতি ছিলো তিনি কোনো মাইয়্যেতের জানাযার নামায পড়ার পর কফিনের সাথে কবর পর্যন্ত যেতেন। এ সময় তিনি পায়ে হেঁটে কফিনের আগে আগে চলতেন।

- তাঁর ইন্তেকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতও এটাই ছিলো।

- তিনি এই রীতিও চালু করেন, যারা যানবাহনে করে কফিনের সাথে যাবে, তারা কফিনের পিছে থাকবে। আর যারা পায়ে হেঁটে যাবে, তারা কফিনের নিকটবর্তী চারপাশে থাকবে- সামনে পিছে ও ডানে বামে।

---

৫৭. রসূল সা. দেনাদার, আত্মহননকারী ও আত্মস্যাৎকারীর জানাযা না পড়লেও সাহাবীগণকে পড়তে বলেছেন। ফকীহগণ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানেরই জানাযা পড়া হবে। - ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ, ১ম খণ্ড।

- তিনি কফিন নিয়ে দ্রুত চলতে বলতেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম কফিন নিয়ে দ্রুত কবরের দিকে এগিয়ে যেতেন।

আজকাল কফিন নিয়ে কবরে যেতে যে ধীর গতি অবলম্বন করা হয় তা বিদআত, মাকরূহ, সুন্নতের খেলাফ এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুসৃত নীতি। কফিনের সাথে কাউকে ধীরে চলতে দেখলে আবু বকর রা. তার প্রতি ছড়ি উত্তোলন করে বলতেন : তুমি, কি দেখনি আমরা রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সাথে কফিন নিয়ে কত দ্রুত চলতাম।

- রসূলুল্লাহ্ সা. যখন কফিন নিয়ে কবরের দিকে যেতেন, তখন পদব্রজে চলতেন। তিনি বলতেন ফেরেশতারা পদব্রজে চলছে, আমি কি করে বাহনে করে যেতে পারি।

- মাইয়্যেতকে দাফন করে ফেরার সময় তিনি কখনো পদব্রজে ফিরতেন আবার কখনো বাহনে করে ফিরতেন।

কফিনের সাথে গিয়ে মাইয়্যেতকে যমীনে রাখার আগ পর্যন্ত তিনি বসতেননা।

গায়েবানা জানাযা

বহু মুসলিম দূরে বিভিন্নস্থানে মৃত্যুবরণ করায় তাদের জানাযার নামায পড়া হয়নি। সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যুর পর রসূলুল্লাহ সা. তার গায়েবানা জানাযা পড়েছেন। এ বিষয়ে তিনটি মত সৃষ্টি হয়েছে :

১. একটি মত হলো, রসূলুল্লাহ সা. গায়েবানা জানাযার বিধান চালু করেছেন। তাই দূরের মাইয়্যেত্যের জন্যে গায়েবানা জানাযা পড়া উম্মতের জন্যে সুন্নত। এমত হচ্ছে ইমাম শাফেয়ীর রহ.। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদেরও এটাই মত।

২. ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম মালিক রহ. বলেছেন, রসূল সা. যে নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা পড়েছেন, তা কেবল নাজ্জাশীর জন্যেই খাস্ ছিলো। এটা অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রসূলুল্লাহ্ সা. নাজ্জাশী ছাড়া আর কারো গায়েবানা জানায পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই। তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়ার প্রমাণ মাত্র একটি, আর না পড়ার প্রমাণ অনেক। তাই গায়েবানা জানাযা পড়া যেমন সুন্নত, তেমনি না পড়াও সুন্নত।

৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে এ ব্যাপারে উত্তম পন্থা হলো, কেউ যদি এমন কোথাও মারা যায়, এবং সেখানে তাঁর নামাযে জানাযা পড়া না হয়ে থাকে, তবে তার গায়েবানা জানাযা পড়তে হবে। যেমন নবী করীম সা. নাজ্জাশীর জানাযা পড়েছিলেন। কারণ তিনি অমুসলিম দেশে মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর নামাযে জানাযা পড়া হয়নি। পক্ষান্তরে কেউ যদি এমন কোথাও মারা যায়, যেখানে তার নামাযে জানাযা পড়া হয়েছে, তবে তার জন্যে গায়েবানা জানাযা পড়া যাবেনা। কারণ, তার জানাযা পড়ার যে ফরয মুসলমানদের উপর বর্তিয়েছিল, তা আদায় হয়ে গেছে। নবী করীম সা. গায়েবানা জানাযা পড়েছেন, আবার বর্জনও করেছেন। তাই তা পড়া এবং না পড়া দুটোই সুন্নত। তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়ার ক্ষেত্র ছিলো আলাদা, আর না পড়ার ক্ষেত্রেও ছিলো আলাদা।

দাফন ও কবর সংক্রান্ত অন্যান্য কথা

- মাইয়্যেতকে যখন কবরে রাখা হতো, তখন রসূলুল্লাহ সা. এই কথাগুলো উচ্চারণ করতেন : بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ○

অর্থ : আল্লাহর নামে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর রসূলের আদর্শের উপর তাকে কবরস্থ করছি।"

অপর বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, এসময় রসূল সা. নিম্নোক্ত বাক্য উচ্চারণ করতেন :

بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ○

অর্থ : আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে এবং আল্লাহর রসূলের আদর্শের উপর তাকে দাফন করছি।"

- একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, মাইয়্যেতকে কবরে রাখার পর রসূলুল্লাহ সা. নিজ হাতে মাটি তুলে কবরে দিয়েছেন। তিনি তিন মুষ্টি মাটি দিয়েছেন। মাথার দিক থেকে মাটি দেয়া শুরু হতো।

দাফন শেষ হলে তিনি এবং তাঁর সাথিরা কবরের উপর দাঁড়িয়ে মাইয়্যেতের জন্যে তাসবীতের প্রার্থনা করতেন।[৫৮] তিনি তাঁর সাথিদেরকে মাইয়্যেতের জন্যে তাস্‌বীতের প্রার্থনা করতে বলতেন।

- কবর বাঁধানো, উঁচু করা, এবং কবরের উপর সৌধ বা গম্বুজ নির্মাণ করা

৫৮. অর্থাৎ- কবরের সওয়াল জওয়াবের সময় যেনো অবিচলিত থেকে জওয়াব দিতে পারে, সেজন্যে প্রার্থনা করতেন।

নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ সা. হযরত আলীকে পাঠিয়ে এ ধরনের কবর গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।

- রসূলুল্লাহ সা. কবরকে সাজদার স্থল বানাতে নিষেধ করেছেন। তিনি কবর সামনে রেখে নামায পড়তেও নিষেধ করেছেন।

- তিনি কবরে বাতি দিতে নিষেধ করেছেন।

- তিনি কবরকে উরুছ, আস্তানা, মেলা ও আখড়াস্থল বানাতে নিষেধ করেছেন। এসব কাজ যারা করবে তিনি তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন।

- তাঁর সুন্নত এটাই ছিলো যে, কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যাবেনা এবং কবরকে অবমাননাও করা যাবেনা।

- তিনি মহিলাদেরকে কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। এমনটি যারা করবে তাদের অভিসম্পাত করেছেন।

- রসূলুল্লাহ সা. যখন কবর যিয়ারত করতেন, তা করতেন তাদের জন্যে দু'আ করার উদ্দেশ্যে, তাদের প্রতি রহমত প্রার্থনার জন্যে,তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করার উদ্দেশ্যে।

কবর যিয়ারতের সময় তিনি সাহাবীগণকে একথাগুলো বলতে বলেছেন :

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ ○

অর্থ : হে মুমিন ও মুসলিম ঘরবাসী! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইনশাল্লাহ আমরা অবশ্যি তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

- তাঁর এ রীতি ছিলো যে, তিনি মৃতের পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন। তাদের আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিয়ে সবর করতে বলতেন।[৫৯]

সমাপ্ত

---

৫৯. আলহামদুল্লিহ্ রসূলুল্লাহ সা.-এর নামায সংক্রান্ত এই মূল্যবান প্রমাণিত গ্রন্থটির অনুবাদ এখানেই শেষ হলো। রসূলুল্লাহ সা.-এর নামায পড়ার পদ্ধতি থেকে মহিলাদের জন্যে নামায পড়ার ভিন্ন কোনো পদ্ধতি জানা যায় না। তিনি মহিলাদেরকে ভিন্ন পদ্ধতিতে নামায পড়তে বলেছেন বলেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই সুন্নত অনুযায়ী পুরুষ ও মহিলাদের নামায পড়ার পদ্ধতি একই।

বিবিসি প্র : ১২

আবদুস শহীদ নাসিম
লিখিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
আল কুরআন আত্ তাযকীর
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআনের সাথে পথ চলা
কুরআন ও পরিভাষা
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অঙ্গীকার
ঈমানের পরিচয়
মুক্তির পথ ইসলাম
আসুন আমরা মুসলিম হই
ইসলামের পারিবারিক জীবন
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আল কুরআনের দু'আ
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
নির্বাচনে জেতার উপায়
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
কুরআন বুঝার পয়লা সবক
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও. মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)

কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খণ্ড
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
সাকুছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)

অনূদিত বই

আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
মহিলা ফিকহ্ ১ম খণ্ড
মহিলা ফিকহ্ ২য় খণ্ড
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
এন্তেখাবে হাদীস
যাদে রাহ্
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
দাওয়াত ইলাল্লাহ দা'য়ী ইলাল্লাহ

প্রাপ্তিস্থান
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়্যারলেস রেলগেইট
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২